

# বারাহীনে আহমদীয়া

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও  
মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে  
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

৩৩

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ  
প্রতিষ্ঠিত মসীহ ও ইমাম মাহ্মী (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা



# বারাহীনে আহমদীয়া

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও  
মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে  
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

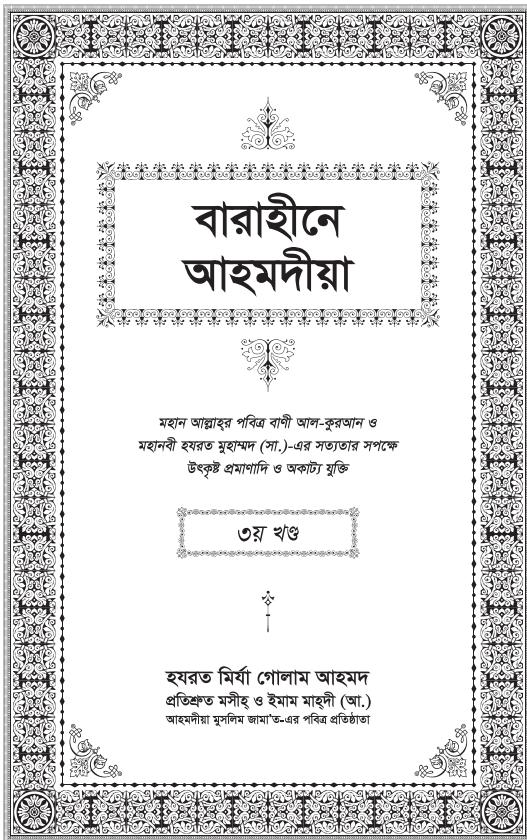
তৃতীয় খণ্ড

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ  
প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা



# বারাহীনে আহমদীয়া

## ৩য় খণ্ড



প্রকাশনায়  
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

# বারাহীনে আহমদীয়া

## ৩য় খণ্ড

গ্রন্থস্তর | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায় | আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর | মওলানা ফিরোজ আলম  
ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলাডেক্ষ, ইউ. কে.

প্রকাশকাল | ডিসেম্বর ২০১৭

সংখ্যা | ১০০০ কপি

মুদ্রণ | বাড়-ও-লিভস্  
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,  
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিবাল, ঢাকা-১০০০।

---

**Barahin-e-Ahmadiya**  
(VOL 3)

বারাহীনে আহমদীয়া  
৩য় খণ্ড

by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani  
**The Promised Messiah and Imam Mahdi** <sup>as</sup>  
(may peace be upon him)

Translated into Bangla by  
**Maulana Feroz Alam**

Published by  
**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**  
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

First published in Urdu in Qadian, India 1882

First Bangla translation published in December 2017  
printed by : **Bud-Ø-Leaves**, Motijheel, Dhaka

**ISBN 978-984-991-067-1**

## ভূমিকা

আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অসাধারণ রচনা ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। এবাবে তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করায় আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া জাপন করছি, আলহামদুলিল্লাহ! আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড প্রকাশেও আমরা সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে বারাহীনে আহমদীয়া-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মূল সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর পুস্তকটির পরবর্তী খণ্ড জরুরী ভিত্তিতে পাওয়ার জন্য মুসলিম ও অমুসলিমদের পক্ষ থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নিকট উপর্যুক্তি অনুরোধ উপরোধ আসতে থাকে। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশনার জন্য তহবিল অপর্যাপ্ত হওয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তহবিলে যতটা সংকুলান হয় তা দিয়েই তিনি (আ.) ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের ব্যবস্থা নেন।

ফলে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাতে করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে শিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

‘বারাহীনে আহমদীয়া’ পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

এই পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন মোহরর মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ বাংলাডেক্ষ, লক্ষন। মহান আল্লাহ তা'লা তার এই ঐকাণ্ডিক খেদমত করুল করে তাকে অশেষ নেয়ামতে অভিষিক্ত করুন। পুস্তকটির প্রচ্ছদ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) নির্বাচিত করে সদয় অনুমোদন দান করেছেন।

এ পুস্তকটি বাংলা ভাষায় ছাপার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা অনন্ধীকার্য তারা হলেন  
সর্বজনাব আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, মুহাম্মদ আকরামুল  
ইসলাম, মাহমুদ আহমদ সুমন, মোবারিজ আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট  
কমান্ডার জাফর আহমদ, শেখ মোস্তাফিজুর রহমান এবং কিশওয়ার হাসীন  
দিশা সাহেব ছাড়াও আরো অনেকেই। আর যারাই এ কাজের সাথে কোন না  
কোন ভাবে জড়িত খোদা তাদের পুরস্কৃত করুন। সেই সাথে এ কামনাও  
থাকবে যে, আল্লাহ্ করুন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যেন এ পুস্তকের মাধ্যমে  
সঠিক পথের দিশা পায় এবং ইসলাম ও আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্ববৌদ্ধ হযরত  
মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য যেন বিশ্ববাসীর কাছে  
দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়। মহান আল্লাহ্ এ পুস্তক থেকে আমাদের  
সবাইকে পূর্ণমাত্রায় লাভবান হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।



মোবাশশের-উর-রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

৩১ অক্টোবর ২০১৭

## অবতরণিকা

হ্যরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন কাদীয়ান নিবাসী হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় ঐশীগৃহ, পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর সত্যতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান খণ্ডের ক্রিপচ বিশেষ দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল।

### আল্লাহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ বিষয়াদি

অন্যান্য ধর্মে আল্লাহ তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণার মৌকাবিলায় ইসলামে বর্ণিত মহামহিম আল্লাহর মর্যাদার প্রতি হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন, তা তাঁর রচনাসমগ্রে পরিপূর্ণ ও বিশদাকারে বিধৃত রয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নূরের ৩৬ নম্বর আয়াত উন্নত করে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) লিখেন-

“খোদা আকাশ ও পৃথিবীর আলো, অর্থাৎ প্রত্যেক আলো, যা সকল উঁচু ও নিচুস্থানে পরিদৃষ্ট হয়, তা সে আত্মসমূহের মধ্যেই হোক বা দেহসমূহে, ব্যক্তিগত হোক আর অর্জিত, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, অস্তরের জ্যোতি হোক বা বাইরের— সব তাঁরই দান। এটি একথার ইঙ্গিত বহন করে যে, মহাসম্মানিত বিশ্ব প্রতিপালকের সার্বজনীন কল্যাণধারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কেউ তাঁর কল্যাণরাজির গভীরিভূত নয়। তিনিই সব কৃপাকল্যাণের প্রস্ববণস্থল, সকল আলোর আদি উৎস এবং সকল দয়া ও করণার উৎসমুখ। তাঁর চিরসত্য সত্তাই সমগ্র বিশ্বজগতের অবলম্বন এবং সকল তুচ্ছ ও উচ্চের আশ্রয়স্থল। তিনি সব কিছুকে নাস্তির অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি ব্যতীত এমন কোন সন্তা নেই, যে নিজের অধিকারবলে অস্তিত্বাব এবং চিরস্তন বা তাঁর দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত নয়, বরং স্বর্গ-মর্ত্য, মানুষ ও (অপরাপর) জীবজন্ম, পাথর ও বৃক্ষরাজি, আত্মা ও দেহাবয়ব, সবকিছু তাঁরই কৃপাগুণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ হলো সাধারণ কল্যাণরাজি, যার কথা আয়াত **اللَّهُ تُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ** এ প্রকাশ করা হয়েছে।

এটিই হলো সেই কল্যাণরাজি, যা গোলকের ন্যায় সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যে কৃপা-কল্যাণ লাভের নিমিত্তে কোন বিশেষ যোগ্যতার শর্ত নেই।”  
(পৃ. ৮৫-৮৬)

### কেবলমাত্র যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি নিজ থেকে আল্লাহ্ সম্পর্কে নিশ্চিত ও পূর্ণ অভিজ্ঞান দান করতে সক্ষম নয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে জোরালোভাবে সাব্যস্ত করেছেন যে, আল্লাহ্ সম্পর্কিত সত্যিকার ও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা স্বীয় চেষ্টা সাধনা দ্বারা ‘আবিষ্কার’ করতে পারে না। কেননা সেই ঈমান, যার ভিত্তি কেবলই যুক্তি ও বিচারশক্তি নির্ভর, তা এক বিভ্রান্তিই বটে। যেমন তিনি লিখেছেন:

“যুক্তিবাদীদের জন্ম না হলে খোদাই হারিয়ে যেতো— যার দৃষ্টিতে খোদা এতই দুর্বল, তার ঈমানের কোন বিশ্বাস আছে কি? নির্বোধরা জানে না যে, খোদা স্বীয় সব গুণাবলীর সুবাদে বান্দাদেরকে প্রতিপালন করেন, কেবল কতিপয় গুণাবলীর মাধ্যমে নয়। তাই, এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তাঁর শ্রেষ্ঠতম কর্যকটি বৈশিষ্ট্য বান্দাদের কাজে আসবে না? এটি বলার চেয়ে বড় কুফরী আর কী হতে পারে যে, তিনি পুরো ‘রাবুল আলামীন’ (বিশ্বপ্রতিপালক-অনুবাদক) নন, বরং অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ?” (পৃ. ৭৫)

### বিশ্বজগৎ বা সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন আল্লাহ্ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের পানে পরিচালিত করতে পারে না

সৃষ্টিজগতের জ্ঞানার্জন করা আল্লাহ্ সম্পর্কে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় হতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সৃষ্টিজগত তথা প্রকৃতির জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে আল্লাহকে শনাক্ত করা যায়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি (আ.) লিখেন:

“কেবল সৃষ্টিকে দেখেই দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্জিত হতে পারে না সেকথা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি এমন কোন গ্রহ নয়, যাতে দৃষ্টিপাতে মানুষ লিখিতভাবে একথা দেখবে যে, এটিকে খোদা বানিয়েছেন আর বাস্তবেই খোদা আছেন! তাঁকে পাওয়ার আনন্দই প্রকৃত প্রশান্তি লাভের নিশ্চয়তা। তিনিই অনুগতদের পুরস্কার দেবেন আর অবাধ্যদের শাস্তি দেবেন! বরং সৃষ্টিজগতকে দেখে আর

এই বিশ্বজগতকে পরম সুন্দর ও অনুপমরূপে বিন্যস্ত পেয়ে নিছক অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, এসব সৃষ্টির অবশ্যই কোন স্মৃষ্টা থাকা উচিত। ‘থাকা উচিত’ ও ‘আছে’ শব্দ দু’টির অর্থে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ‘আছে’ শব্দটি বিশ্বাসের যে পর্যায়ে পৌছায় ‘থাকা উচিত’ শব্দটি সেই পর্যায়ে পৌছতে পারে না, বরং এতে সন্দেহের কিছুটা অবকাশ থেকেই যায়।”

“যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে বলে যে, তা হওয়া উচিত, তার কথার নির্যাস হলো, আমার ধারণা অনুসারে তা থাকা আবশ্যিক, কিন্তু বাস্তবে আছে কি নেই তা আমি জানি না। সে কারণেই নিছক সৃষ্টিজগৎ নিয়ে ভাবতেন, এমন যত চিন্তাবিদ গত হয়েছে তারা ফলাফল বের করতে গিয়ে কখনো একমত হতে পারে নি, এখনও একমত নয় আর ভবিষ্যতেও একমত হওয়া সম্ভব নয়।” (পৃ. ৩৭)

### এলহাম বা ঐশীবাণীর আবশ্যকতা

যুক্তিপ্রমাণ ও প্রাকৃতিক বিধানের জ্ঞানলাভ, মানুষকে আল্লাহর সন্তা ও তাঁর অঙ্গিত্ব সম্পর্কে পুরো নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আল্লাহ তা’লা কি মানুষের হিদায়াত লাভের কোন পথ সৃষ্টি করেছেন? এর উত্তর হলো— চিরকাল থেকে এলহাম বা ঐশীবাণীই সেই আলোকবর্তিকা যা মানুষকে তাঁর পানে পরিচালিত করে আসছে। তিনি (আ.) বলেন:

“সাথীগণ! ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন! এলহাম ছাড়া পূর্ণ ঈমানও অর্জন সম্ভব নয়, ভুলভাস্তিও এড়ানো যায় না আর খাঁটি এককঙ্কবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনার ওপরও নিয়ন্ত্রণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ‘আল্লাহ আছেন’ বলে সর্বত্র যে ‘সাজ সাজ’ রব শোনা যায় আর সারা বিশ্ব যে ‘আছেন আছেন’ বলে তাঁকে ডাকছে তা এলহামেরই কল্যাণে। আদিকাল থেকে এলহামই হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করে আসছে যে, খোদা বিরাজমান রয়েছেন আর এ কারণেই ইবাদতকারীরা ইবাদতের স্বাদ পায় এবং খোদার সন্তা ও পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাসীদের প্রতীতী ও নিশ্চয়তা লাভ হয়। আর এটি তা-ই, যার সুবাদে কোটি কোটি তত্ত্বজ্ঞানী দৃঢ় অবিচলতা ও গভীর ঐশীপ্রেমের সুগভীর উচ্ছ্঵াস নিয়ে ক্ষণভঙ্গুর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এটি তা-ই, স্বীয় রক্ত দিয়ে যাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন সহস্র সহস্র শহীদ।” (পৃ. ৪৮-৪৯)

হয়রত মসীহ মওউদ (আ.) নিজেও এলহামপ্রাপ্ত ছিলেন। আর বারাহীনে আহমদীয়ার এই তৃতীয় খণ্ড প্রণয়নকালে তাঁর প্রতি ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় এলহাম অবতীর্ণ হতে থাকে।

এলহামপ্রাপ্তির সেই সব অভিজ্ঞতা তিনি পুস্তকটিতে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে সেই সব আগাম সংবাদ রয়েছে যা তাঁর জীবদ্ধশাতেই পূর্ণতা পেয়েছে, তেমনই রয়েছে এমন ভবিষ্যদ্বাণীও যা এখনও পূর্ণতার অপেক্ষায় রয়েছে। এরই একটি হল:

“স্মরণ রেখো! এমন সময় আসছে যখন মানুষ দলে দলে তোমার কাছে আসবে। সুতরাং তোমার জন্য আবশ্যিক হলো মানুষের প্রতি অহংকার প্রদর্শন না করা আর দলে দলে আগত লোকদেরকে স্বাগত জানিয়ে ক্লান্তি প্রকাশ না করা। কিছু এমন মানুষও আছে, যারা নিজেদের বসতবাড়ি থেকে হিজরত করে তোমার গৃহে বসতি গড়বে। তারা হলো আসহাবুস সুফ্ফার। তুমি কি ভাবতে পার যে, আসহাবুস সুফ্ফার মর্যাদা কত মহান? তারা স্মানের ক্ষেত্রে খুবই দৃঢ়। তারা আকৃতি করবে, হে আমাদের প্রভু! এক আহ্বানকারীকে আমরা স্মানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি আর খোদার দিকে এক আহ্বানকারী এবং এক প্রদীপ্ত সূর্য। এসব ভবিষ্যদ্বাণী লিখে রাখ, তা যথা সময়ে পূর্ণ হবে।” (পৃ. ১৮৭-১৮৮)

### পবিত্র কুরআনের উৎকর্ষতা

(নিশ্চিত জ্ঞানার্জন ও হিদায়াতের জন্য এলহামের আবশ্যিকতার বিষয়টি স্পষ্ট করার পর হয়রত মসীহ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনকে খোদার উৎকর্ষ বাণী ও গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করেন যা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ নায়িল করেছেন, যা যুক্তিপ্রাপ্ত আকাট্য আর বাগ্ধিতায় অদ্বিতীয় এবং সত্যের বর্ণনায় সম্পূর্ণ। মুসলিম উম্মাহ তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রতি যে অসীম ভালোবাসা ও ভক্তিশূদ্ধা পোষণ করে, এরই অনুকরণ দেখা যায় তাঁর লেখাসমূহে। যেমন তিনি (আ.) লিখেছেন:

جَالٌ وَ حَسْنٌ قُرْآنٌ نُورٌ جَانِٰ هُرْ مُسْلِمٌ أَسِّٰٰ هُنْ قُرْآنٌ هُنْ چَانِدٌ قُرْآنٌ هُنْ

অর্থাৎ- “কুরআনের সৌন্দর্য ও সুষমা সকল মুসলমানের প্রাণের জ্যোতি। অন্যদের চাঁদ হলো চন্দ্র, কিন্তু আমাদের চাঁদ হলো কুরআন।” (পৃ. ২৩)

এর উৎকর্ষতা ও সম্পূর্ণতা তুলে ধরে তিনি (আ.) বলেন:

“অধিকন্ত এতে অন্তর্নিহিত আরেকটি শ্রেষ্ঠত্ব হলো, মানুষ পরিশ্রম, চেষ্টা ও সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে নিজেদের চিন্তাভাবনা ও ধর্মীয় বৃৎপত্তির জোরে যেসব সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে বা যে সূক্ষ্ম বিষয় আবিক্ষার করতে পারে বা সেই বিষয় সম্পর্কে কোন প্রকার ভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব বা কোন প্রকার দলিল ও প্রমাণ নিজের যুক্তিশক্তি দ্বারা দাঁড় করিয়ে দেখাতে পারে বা এমনই কোন সূক্ষ্ম সত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপস্থাপন করতে পারে যা অতীত জ্ঞানীরা দীর্ঘকাল শ্রম ও সাধনার বলে আবিক্ষার করেছেন, অথবা অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি যতটা রয়েছে, যাতে বেশিরভাগ মানুষ আক্রান্ত থাকে, এর চিকিৎসা যদি সে পরিত্র কুরআন থেকে উদ্ঘাটন করতে চায় তাহলে সে যেভাবে এবং যেক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে চায় (পরিত্র কুরআনকে) পরীক্ষা করে দেখতে পারে। সকল ধর্মীয় সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনায় পরিত্র কুরআন একটি বৃত্তের মত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কোন ধর্মীয় সত্য এর বাইরে নয়। বরং যেসব সত্যকে জ্ঞানীরা জ্ঞান ও বুদ্ধির অভাবে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করেছে, পরিত্র কুরআন সেসবকে পূর্ণতা দেয় ও এর সংশোধন করে। যেসব সূক্ষ্ম রহস্য কোন জ্ঞানী ও দার্শনিকের বর্ণনা করার সুযোগ হয় নি, আর কোন মানব মস্তিষ্ক যে সম্পর্কে ভাবতেও পারে নি, কুরআন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ও সততার সাথে তা বর্ণনা ও প্রকাশ করে। আর ঐশ্বী জ্ঞানের সেসব সূক্ষ্ম দিক যা শত শত পুস্তক পুস্তিকা ও মোটা মোটা বইয়ে লেখা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণই রয়ে গেল, তা কুরআন পূর্ণাঙ্গীন রূপে লিপিবদ্ধ করে আর ভবিষ্যতে কোন বুদ্ধিমানের জন্য নতুন কোন বিষয় অবতারণা করার জায়গা খালি রাখে না।” (পৃ. ২৯-৩০)

হ্যরত মসীহ মওউদ (আ.) বারবার বলেছেন যে, কেউ যদি তাঁর দাবিসমূহের সত্যতা যাচাই করতে চায় তাহলে তিনি তাঁর দাবির সপক্ষে প্রমাণ দিতে সদা প্রস্তুত।

যেমনটি তিনি (আ.) লিখেছেন:

“কেবল এতটাই নয়, বরং সকল যৌক্তিক প্রমাণাদিও পরিত্র কুরআন নিজেই বর্ণনা করে আর সকল ধর্মীয় সত্যের পানে নিজেই পথপ্রদর্শক ও নেতা। এখনই এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি কেউ গবেষণা করতে চায়, বা এ

কথার সত্যায়ন চায়, তাহলে এর জন্যও আমরাই দায়িত্ব নেবো। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান সন্ধানী পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে।” (পৃ. ১৬৯)

কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি, যেমন তিনি তাঁর এক উর্দূ কবিতায় বলেন:

آزمash کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پڑھ لیا ہم نے

যাচাই করার মন-মানসিকতা নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে নি

(যদিও) আমি প্রতিদ্বন্দ্বিদের এক এক করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডেকেছি!

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, ঝুহানী খায়ায়েন ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৪)

### আল্লাহর অস্তিত্ব ও মহাপ্রাক্রিয়ের বাস্তব প্রমাণ মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় সাফল্য

অনুরূপভাবে, আল্লাহর অস্তিত্ব ও সর্বময় শক্তিমন্তার অধিকারী হওয়ার একটি স্পষ্ট প্রমাণ হল চরম বিপদাবলী ও পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েও মহানবী (সা.)-এর মহান বিজয় লাভ করা। এ বিজয় স্বয়ং তাঁর (সা.) সত্যতার প্রমাণও বটে।

হ্যরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

“দেখ! একজন দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ এবং একাত্ত অসহায় দীনহীন ব্যক্তি স্বীয় ধর্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভের সংবাদ তখন দিয়েছেন, যখন তার কাছে সহায়সম্বলহীন কতক দরবেশ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। মুসলমানের মোট সংখ্যা যা ছিল, একটি ছোট কক্ষেই তাদের সংকুলান সম্ভব হতো আর হাতের আঙুলে এক এক করে তা গণনা করা যেতো। এক গ্রামের কয়েক ব্যক্তির পক্ষেই তাদেরকে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল। অথচ যাদের সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে, তারা ছিল জগতের বাদশাহ ও শাসক। এদেরকে যেসব জাতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তারা সংখ্যায় ছিল কোটি কোটি, কিন্তু তবুও এদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চহ করার বিষয়ে ছিল তারা বন্ধপরিকর। আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দৃষ্টিপাত করে দেখ! খোদা তাঁলা কীভাবে সেই দুর্বল ও মুষ্টিমেয় কিছু লোককে পৃথিবীময় বিস্তৃত করেছেন, কীভাবে তাদেরকে শক্তি, সম্পদ ও রাজত্ব দান করেছেন আর কীভাবে সহস্র সহস্র বছর ধরে সিংহাসনে আসীন ছিল যারা, তাদের সিংহাসন ও মুকুট এদের হাতে তুলে দেয়া হলো? এমন একটি সময়ও ছিল যখন সেই ‘জামা’তের সদস্য সংখ্যা ততটাও ছিল না,

যতটা এক পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা হয়ে থাকে, অথচ পৃথিবীতে এখন তাদের সংখ্যাই কোটি কোটি।” (পঃ. ১৭৩)

একটি সময় এমন ছিল যখন এ জামা'তের মোট সদস্য সংখ্যা গড়ে একটি ঘরের সদস্য যা হয় তার বেশি ছিল না। এখন তাদের সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

এসব দাবি অত্যন্ত জোরালো কিন্তু তা উপরিপিত হয়েছে পরম নিষ্ঠার সাথে, যেমন তিনি তাঁর রচিত পংক্তিমালার এক চরণে লিখেছেন:

ہمیں کچھ کیس نہیں بھائیو! نصیحت ہے غریبان کوئی جو پاک مل ہوے مل و جاں اُس پر قرباں ہے

“আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্যে নেই, এটি বিনয়াবন্ত সদুপদেশ মাত্র। যদি কেউ পরিত্রমনা হয়ে থাকে তাহলে আমার অন্তরাত্মা তার জন্য নির্বেদিত।” (পঃ. ২৪)

হ্যরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমস্ত লেখা ও রচনাসমগ্র আল্লাহর অঙ্গিত, পরিত্র কুরআনের ঐশী নির্দর্শনাবলী আর মহানবী (সা.)-এর সত্যবাদীতার প্রামাণিক দলিলে উভাসিত। বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে উল্লিখিত যুক্তি ও প্রমাণাদি সকল আহমদী মুসলমানের পাঠ ও প্রণিধান করা উচিত যাতে তাদের অন্তরাত্মা এবং চিন্তা ও চেতনা পরিশোধিত হয়ে ঈমানের নিশ্চয়তায় সমৃদ্ধ জ্যোতির্ময় আলোয় ভরে ওঠে। এমনটা করায় কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিই ঘটবে না, বরং মানুষের হৃদয় মানবিক সহানুভূতি ও সহর্মিতায়ও সমৃদ্ধ হবে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি আমাদের এই দ্বিপাক্ষিক ভালোবাসা চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদেরকে হ্যরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পতাকাতলে অবস্থান করে ইসলামের এই শাশ্বত বাণীকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করবে।

আমাদের এই শুন্দ প্রয়াসকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আশিসমণ্ডিত করুন আর একে সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণের উৎস করুন। এর মাধ্যমে মানবজাতির সাথে তাদের স্রষ্টার সম্পর্ক-বন্ধন দৃঢ় হবে, এটিই আমার প্রত্যাশা। আমীন!

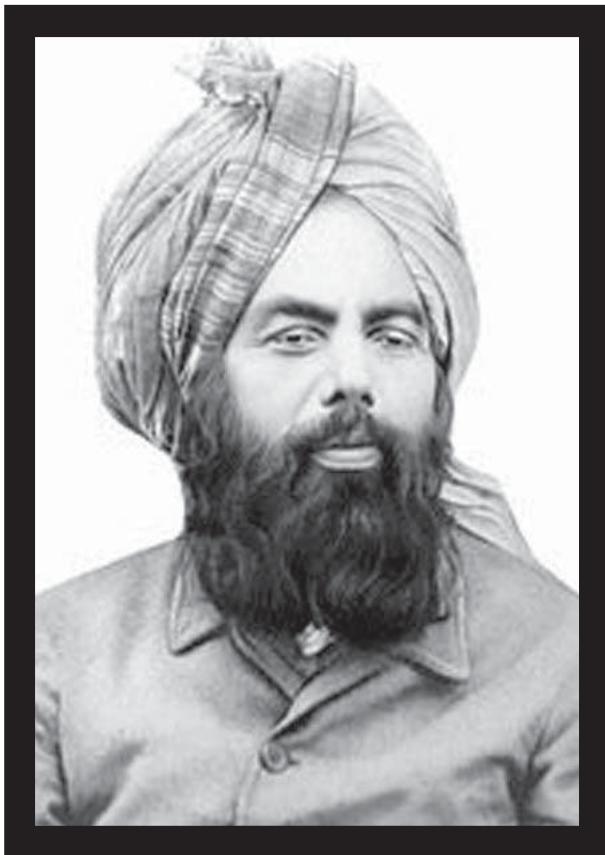
হ্যরত মির্ধা মসরুর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস, লঞ্চন

জুলাই, ২০১৪



## ଲେଖକ ପରିଚିତି



ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସୀହ ଓ ଇମାମ ମାହଦୀ ହ୍ୟରତ ମିର୍ଯ୍ୟା ଗୋଲାମ ଆହମଦ (ଆ.) ୧୮୩୫ ସନେ ଭାରତେର ପାଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶେର କାଦିଆନ ନାମକ ସ୍ଥାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତିନି ଆଜୀବନ ପବିତ୍ର କୁରାଅନ-ଏର ଗବେଷଣା ଓ ମାହାତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଦୋଯା ଓ ଏକାନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ୍ୟାପନ କରେନ । ଚାରଦିକ ହତେ ଇସଲାମେର ବିରଳଙ୍କେ ନୋଂରା ଅପବାଦ, ଆକ୍ରମଣ, ମୁସଲମାନଦେର ଚରମ ଅବନତି, ନିଜ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସେ ସନ୍ଦେହ,

সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক), বক্তা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম সুষ্ঠার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পরিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিভূতি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন— কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ তাঁকে মসীহ ও মাহদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশ্বী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২১০টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রূত হয়ে মসীহ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হয়ে মওলানা হেকীম নুরুল্লাহ (রা.) খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হয়ে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রূত পুত্র হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হয়ে মিয়া বশীরুল্লাহ মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হয়ে মিয়া বশীরুল্লাহ মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহদীর প্রতিশ্রূত পৌত্র হয়ে মিয়া নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোট ভাই হয়ে মিয়া তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ রাবে হয়ে মিয়া তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হয়ে মিয়া মসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রূত মসীহ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

# সূচিপত্র

## ঢয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
১) মুসলমানদের দুর্দশা, ইসলামের দৈন্যদশা এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সংক্রান্ত একটি ঘোষণা .....	৩
২) জ্ঞাতব্য .....	৫
৩) কৈফিয়ত .....	৫
৪) গুরুত্বপূর্ণ নির্বেদন .....	৬
৫) ইসলামি সংগঠনগুলোর সমীপে গুরুত্বপূর্ণ নির্বেদন .....	৭

## প্রথম অধ্যায়

৬) কুরআন শরীফের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্ত যেসব সাক্ষ্য রয়েছে সেই সব অকাট্য দলিলপ্রামাণাদির বিবরণ প্রসঙ্গে- .....	১৩
৭) উপর্যা .....	১৫
৮) বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ .....	১৭
৯) সতর্কীকরণ .....	১৯
১০) টীকা নম্বর এগার (১১) .....	৩৩
১১) পাদটীকা নম্বর এক (১) .....	১৭১
১২) পাদটীকা নম্বর দুই (২) .....	২০৯
১৩) ক্ষমা প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তি .....	২২১



ٹাক্টিল বারাও  
ঢাক্স সুম

জাত্য জরুরতে বাপ্তাল অন বাপ্তাল কান রহোফা

بفضل علمي و خبرتني عالمي عالي دين رحمتني مخترع ننان سخان كتب بخط يد جابر بن سليم

# بَرَاهِيْجِيْه

لقب به

البراهين الاحمدية على حقيقه كتاب البه القراآن والنبوة المحمده

بكتور اسلام خاچاب ميرزا غلام احمد صناوي اعتماد ديان ضلع گرد سپه خاچاب میرزا  
کمال تحقیق اور تدقیق سائیف کر کئیں سلام پر خوش اسلام پاری کی کیلے دو دعا فرماده وہ میرزا

امیر سپه خاچاب

لهم  
لهم  
لهم

প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের প্রচন্দের অনুবাদ

## ত্রয় খণ্ড

جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْوًا

এ পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বজগতের

পথপ্রদর্শকের মহান কৃপায় আর পথহারাদের  
সঠিক পথপ্রদর্শনকারী খোদার সর্বজনীন করণ্যায়,  
শানিত যুক্তিতে সমৃদ্ধ অখণ্ডনীয় এ গঠের নাম রাখা হয়েছে—

# ‘বারাহীনে আহমদীয়া’

এর পুরো নাম হলো:

‘আলবারাহীনুল আহমদীয়াত্ আলা  
হাকীয়তে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে  
ওয়ান্ নবুয়াতীল মুহাম্মদীয়াত্’।

চড়াত্ত গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণের ওপর  
ভিত্তি করে এটি রচনা করেছেন মুসলমানদের  
গর্ব, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত  
কাদিয়ান নিবাসী সম্মানিত রইস  
জনাব মির্য গোলাম আহমদ সাহেবে  
(খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করণ)। অস্থীকারকারী  
বিরোধীদের সামনে ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্থ  
করে ১০ হাজার রূপি (পুরক্ষার) প্রদানের  
প্রতিশ্রুতির সাথে তিনি এটি প্রকাশ করেছেন।

সুবহান আল্লাহ! এটি কী অসম্ভব এক এই যা খুবই অস্ব কালের  
মধ্যে মানুষকে সত্ত ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে।

সফীরে হিন্দ ছাপাখানা

অমৃতসর, পাঞ্জাব

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ

শানিত যুক্তি সমৃদ্ধ অখণ্ডনীয় এ গঠের নাম রাখা হয়েছে—

## হে আল্লাহ্ত\*

মুসলমানদের দুর্দশা, ইসলামের দৈন্যদশা এবং  
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সংক্রান্ত একটি ঘোষণা

বর্তমানে ইসলামের দৈন্যদশার লক্ষণাবলী আর খাঁটি ও সুদৃঢ় মুহাম্মদী ধর্ম ইসলামের ওপর নিপত্তিত সমস্যাবলী এতটা প্রকটরূপ ধারণ করছে যে, আমাদের জানামতে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পর থেকে অন্য কোন শতাব্দীতে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। এর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর কী হবে যে, বিরোধীরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং এর প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত সোচার ও সক্রিয়, তখন মুসলমানরা তাদের ধর্মের প্রতি মমত্বোধ প্রদর্শনে চরম উদাসীন। এর ফলে ধর্মত্যাগ ও ভাস্তবিশ্বাসের দ্বার প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রশংস্ত হয়ে চলেছে। মানুষ দলে দলে ধর্মত্যাগ করে অপবিত্র বিশ্বাস ধারণ করছে।

কতই না পরিতাপের বিষয়! আমাদের বিরোধীরা তাদের রংগু ও নৈরাজ্যকর বিশ্বাস স্পষ্টতই মিথ্যা ও ভাস্তব হওয়া সত্ত্বেও অহরাত্র স্বস্ব ধর্মের কাজে সোচার ও সক্রিয়। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকায় খ্রিস্টধর্ম প্রসারের জন্য বিধবারাও চাঁদা প্রদান করে থাকে আর বেশিরভাগ মানুষ মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যায় যে, তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ‘এত ভাগ’ পুরোটাই খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা কী বলব আর কী-ইবা লিখব! তাদের উদাসীনতা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, ধর্মের অবস্থা দেখে তারা নিজেরাও ব্যথিত হয় না আর যারা ধর্মের জন্য মর্মাতনায় ভোগে তাদেরও সুনয়ের দেখে না। অথচ ধর্মের সেবায় ব্যথিত হবার কতইনা নিদারণ সময় এটি! ‘বারাইনে আহমদীয়া’ গ্রন্থটি ধর্মের সেবার কত গুরুত্বপূর্ণ এক সুযোগ এনে দিয়েছে, যাতে তিনশ’ শক্তিশালী দলিলপ্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকস্ত এমনভাবে সকল বিরোধীর মিথ্যা বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে,

---

\* এই ঘোষণাপত্রটি ১৮৮২ খ্রি.-এর ১ম ও ১৯০০ খ্রি.-এর ২য় সংস্করণে নাই। তবে ১৯০৫ খ্রি.-এর তৃয় সংস্করণে রয়েছে। (মওলানা জালাল উদ্দিন শামস)

যা সেসবের জীবন-শিরা কেটে দেয়ারই নামান্তর আর এর ফলে তা আর কখনও প্রাণ ফিরে পাওয়ার নয়। কিছু সংখ্যক দৃঢ়চেতা মুসলমানের মনোযোগের সুবাদে এ গ্রন্থের পুরো দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তৃতীয় খণ্ডের কিছুটা ইতিমধ্যে ছেপেও গিয়েছে। অন্যরা এক্ষেত্রে যে পরিমাণ সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু না বলে কেবল **إِنَّ اللَّهُ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُون** (সূরা বাকারা: ১৫৭) পড়াই যথোপযুক্ত হবে।

হে মুঁমিন ভাইয়েরা! তোমরা কেন মনোযোগ দিচ্ছ না? আমরা তোমাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি, কিন্তু তোমরা আগ্রহ দেখালে না। আমরা তোমাদের সতর্ক করেছি, কিন্তু তোমরা সাবধান হও নি। হে আল্লাহর বান্দারা, কর্ণপাত কর! মনোযোগ দিয়ে শোন! এ কাজের সহযোগিতায় এগিয়ে আস, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে এবং তোমরা সাহায্যকারীদের মাঝে উত্থিত হবে। উভয় জগতে তোমাদের প্রতি করঞ্চ প্রদর্শন করা হবে আর তোমাদেরকে সম্মানজনক আসন প্রদান করা হবে। খোদা তোমাদের ও আমাদের প্রতি করঞ্চ প্রদর্শন করুন। তিনি কতই না উত্তম বন্ধু ও উত্তম সাহায্যকারী! এখনও যদি কেউ মনোযোগ না দেয় তাহলে আমাদের আকৃতি মিনতি কেবল পরম দয়ালু খোদার কাছেই থাকবে। তাঁর পরিত্র প্রতিশ্রূতিই আমাদের মত অসহায়দের একমাত্র সাত্ত্বনা ও প্রবোধ। এখানে একথাও জানিয়ে রাখা আবশ্যিক যে, প্রথমে এ গ্রন্থ কেবল ৩০-৩৫ জুয় বা অধ্যায় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা ১০০ অধ্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এর মূল্য সাধারণ মুসলমানদের জন্য ১০ রূপী এবং অন্যান্য জাতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ২৫ রূপী নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ এবং পর্যাণ যুক্তিপ্রমাণাদি উপস্থাপনের সকল দাবি দৃষ্টিতে রাখতে গিয়ে এ গ্রন্থটি এখন ৩০০ অধ্যায় পর্যন্ত পৌছে গেছে। মুদ্রণ-ব্যয়ের কথা সামনে রেখে ভবিষ্যতে এর মূল্য ১০০ রূপি নির্ধারণ করা আবশ্যিক বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের আন্তরিকতার ঘাটতির কারণে পূর্বনির্ধারিত মূল্যকেই চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করা যথাযথ বলে মনে হলো, যা আসলে তেমন কিছুই নয়। সাধ্য ও ইচ্ছার বাইরে মানুষের ওপর বোঝা না চাপানোই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আবশ্যিকীয় প্রাপ্য হিসেবে সবক'টি খণ্ড দাবি করার কোন অধিকার ক্ষেত্রের থাকবে না বরং অধিকারের বাইরে যেসব খণ্ড (অধ্যায়) তারা পাবে তা সম্পূর্ণভাবে খোদার খাতিরে এবং তাঁর

সন্তুষ্টির জন্যই দেয়া হবে। এর প্রতিদান বা পুণ্য তাঁরা লাভ করবেন, যারা বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ সমাধার লক্ষ্যে সাহায্য করবেন। স্মর্তব্য যে, এখন এ কাজ কেবল সেসব মানুষের সদিচ্ছায় সম্পন্ন হতে পারে না যারা ক্রেতা হিসেবে সাময়িক উদ্যোগ বা উচ্ছ্঵াস প্রদর্শন করে, বরং এখন এমন অনেক দৃঢ়তো মানুষের মনোযোগ প্রয়োজন, যাদের হৃদয়ে ঈমানী আত্মাভিমানের কল্যাণে সত্যিকার ও বাস্তব উচ্ছ্বাস-উদ্বীপনা বিদ্যমান আর যাদের অসাধারণ ও অমূল্য ঈমান কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের সংকীর্ণ গতিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং তাঁরা নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জাগ্রাত ক্রয় করতে আগ্রহী ফضل اللہ یؤتیه من يشاء لَكُمْ (সূরা আল হাদীদ: ২২)। পরিশেষে বিষয়টি আমরা এই দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত করবো যে, হে মহাসম্মানিত খোদা! তুমি তোমার খাঁটি বান্দাদের পূর্ণ মনোযোগ এদিকে নিবন্ধ কর। হে দয়া ও কৃপার আধার! তুমি স্বয়ং তাদের স্মরণ করাও। হে সর্বশক্তিমান! তুমি স্বয়ং তাদের হৃদয়ে এলহাম কর, আমীন, সুম্মা আমীন।

আমরা আমাদের প্রভুর ওপর নির্ভর করি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের প্রভু এবং বিশ্বপ্রতিপালক।

## জ্ঞাতব্য

যারা গ্রহ করে অগ্রিম মূল্য পাঠিয়েছেন এবং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাহায্য করেছেন তাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, স্থান সংকুলানের অভাবে তাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয় নি, অবশ্য কোন কোন বন্ধুর মতে এটা আবশ্যিকও নয়। যাহোক, চতুর্থ খণ্ডে সে পছাই অনুসৃত হবে যা বেশিরভাগ মানুষের মতে যুক্তিযুক্ত।

মির্যা গোলাম আহমদ

## কৈফিয়ত

এবার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে দু'বছরের মত যে বিলম্ব ঘটলো, অধিকাংশ ক্রেতা ও পাঠক হয়ত এ কারণে যারপরনাই আশ্চর্য হবেন; কিন্তু স্পষ্ট হওয়া দরকার, এই পুরো বিলম্ব ঘটেছে সক্ষীরে হিন্দ ছাপাখানার (যেখানে এ বই ছাপা হয়) ব্যবস্থাপকের ব্যক্তিগত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে।

অধম- (মির্যা) গোলাম আহমদ (খোদা তাঁকে মার্জনা করণ)

## গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন\*

যেহেতু গ্রন্থের কলেবর তিনশ' অধ্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে, তাই যেসব ক্ষেত্র এখন পর্যন্ত আংশিক বা পুরো ভ্রয়মূল্য পাঠান নি তাঁদের সমীক্ষে নিবেদন হলো আর কিছু না হলেও নিদেনপক্ষে অনুগ্রহপূর্বক অবশিষ্ট মূল্য অন্তিবিলম্বে পাঠিয়ে দিন। কেননা যেখানে গ্রন্থের প্রকৃত ব্যয়মূল্য একশ' রূপী, সেখানে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে দশ বা পঁচিশ রূপী। যদি এই যৎসামান্য মূল্যও মুসলমানরা অধিম প্রদান না করেন তাহলে তাঁরাই এ কাজ সম্পাদনের পথে বাদ সাধছেন বলে গণ্য হবেন। এই কথাটি আমরা লিখেছি কেবল বাহ্যিক উপায় উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে। সত্য কথা হলো, যদি কেউ সাহায্য না করে বা উদাসীন থাকে তাহলে সে নিজেই এক মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

উপরন্ত আল্লাহর কাজ বন্ধ থাকতে পারে না আর কোন সময় বন্ধ হয়ও নি।

সর্বশক্তিমান খোদা যেসব কাজ করতে চান, তা কারও অমনোযোগিতার কারণে থেমে থাকতে পারে না। ওয়াস্সালাম আলা মানীত্ তাবাআল হুদা।

বিনীত  
মির্যা গোলাম আহমদ

---

\* এই ঘোষণাপত্রটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বারাহীনে আহমদীয়া-র তৃয় খণ্ডের শেষে লিপিবদ্ধ আছে। (মওলানা জালাল উদ্দিন শামস)

## ইসলামি সংগঠনগুলোর সমীপে গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন

‘আঞ্জুমানে ইসলামীয়া লাহোর’-এর সেক্রেটারি এবং ‘আঞ্জুমানে হামদরদীয়ে ইসলামী’-এর সেক্রেটারি মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভীর পক্ষ থেকে একটি করে পত্র এ অধমের গোচরীভূত হয়, যার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের শিক্ষা এবং চাকুরীক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি আর স্কুলের পাঠ্যসূচীতে যাতে উর্দ্ধ ভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই নিমিত্তে আবেদনপত্রে সম্মানিত মুসলমান ভাই ও ন্যায়পরায়ণ হিন্দুদের স্বাক্ষর নেয়া, যেন তা এই সরকারের কাছে উপস্থাপন করা যায়। পরিতাপের বিষয় হলো, আমি প্রধানত নিজের অসুস্থতা ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে অযুক্তসরে অবস্থানের কারণে এই দায়িত্ব পালনে অপারগ ছিলাম। কিন্তু ‘ধর্ম হিতাকাঙ্ক্ষারই নামান্তর’- এই শিক্ষানুসারে এতটুকু বলা আমার ভাইদের ইহলোক ও পারলৌকিক কল্যাণের কারণ বলে মনে করি, ‘যে সরকার স্বীয় আইনে গবাদিপশ্চ ও চতুর্পদ জন্মের প্রতিও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছে, সে সরকার কী করে মানুষের এমন একটি বিশ্বাল জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন থেকে বিরত ও উদাসীন থাকতে পারে, যারা কিনা তাদের প্রজা ও অধীনস্ত এবং দারিদ্র্য কবলিত সমস্যায় জর্জারিত?’?

কিন্তু আমাদের সম্মানিত ভাইদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব কেবল এতটুকুই নয় যে, মুসলমানদের দারিদ্র্য, অধঃপতন ও শিক্ষা-দীক্ষাহীনতার মাঝে পেয়ে কোন স্মারকলিপি প্রস্তুত করে তাতে বেশ কিছু দস্তখত নিয়ে সরকারকে পাঠানোর ওপরই সর্বদা জোর দিতে থাকবে। জাগতিক হোক বা ধর্মীয়, সকল কাজে সাহায্য চাওয়ার পূর্বে খোদা প্রদত্ত নিজ শক্তি ও সামর্থ্য কাজে লাগানো আবশ্যক, এরপরই কেবল আসবে সে কাজের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সাহায্য চাওয়ার বিষয়। আমাদের প্রাত্যহিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও খোদা আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন এবং বলেছেন যে আমরা যেন *وَإِنَّكَ تَعْبُدُ وَإِنَّكَ شَعِينْ* *وَإِنَّكَ تَعْبُدُ وَإِنَّكَ شَعِينْ* বলি, নয়।

নিজেদের অবস্থার সংশোধনের জন্য মুসলমানদের যেসব বিষয় উদ্যম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে সম্পাদন করা আবশ্যক তা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না, বরং চিন্তাভাবনা ও প্রশিদ্ধানে তারা নিজেরাই তা জানতে পারবে। কিন্তু এখানে সেসব বিষয়ের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়- যার ওপর ইংরেজ সরকারের অনুকম্পা ও সুদৃষ্টিদান নির্ভর করে, তা হলো, সরকারকে এটা ভাগোভাবে উপলব্ধি করানো যে, ভারতের মুসলমানরা বিশ্বস্ত

প্রজা। কেননা কতিপয় ইংরেজ না জেনেই, বিশেষ করে শিক্ষা কমিশনের বর্তমান সভাপতি ড. হান্টার সাহেব তার এক প্রসিদ্ধ রচনায় এই দাবির ওপর অনেক জোর দিয়েছেন যে, মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, বরং তারা ইংরেজদের সাথে সশস্ত্র জিহাদ করা আবশ্যিক বলে মনে করে। যদিও ইসলামী শরীয়তে দৃষ্টিপাত করলে ড. সাহেবের এ ধারণা সবার সামনে ভিত্তিহীন ও অবাস্তব প্রমাণিত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, পাহাড়ী ও সভ্যতা-ভব্যতা বিবর্জিত কিছু নির্বাধের অনভিষ্ঠেত আচরণ এ ধারণাকে সত্যায়িত করে। ঘটনাচক্রে এসব দেখেই খুব সম্ভব ড. সাহেবের এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। কেননা কোন কোন সময় অঙ্গদের হাতে এমন অপকর্ম ঘটেই থাকে। কিন্তু এ বিষয়টি একজন গবেষকের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না যে, এধরনের মানুষ ইসলামী রাতিনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে। অধিকন্তু ম্যাকলিন যে মানের খ্রিস্টান ছিল, মুসলমান হিসেবে এরাও তেমনই। অতএব, এটি জানা কথা যে, এসব তাদের ব্যক্তিগত আচরণ, শরীয়তের চাপানো কোন বিধিবিধান নয়। পক্ষান্তরে তাদের বিপরীতে সহস্র সহস্র সেসব মুসলমানের কথা ভাবা উচিত, যারা জীবন বাজি রেখে ইংরেজ সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করেছে এবং করছে। ১৮৫৭ সনে যে বিদ্রোহ হয়েছে, অঙ্গ এবং নোংরা চালচলনের মানুষ ছাড়া জ্ঞান ও মাত্রাজ্ঞানের অধিকারী কোন ভদ্র ও পুণ্যবান মুসলমান আদৌ এই বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। বরং পাঞ্জাবেও অতীব দরিদ্র মুসলমানরা ইংরেজ সরকারকে সাধ্যাতীত সাহায্য করেছে। যেমন আমাদের মরহুম পিতা, পর্যাপ্ত সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বে নিষ্ঠা ও হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয়ে নিজের অর্থে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন সুর্যাম ও সুদক্ষ সিগাহী সাহায্যস্বরূপ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং নিজের সীমিত সাধ্যের বাইরেও সরকারের শুভানুধ্যায়ী হওয়ার স্বাক্ষর রেখেছেন।

এছাড়া যেসব মুসলমান সম্পদশালী ও ধনবান ছিলেন তাঁরা অনেক বড় ও উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করেছেন। এখন আমরা পুনরায় এই কথার দিকে ফিরে যাচ্ছি যে, যদিও মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বড় বড় দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, ড. সাহেব এসব বিশ্বস্ততাকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেছেন আর ফলাফল বের করতে গিয়ে এসব আন্তরিক সেবার কথা আদৌ বিবেচনা করেন নি। যাহোক, আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্য আবশ্যিক হবে, এদের প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়ার পূর্বেই নুতনভাবে ও নবোদ্যমে সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার প্রমাণ দেয়া। যে

সরকারের ছায়ায় মুসলমানরা শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীন পরিবেশে জীবনযাপন করে, যার দানে তারা ধন্য, যার অনুগ্রহের কাছে তারা ঝণী এবং যার রাজত্ব সত্যিকার অর্থে পুণ্য ও হিদায়াতের প্রসারে সার্বিকভাবে অনুকৃত ও সহায়ক, সেই রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা (তথাকথিত) জিহাদ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ- এ হলো ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট শিক্ষা, যে বিষয়ে সকল মুসলমান একমত ।

অতএব, বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমান আলেমরা এ বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে প্রচার না করে অঙ্গদের কথা ও কলমের খোঁচা খেয়ে আসছে; যে আপত্তির মাধ্যমে তাদের ধর্মের দুর্বলতা প্রকাশ পায় আর অনর্থক তাদের বৈষয়িক স্বার্থেরও হানি ঘটে । অতএব, এই অধমের মতে এ লক্ষ্যে লাহোর, কোলকাতা ও মুম্বাইয়ের আঙ্গুমানে ইসলামীয়ার জন্য সমীচীন হবে কয়েকজন বিখ্যাত মৌলভী সাহেবানকে নির্বাচন করা- যাদের শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান, জগৎ- বিমুখতা ও তাক্তওয়া বেশিরভাগ মানুষের কাছে স্বীকৃত । নির্বাচিত এসব লোকের কাছে বিভিন্ন অঞ্চলের জ্ঞানীগুণী মানুষ, যারা নিজ নিজ এলাকায় কিছুটা খ্যাতি রাখেন, মোহরাক্ষিত করে জ্ঞানগর্ভ রচনা ও সন্দর্ভ পাঠাবেন যাতে অন্তর্নিহিত থাকবে সত্য শরীয়ত ইসলাম অনুসারে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর অনুগ্রহকারী ও তত্ত্বাবধায়ক ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে জিহাদের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা । সব পত্র একত্রিত হওয়ার পর, এর সঠিক ও পরিমার্জিত সংকলন লিখিত আকারে উন্নতমানের কোন ছাপাখানায় ‘মকতুবাতে ওলামায়ে হিন্দ’ (ভারতীয় আলেমদের পত্রসংগ্রহ) নামে ছাপানো দরকার ।

এরপর এর দশ থেকে বিশটি অনুলিপি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বাকিগুলো পাঞ্জাবসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে বিতরণ করা সঙ্গত হবে । এটি সত্য কথা যে, কয়েকজন সমব্যক্তি মুসলমান ড. হান্টারের ধ্যানধারণা খণ্ডন করেছেন । কিন্তু দু'চারজন মুসলমানের এই খণ্ডন সমষ্টির খণ্ডনের বিকল্প হতে পারে না । নিঃসন্দেহে গোটা জনগোষ্ঠীর খণ্ডনের ফলাফল এত শক্তিশালী এবং জোরালো হবে যে, এর ফলে ড. সাহেবের সব ভ্রান্ত রচনা ধূলোয় মিশে যাবে । অধিকন্তু কিছু অজ্ঞ মুসলমানও নিজেদের সত্য ও পবিত্র নীতি সম্পর্কে যথাবিহিত অবহিত হবে আর ইংরেজ সরকারের সকাশে মুসলমানদের স্বচ্ছতা ও সরকারের জন্য প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে যাবে । অধিকন্তু এ প্রস্ত্রে বর্ণিত ওয়ায়-নসীহত বা উপদেশাবলীর মাধ্যমে কিছু অজ্ঞ পাহাড়ী'র ধ্যানধারণারও সংশোধন হতে থাকবে । শেষের দিকে একথা স্পষ্ট করা আমরা নিজেদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব

মনে করি যে, যদিও সমগ্র ভারতের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো, ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সুশাসন ও অনুপম প্রজ্ঞার ভিত্তিতে জনসাধারণের প্রতি যেসব অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শিত হচ্ছে সেসবের জন্য এ সাম্রাজ্যকে খোদার নিয়ামত মনে করা এবং অন্যান্য ঐশ্বী পুরুষকারের মত এর জন্যও খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু এই প্রশংসনীয় সাম্রাজ্যকে তারা যদি খোদার মহান নিয়ামত হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস না করে যা সত্যিকার অর্থে তাদের জন্য খোদার অনেক বড় আশীর্বাদ, তাহলে পাঞ্চাবের মুসলমানরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ হবে। এ সাম্রাজ্যের শাসনকালের পূর্বে তারা কত তিরস্কৃত ও ধৃকৃত অবস্থার মাঝে দিনাতিপাত করছিল এবং পরে কীভাবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার বেষ্টনীতে এসে গেছে— তা তাদের ভেবে দেখা উচিত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এই সাম্রাজ্য তাদের জন্য স্বর্গীয় আশীর্বাদ বৈকি, যার ফলশ্রুতিতে তাদের সকল কষ্ট দূরীভূত হয়েছে এবং সকল প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে তারা পরিআশ লাভ করেছে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়, বাধা বিপন্নি ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে। এখন এমন কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যা আমাদের সৎকর্মে বাদ সাধতে পারে বা আমাদের স্বাচ্ছন্দে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

অতএব, সত্যিকার অর্থে দয়া ও কৃপার আধার খোদা এই সাম্রাজ্যকে মুসলমানদের জন্য করণ্যাবারি-স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, যার কল্যাণে পুনরায় ইসলামের চারা গাছ এদেশ অর্থাৎ পাঞ্চাবে সতেজতা ফিরে পেয়েছে। সুতরাং এর কল্যাণরাজির কথা স্বীকার করা সত্যিকার অর্থে খোদার অনুগ্রহরাজির কথা স্বীকারেই নামাত্রন। এই সাম্রাজ্য-প্রদত্ত স্বাধীনতা এত দৈনীপ্রয়মান এবং এতই স্পষ্ট যে, অন্যান্য দেশ থেকেও নির্যাতিত মুসলমানরা হিজরত করে এদেশে আসতে মনে থাগে পছন্দ করে। মুসলমানদের সংশোধন ও তাদের মাঝে বিরাজমান কুসংস্কার দূরীভূত করার মানসে যত সহজে ও স্বাচ্ছন্দে এই সরকারের ছত্রায় নসিহত করা সম্ভব, আমাদের মতে তা এখন অন্য কোন দেশে করা সম্ভব নয়।

অধিকন্ত, আমার মতে এ সরকারের ছত্রায় যেভাবে মুসলমানদের সংশোধন এবং যেসব বিদআত তাদের ধর্মের অংশ হয়ে গেছে তা দূরীভূত করার জন্য প্রকাশ্যে উপদেশ দেয়া যায় এবং যেসব কার্যক্রমের কল্যাণে মুসলমান আলেমরা ধর্মের প্রচার ও প্রসারে প্রেরণা পায় আর যেভাবে নিজেদের যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির উন্নত ব্যবহার করে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে সুদৃঢ় ধর্ম ইসলামের সমর্থনে বইপুস্তক প্রকাশ করে বিরোধীদের সামনে

ইসলামের সত্যতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়, তা এখন আর অন্য কোন দেশে সম্ভব নয়। এটিই সেই রাজত্ব যার ন্যায়নিষ্ঠ সমর্থনের সুবাদে দীর্ঘকাল তথা শত শত বছর পর নির্ভয়ে কুসংস্কারের নোংরামি, শিরকের অপবিত্রতা ও সৃষ্টিপূজার কল্যাণ সম্পর্কে নির্বাখদের অবগত করা এবং স্বীয় প্রিয় রসূলের সরল-সুদৃঢ় পথ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করার সুযোগ আলেমদের হস্তগত হয়েছে। সেই শাসন ব্যবস্থা যার অধীনে সব মুসলমান নিরাপদে ও শান্তিতে জীবনযাপন করে, ধর্মীয় আবশ্যকীয় আচার অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালনে সক্ষম, ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে বেশি নিরবেদিত থাকার সুযোগ পায়, এমন সরকারের অঙ্গল কামনা কোনভাবে বৈধ হতে পারে কি? না, কখনো নয়, কোন পুণ্যবান ও ধার্মিক মানুষ এমন কথা ভাবতেও পারে না।

আমরা একেবারেই সত্য বলছি, পৃথিবীতে আজ একমাত্র রাজত্ব এটিই, যার মেহ-ছায়ায় কোন কোন এমন ইসলামী আচার অনুষ্ঠানের বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যা অন্যান্য দেশে কোনভাবেই অর্জিত হতে পারে না। শিয়াদের দেশে গেলে দেখবে, তারা সুন্নীদের বক্তৃতায় ক্ষেপে যায় আর সুন্নীদের দেশে শিয়ারা নিজেদের মতামত প্রকাশে ভয় পায়। অনুরূপভাবে মুকাল্লিদীন (চার মাযহাবের অনুসারী) মুয়াহহেদদের (একত্ববাদী) শহরে যাওয়ার বা মুয়াহহেদীন মুকাল্লিদদের শহরে যাওয়ার সাহসুরুও দেখায় না। কোন বিদআত স্বচক্ষে দেখলেও মুখে তা উচ্চারণের সুযোগ পায় না। অতএব, এটিই সেই রাজত্ব যার ছত্রছায়ায় সকল ফির্কা নিরাপদে ও স্বচন্দ্রে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে এবং এটি সত্যের অনুসারীদের জন্য খুবই কল্যাণকর। কেননা যে দেশে বাকস্বাধীনতা নেই, উপদেশ দেয়ার সৎসাহস প্রদর্শনের সুযোগ নেই, সে দেশে সত্যতার প্রসার কীভাবে ঘটতে পারে? সততার প্রসারের জন্য সেই দেশ অনুকূল যেখানে সত্যের অনুসারীরা স্বাধীনভাবে সদুপদেশ দিতে পারে। এ বিষয়টি ও অনুধাবন করা উচিত, ধর্মীয় জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং অন্যায়ের অবসান করা। ধর্মীয় যুদ্ধ কেবল সেসব দেশের বিরুদ্ধে হয়েছিল যেখানে ধর্মীয় উপদেশ দেয়ার সময় উপদেশদাতাদের জীবন হৃষকির মুখে ছিল, যেখানে নির্ভয়ে বক্তব্য প্রদান করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব আর সত্যপথ অবলম্বন করে স্বজাতির অত্যাচার হতে সেখানে কেউ নিরাপদ থাকতে পারত না। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের স্বাধীনতা যে কেবল এসব ব্যাধি হতে মুক্ত তাই নয়, বরং ইসলামের উন্নতির ক্ষেত্রে তা পরম সাহায্যকারী এবং সহায়কও বটে। মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হবে খোদা

প্রদত্ত এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করা আর একে লুকে নিয়ে ধর্মীয় উন্নতির ময়দানে এগিয়ে যাওয়া। এই তত্ত্বাবধানকারী সরকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে তাদের উচিত, পার্থিব রাজত্বের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি নিজেদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও উন্নত রচনাবলীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের কল্যাণরাজি যাতে কোনভাবে তারাও লাভ করতে পারে সে চেষ্টা অব্যহত রাখা। আর এ কাজ ন্মৃতা, ভদ্রতা, ভালোবাসা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা ছাড়া সম্ভব নয়। খোদার বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা আর একই স্মষ্টাকে আরব ও ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের স্মষ্টা জ্ঞান করা এবং তাঁর দুর্বল সৃষ্টির জন্য আন্তরিক মমত্ববোধ প্রকাশ করাই হলো সত্যিকার অর্থে ধর্ম ও ঈমান।

তাই, সর্বপ্রথম এমন অজ্ঞ ইংরেজদের সন্দেহের নিরসন করা আবশ্যিক, যারা জ্ঞানের অভাবে ভাবছে যে, মুসলমানরা এমন এক জাতি যারা উপকারীর অপকার করে আর অনুগ্রহকারীদের সাথে পীড়ুদায়ক ব্যবহার করে এবং নিজেদের তত্ত্বাবধানকারী সরকারের অমঙ্গল চায়; অথচ অনুগ্রহকারীর প্রতি সদাচরণের তাগাদা পরিত্র কুরআনে যতটা রয়েছে, অন্য কোন গ্রন্থে তার কণামাত্রও পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাঁ'লা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِيِّ ذِي الْقُرْبَىٰ

(সূরা আন নাহল: ৯১)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْطَنَعَ لِيْكُمْ مَغْرُورًا فَجَارُوْهُ فَإِنْ عَجَزْتُمْ  
عَنْ مُحَاذَرَتِهِ فَادْعُوا اللَّهَ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّكُمْ قَدْ شَكَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ۔

অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তোমার প্রতি কোন পুণ্য করে তাহলে তাকে পুরস্কৃত কর, যদি পুরস্কার দিতে না পার তাহলে তার জন্য ততক্ষণ দোয়া কর যতক্ষণ সে জেনে না যায় যে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ; কেননা আল্লাহ তাঁ'লা গুণগ্রাহী আর তিনি কৃতজ্ঞদের ভালোবাসেন।\*১

নিবেদক- গোলাম আহমদ  
(খোদা তাকে মার্জনা করুন)

\* টীকা ১: হ্যরত মসীহ মওউদ (আ.) এই হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করছেন বলে মনে হয়: ‘যদি কোন ব্যক্তি তোমার প্রতি কোন পুণ্য করে তাহলে তাকে পুরস্কৃত কর, যদি পুরস্কার দিতে না পার তাহলে তার জন্য ততক্ষণ দোয়া কর যতক্ষণ তোমার এই উপলক্ষ্মি না হয় যে সত্যিই তুমি তাকে পুরস্কৃত করেছ।’ (মুসনাদ আহমদ)

## প্রথম অধ্যায়

কুরআন শরীফের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে  
অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ যেসব সাক্ষ্য রয়েছে  
সেই সব অকাট্য দলিলপ্রমাণাদির বিবরণ প্রসঙ্গে-

এ অধ্যায়ে নির্ধারিত প্রমাণাদি উপস্থাপনের পূর্বে ভূমিকামূলক এমন কিছু প্রারম্ভিক বিষয় উপস্থাপন করা আবশ্যিক যা পরবর্তীতে বেশিরভাগ প্রমাণাদির মর্ম উদ্ঘাটন এবং সেসবের স্বরূপ ও প্রকৃতি বোঝার জন্য সার্বজনীন মানদণ্ড হবে; তাই ভূমিকাস্বরূপ নিম্নোক্ত কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে:

**প্রথম প্রারম্ভিক বিষয়:** বহিস্থ বা এক্সট্রারনাল সাক্ষ্যাবলী বলতে বাইরের সেসব ঘটনাকে বোঝায় যা কার্যত এমন এক অবস্থায় বিরাজ করা বাঞ্ছনীয়, যা সম্পর্কে প্রণিধানে প্রমাণিত হয় যে, এই গ্রন্থটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে অথবা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার আবশ্যিকতা দৃশ্যমান। অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বলতে কোন গ্রন্থের স্বকীয় সেসব শ্রেষ্ঠত্ব বোঝায় যা স্বয়ং সে গ্রন্থে বিদ্যমান থাকে আর যা সম্পর্কে প্রণিধানে বিবেক নিশ্চিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য যে, তা খোদার উক্তি বা বাণী এবং মানুষ তা রচনায় সক্ষম নয়।

**দ্বিতীয় প্রারম্ভিক বিষয়:** পরিত্র কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহিস্থ বা এক্সট্রারনাল যেসব সাক্ষ্য রয়েছে তা চার প্রকারের। প্রধানত সেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ যা সংশোধনের মুখাপেক্ষী বিষয়াবলী থেকে নেয়া। দ্বিতীয়ত সেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পূর্ণতার মুখাপেক্ষী বিষয়াবলী থেকে নেয়া। তৃতীয় প্রকার সাক্ষ্য সেসব বিষয় থেকে নেয়া যা ঐশ্঵রিক শক্তি বা ঐশ্বী ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলী থেকে গ়ৃহীত। আর চতুর্থ প্রকারের সাক্ষ্য তা, যা অদ্বিতীয় বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু যেসব প্রমাণাদি পরিত্র কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ভেতরকার সাক্ষ্যস্বরূপ, তার সবগুলোই ক্ষমতা বা শক্তি-সংক্রান্ত প্রমাণাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলী হতে গ়ৃহীত। উল্লিখিত সাক্ষ্য বা প্রমাণাদির বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

সংশোধনের মুখাপেক্ষী বিষয় বলতে সেসব অবিশ্বাস, ঈমানহীনতা, শিরক ও অপকর্ম বোঝায় যা আদম সত্তান সত্য সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্মের স্থলে ধারণ করে রেখেছে আর যা সার্বিকভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত হওয়ার

ফলশ্রূতিতে এমন বিকট রূপ পরিগ্রহ করে থাকবে, খোদার চিরস্থায়ী করণা যার সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে।

**পরিপূর্ণতার মুখাপেক্ষী বিষয়** বলতে সেসব শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়াদি বোঝায় যা অসম্পূর্ণ বা ক্রটিযুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান আর জ্ঞানের উৎকর্ষের নিরিখে সেগুলো যে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ তা এ গ্রন্থে প্রমাণিত হয়। এ কারণে তা এমনই এক এলহামী গ্রন্থের মুখাপেক্ষী যা তাকে পরম উৎকর্ষের পর্যায়ে উপনীত করে।

### ঐশ্বী ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় আবার দুই প্রকারঃ

১) **বহিরাগত সাক্ষ্য:** বহিরাগত সাক্ষ্য বলতে সেসব বিষয় বোঝায় যা মানবীয় প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা বা মাধ্যম ছাড়াই খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্টি আর তা সকল তুচ্ছ বিন্দুকে সেই মর্যাদা, সম্মান, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে যা অর্জিত হওয়া যুক্তির নিরিখে সাধারণত অসম্ভব ঘনে করা হয় এবং যার দৃষ্টান্ত ধরাপৃষ্ঠে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

২) **অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য:** অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বলতে ঐশ্বী গ্রন্থের সেসব বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যাবলী বোঝায়, মানবীয় শক্তিবৃত্তি যার সামনে দাঁড়াতে অক্ষম এবং সত্যিকার অর্থে যা অতুলনীয় ও অনন্য প্রমাণিত হয়ে এমন অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান এক সন্তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে যেন তা খোদা দর্শনের আয়না।

**অদৃশ্য বিষয়াদি** বলতে সেসব বিষয় বোঝায় যা এমন এক ব্যক্তির মুখ হতে নিঃসৃত, যার সম্পর্কে এটি নিশ্চিত যে সেসব বিষয় বর্ণনা করা সম্পূর্ণভাবে তার শক্তির উৎর্বে; অর্থাৎ সেসব বিষয় সম্পর্কে ভাবলে এবং সে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সেসব বিষয় তার জানা ও দেখা জগতেরও অন্তর্ভুক্ত নয় আর চিন্তা বা অভিনিবেশের মাধ্যমেও তার দ্বারা তা লাভ হতে পারে না। অধিকন্তে যুক্তির নিরিখে তার সম্পর্কে এই ধারণা করা অযৌক্তিক যে, সে হয়ত কোন পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে তা অর্জন করে থাকবে, যদিও সেসব বিষয় অর্জন করা হয়ত অন্য এক ব্যক্তির জন্য সাধ্যাতীত বিষয় নয়। অতএব, এই বিশ্লেষণের নিরিখে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অদৃশ্য-সংক্রান্ত বিষয়াদি বলতে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বোঝায় আর তা আপেক্ষিক ও ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় বিষয় অর্থাৎ এমন বিষয়, যা (কেবল) বিশেষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরোপিত হলে তার জন্য অদৃশ্য বিষয় (শব্দ) প্রযোজ্য,

কিন্তু একই বিষয় অন্য কিছু ব্যক্তির প্রতি যখন আরোপ করা হয়, তাদের মাঝে সেই যোগ্যতা দৃষ্ট হয় না।

## উপমা

(ক) যায়েদ এক ব্যক্তি যে আমাদের এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। বকর অপর এক ব্যক্তি, যে যায়েদের ৫০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছে, যার যুগ যায়েদ পায়নি এবং তার ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মত কোন জাগতিক বা বাহ্যিক মাধ্যমও তার ছিল না। অতএব, বকর যেসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, যদিও তার জন্য তা অদৃশ্য বিষয় নয় কারণ তা তারই ঘটনা, তার দেখা ও জানা জগৎ। কিন্তু সেসব ঘটনা সম্পর্কে যায়েদ যদি শতভাগ সঠিক সংবাদ আগাম প্রদান করে থাকে তাহলে বলা হবে, যায়েদ অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছে। কেননা সেসব বিষয় যায়েদের জন্য জানা ও দেখা বিষয় নয়, অধিকন্তে তা জ্ঞাত হওয়ার জন্য যায়েদের আয়ত্তে বাহ্যিক বা বহিরাগত কোন মাধ্যমও ছিল না।

(খ) বকর একজন দার্শনিক, যে দীর্ঘকাল গভীর মনোযোগ সহকারে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং এতে চিন্তা ও প্রগিধানের কল্যাণে সৃষ্টি দার্শনিক সত্য উদঘাটনে দক্ষতা অর্জন করেছে। যৌক্তিক জ্ঞান অর্জন, পূর্ববর্তীদের রচনাবলী অধ্যয়ন এবং প্রাচীন পঞ্জিতদের গবেষণা ভাস্তার হস্তগতকরণ; অধিকন্তে অব্যাহত প্রগিধান, অনুশীলন, মাথা খাটানো এবং যুক্তিবিদ্যার নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে জ্ঞানের অনেক নিষ্ঠুর সত্য ও সুনির্ণিত এবং সুদৃঢ় প্রমাণাদি তার কর্তৃস্থ। অপরদিকে যায়েদ এমন এক ব্যক্তি, যার সম্পর্কে এটি প্রমাণিত বিষয় যে, সে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের একটি অক্ষরণও পড়ে নি আর না দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান আছে। অধিকন্তে চিন্তা ও অভিনিবেশকে কাজে লাগানোর কোন চর্চা বা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাও তার নেই। কোন জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে তার মেলামেশা বা উঠাবসাও নেই বরং নিরেট নিরক্ষর আর অশিক্ষিতদের সাথে সব সময় উঠাবসা করে। অতএব, বকর যেসব জ্ঞান প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে কষ্ট ও সাধনার গুণে অর্জন করেছে তা তার জন্য অদৃশ্য কোন বিষয় নয়। কেননা দীর্ঘকালের কঠোর শ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে সে সেই শিক্ষা অর্জন করেছে। কিন্তু যায়েদ সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর হয়েও জ্ঞান ও দর্শনের সৃষ্টাতিসৃষ্টি

রহস্যাবলী এত পরিষ্কারভাবে যদি বর্ণনা করে যাতে তিল পরিমাণও অসামঙ্গস্য থাকে না বরং উন্নত জ্ঞানের স্পর্শকাতর ও সুমহান শাশ্বত সত্য বিষয়াদিকে এত নিপুণভাবে প্রকাশ করে যে, এতে কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা দৃশ্যমান হয় না। অধিকন্তে প্রজার সূক্ষ্ম দিকগুলোর এমন এক পূর্ণ সমাহার সে উপস্থাপন করে যা ইতিপূর্বে এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা অন্য কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব হয় নি। অতএব, সকল বিষয়ে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী সমৃদ্ধ তার নিখুঁত বর্ণনা অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্গত হবে। কেননা সে এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছে যা বর্ণনা করা তার শক্তি, যোগ্যতা এবং জ্ঞানবুদ্ধির উর্ধ্বে এবং তা বর্ণনা করার জন্য তার কাছে জানা ও সাধারণ উপকরণের কোন কিছুই ছিল না।

(গ) বকর একজন পাদ্রি বা পণ্ডিত ব্যক্তি বা অন্য কোন ধর্মের আলেম ও বিদ্঵ান আর ছেট-বড় সব বিষয়ে সে বিশেষজ্ঞ। নিজ জীবনের বড় একটি অংশ সে বহু বছরের শ্রম ও সাধনায় অতিবাহিত করে স্বীয় ধর্মের অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য বিষয়াদি উদ্ঘাটন করেছে। আর সেই ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থে যেসব সঠিক ও আন্ত বিষয়াদি রয়েছে বা যেসব সূক্ষ্ম ধর্মীয় তত্ত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার পুরোটাই দীর্ঘদিনের চিন্তা, প্রণিধান ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সে আয়ত্ত করেছে।

অপরদিকে যায়েদ এমন এক ব্যক্তি যার সম্পর্কে প্রমাণিত যে, সে অশিক্ষিত হওয়ার কারণে কোন বই পড়তে পারে না। বকর যদি সেসব বইপুস্তক থেকে কিছু বিষয়, মসলা-মসালেল বা ঘটনাবলী বর্ণনা করে তা অদৃশ্য বিষয় বলে গণ্য হবে না। কারণ বকর উৎকৃষ্ট শিক্ষার কল্যাণে এবং দীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলশ্রুতিতে গ্রহে বর্ণিত এসব বিষয়াদি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। কিন্তু যায়েদ, যে পুরোপুরি নিরক্ষর, সে যদি এমন সব গভীর সত্য বিষয়াদি বর্ণনা করে যা পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ব্যক্তি ছাড়া অবগত হওয়া সাধারণত অসম্ভব, আর সেসব গ্রন্থের এমন সব সূক্ষ্ম সত্য তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরে যা বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যদের অজানা, একই সাথে এসবের এমন সব ত্রুটিবিচ্যুতি সাধারণত যা চিহ্নিত করা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছাড়া অসম্ভব, একইসাথে সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ ও গবেষণার এই কাজে যদি নয়ীরবিহীন শ্রেষ্ঠত্ব রাখে তাহলে তার সম্পর্কে একথা বলা সত্য ও যথার্থ হবে যে, সে অদৃশ্য বিষয়াদি বর্ণনা করেছে।

## বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশেষণ

কোন আপত্তিকারী এই ভূমিকায় হয়ত এই প্রশ্ন তুলতে পারে যে, ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে যেসব সহজ ও সাদামাটা বিষয়াদি সংকলিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে তা শ্রুত মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েও বর্ণনা করা সম্ভব, এর জন্য শিক্ষিত হওয়া আবশ্যিক নয়। কেননা নিরক্ষর কোন ব্যক্তি একটি ঘটনা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে শুনে বর্ণনা করতেই পারে। এগুলো এমন কোন জ্ঞানগর্ত বিষয় নয় যা রীতিমত শিক্ষার্জন ছাড়া অবগত হওয়া অসম্ভব হতে পারে। এমন আপত্তিকারীকে এই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তোমাদের গ্রন্থাবলীতে এমন কোন সূক্ষ্ম সত্য আছে কি, যা বড় আলেম ও বিদ্যম্ভ পণ্ডিত ছাড়া অন্য কোন মানুষের পক্ষে উদ্ঘাটন করা অসম্ভব, বরং কেবল সেসব লোকের ধ্যানধারণা সর্বপ্রথম এসব সত্যের প্রতি নিবন্ধ হয় যারা দীর্ঘকাল সেসব গ্রন্থ অধ্যয়নে রাঙ্গ পানি করেছে এবং বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে গিয়ে দক্ষ শিক্ষকদের কাছে জ্ঞান অর্জন করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর সে যদি এটি দেয় যে, এমন উন্নত পর্যায়ের সূক্ষ্ম সত্য আমাদের গ্রন্থে নেই বরং এসব গ্রন্থ অগভীর, ভাসা ভাসা ও অন্তঃসারশূন্য কথায় পরিপূর্ণ, সাধারণ মানুষও যা সামান্য চেষ্টায় অবগত হতে পারে। অপরিপক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন এক বালকও ভাসা ভাসা দৃষ্টিপাতে এর গভীরে অবগাহন করতে পারে আর যা অবগত হওয়া জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের অঙ্গরূপ কোন বিষয় নয়, বরং তা সর্বোচ্চ সেসব পুস্তক পুস্তিকাতুল্য যাতে কল্পকাহিনী লেখা হয় বা শুধু শিশু-কিশোর ও সাধারণ পাঠকের জন্য যা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। আক্ষেপ! তুচ্ছ ও নিম্নমানের এমন বইপুস্তকের জন্য। কেননা এটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট বিষয় যে, কোন গ্রন্থে বিধৃত বিষয়াদি যদি কেবল সাধারণ মানুষের স্তুলবুদ্ধির গঠিতেই সীমাবদ্ধ থাকে আর তা সূক্ষ্ম সুন্দর সত্যের স্তর হতে সম্পূর্ণভাবে অধঃপতিত হয় তাহলে সে গ্রন্থ কোন উন্নত গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত হয় না বরং তা বিবেকবানদের দৃষ্টিতে তেমনই অগভীর ও নিম্নমানের হয়ে থাকে যেমনটি কিনা হয়ে থাকে এতে বর্ণিত বিষয়াদি। আর এর বিষয়বস্তু এমনও নয় যা প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদির অস্তর্ভুক্ত গণ্য করা যেতে পারে বা যা উন্নত সত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলে মনে করা যেতে পারে। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের এলহামী গ্রন্থ সম্পর্কে দাবি করে যে, এতে বর্ণিত সকল বিষয় অগভীর ও হালকা আর তা সেসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্য হতে রিক্তহস্ত ও খালি, যা অবগত হওয়া জ্ঞানী, চক্ষুশ্মান ও চিন্তাশীলদেরই বিশেষত্ব। এমন

ব্যক্তি নিজেই নিজ গ্রন্থের অসমান করে আর এর ফলে তার অহংকারও বজায় থাকতে পারে না। কেননা যে বিষয়ের অন্তর্নিহিত মর্ম উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও তার অংশীদার ও সমকক্ষ, তা অর্জন করে সে এমন কোন জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না যা সাধারণ মানুষ হতে তাকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবে বা তাকে পণ্ডিত অথবা জ্ঞানী উপাধিতে ভূষিত করবে; বরং সেও পশ্চতুল্য সাধারণ মানুষেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে তার উপলব্ধি সাধারণ মানুষ থেকে উন্নতমানের নয়। নিঃসন্দেহে এমন অসার ও নিম্নমানের গ্রন্থাবলীতে বিধৃত বিষয়াদি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্গত হবে না। এছাড়া অতিরিক্ত শর্ত হলো, সেসব গ্রন্থের শিক্ষামালা এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যার সম্পর্কে এই ধারণা রাখা যুক্তিযুক্ত হবে যে, প্রত্যেক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষও একটু চিন্তা করলেই এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কেননা এসবের বিষয়বস্তু যদি সুপ্রচারিত ও সুবিদিত না হয় তাহলে তা যত অন্তঃসারশূন্য ও স্তুল কথাই হোক না কেন, যে ভাষায়ই সেসব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে সে ভাষা সম্পর্কে অনবিহিত ব্যক্তির জন্য তা অজানা, অদেখা বা অদৃশ্য বিষয়ই গণ্য হবে।

এটি সে পরিস্থিতিতে হবে যখন স্বীয় এলহামী গ্রন্থ সম্পর্কে কোন জাতির দৃষ্টিভঙ্গি এটিই হয়ে থাকে যে, তাদের ঐশীগ্রহ সূক্ষ্ম সত্য থেকে রিঙ্গহস্ত ও বঞ্চিত।

কিন্তু কোন জাতির মতামত যদি এটি হয়ে থাকে যে, তাদের ঐশীগ্রহে এমন সূক্ষ্ম সত্য বিষয়াদিও রয়েছে যা আয়ত্ত করা কেবল সেরূপ মহান জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের জন্য সম্ভব যাদের জীবনকাল সেসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও প্রণিধানের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। অধিকন্তু তাতে এমন সব সত্যও রয়েছে যার গভীরে কেবল তারাই অবগাহন করতে পারে যারা অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং যারা চিন্তা ও জ্ঞানে গভীরতা রাখে— তাহলে এ উত্তরের মাধ্যমে একান্তভাবে আমাদের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। কেননা একজন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ব্যক্তি যদি এসব সূক্ষ্ম সত্য বিষয়াদি স্বীয় গ্রন্থাবলী হতে বর্ণনা করে যা তার দাবি অনুসারে সাধারণ জ্ঞানী মানুষও বর্ণনা করতে অক্ষম, বরং তা কেবল বিশেষ লোকদের কাজ— এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যদি নিরক্ষর প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই নিরক্ষরের কথা নিঃসন্দেহে অদৃশ্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হবে— এটিই তৃতীয় উপমার অর্থ।

## সতর্কীকরণ

অদৃশ্য বিষয়াদি বাস্তবে পূরণ হওয়াই সেগুলোর আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার পূর্ণ প্রমাণ। কেননা যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, অদৃশ্য বিষয় আবিক্ষার করা সৃষ্টির শক্তির উর্ধ্বে। আর যে বিষয় সৃষ্টির শক্তির উর্ধ্বে, তা খোদার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। অতএব, এই যুক্তি থেকে প্রতিভাত হয়, অদৃশ্য বিষয়াদি খোদার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং খোদার পক্ষ থেকে হওয়া একটি সুনিশ্চিত বিষয়।

**তৃতীয় প্ররম্পরিক বিষয়:** যা সম্পূর্ণভাবে খোদা তাঁলার মহাশক্তির গুণে প্রকাশ পায়, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কোন সৃষ্টিই হোক অথবা তাঁর পরিত্র গ্রহাবলীর মধ্য থেকে কোন গ্রহই হোক না কেন, যা শব্দ ও অর্থের দিক থেকে তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত, কোন সৃষ্টি অনুরূপ কোন কিছু সৃজন করতে পারবে না— এই বৈশিষ্ট্য এর মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয়। সর্বজনীন এই নীতি যা খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত সকল সৃষ্টির বেলায় প্রযোজ্য, তা দু'ভাবে প্রমাণিত হয়। প্রধানত কিয়াস বা অনুমানের মাধ্যমে, কেননা সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডে খোদার স্বীয় সত্তা, এক ও অদ্বিতীয় হওয়া আবশ্যক। তাঁর কোন সৃষ্টি বা কথায়\*(টীকা-১১) ও কর্মে সৃষ্টির অংশীদারিত্ব বৈধ নয়। এর প্রমাণ হলো, যদি তাঁর কোন একটি সৃষ্টি বা কথা ও কর্মে সৃষ্টিবস্তুর শরীর বা অংশীদারিত্ব বৈধ হয়, তাহলে সকল বৈশিষ্ট্য এবং সকল কর্মের ক্ষেত্রেও তা বৈধ হওয়ার কথা। যদি সব গুণ ও কর্মে তা বৈধ হয় তাহলে অন্য কোন খোদার অস্তিত্ব থাকাও বৈধ হতো। কেননা যে বস্তুতে বা যার মাঝে খোদার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তাঁরই নাম খোদা। কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে স্রষ্টার কিছু বৈশিষ্ট্য যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলেও করেকটি বৈশিষ্ট্যে সে স্রষ্টার অংশীদার প্রমাণিত হলো। কিন্তু বিবেক ও যুক্তির নিরিখে স্রষ্টার অংশীদারিত্ব স্পষ্টতঃই অসম্ভব। অতএব, এই যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খোদার স্বীয় সকল গুণাবলী, কথা ও কর্মে এক ও অদ্বিতীয় হওয়া আবশ্যক। আর তাঁর সত্তা সেসব ইতর বিষয়াদির উর্ধ্বে যা স্রষ্টার সমকক্ষতায় পর্যবসিত হতে পারে। এ দাবির দ্বিতীয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় উৎকর্ষ আরোহ যুক্তির মাধ্যমে। যাকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে উৎসারিত এমন প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে

---

বি. দ্র.: টীকা নম্বর এগার (১১) এই পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় আছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে পড়ে নিন। —অনুবাদক

প্রণিধানে এবিষয়টি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কেননা বিশ্বজগতের প্রতিটি খুঁটিনাটি বা অগুপরমাণু যা খোদার পূর্ণ শক্তিবলে প্রকাশিত; এর প্রতিটিকে যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যেমন মশামাছি ও মাকড়শা ইত্যাদি তুচ্ছততুচ্ছ সৃষ্টির কথাও যদি চিন্তা করি, তাহলে এসবের মাঝে এমন কোন কিছু কখনও আমাদের চোখে পড়ে না যা সৃষ্টি করার শক্তি মানুষের রয়েছে। বরং এসব কিছুর গঠন ও সৃষ্টিগত বিন্যাস সম্পর্কে প্রণিধানে খোদার সর্বশক্তিমান হাতের এমন বিশ্ময়কর নির্দেশন তাদের দেহে দৃশ্যমান ও বিদ্যমান দেখি, যা বিশ্বসৃষ্টির অঙ্গের সন্দেহাতীত ও সমুজ্জ্বল প্রমাণ। এসব প্রমাণ ছাড়াও সকল বুদ্ধিমান মানুষের জন্য একথা স্পষ্ট, যা কিছু খোদার শক্তিশালী হাতের কল্পাণে অঙ্গে লাভ করেছে, অন্য কেউ যদি তা বানানোর ক্ষমতা রাখতো, তাহলে কোন সৃষ্টিই সেই প্রকৃত সৃষ্টির অঙ্গের পূর্ণ প্রমাণ বহন করতো না। এছাড়া বিশ্বসৃষ্টাকে চেনার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহের দোলাচলে দুলতো। কেননা খোদার পক্ষ থেকে যেসব বস্তু উৎসারিত হয়েছে এর কোন কোনটি খোদা ছাড়া অন্য কেউও যদি বানাতে সক্ষম হয়, তাহলে এ কথার কী প্রমাণ আছে যে, অন্য কেউ সাকুল্য জিনিস বানাতে পারবে না? এখন, যেহেতু দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, যেসব বস্তু খোদার পক্ষ থেকে, প্রধানত সেসবের অনন্যতা, দ্বিতীয়ত সেই অনন্যতা তাদের খোদার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়া সেসবের আল্লাহর পক্ষ থেকে উৎসারিত হওয়ার আবশ্যকীয় শর্ত। অতএব, এই গবেষণার মাধ্যমে সেসব মানুষের ভাস্তু স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে গেলো যারা বলে, ঐশীবাণী অনন্য হওয়া আবশ্যক নয় বা এর অনন্যতা, এর খোদার পক্ষ থেকে আসার প্রমাণ নয়! এখানে পূর্ণযুক্তি উপস্থাপনের মানসে তাদের হৃদয়ে যে একটি সন্দেহ জাগে তা দূরীভূত করা সমীচীন। আর তা হলো অদূরদর্শীতার কারণে তাদের হৃদয়ে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল যে, পৃথিবীতে মানুষের এমন অনেক বাণী বা গ্রন্থ রয়েছে যার সমর্যাদার অন্য কোন বাণী আজ পর্যন্ত সামনে আসে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খোদার বাণী বলে গণ্য হতে পারে না! কিন্তু স্পষ্ট হওয়া উচিত, এই সন্দেহ সঠিক ধ্যানধারণার অভাবে দেখা দিয়েছে। নতুনা এটি স্পষ্ট যে, কোন মানুষের কথা যতই স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও উন্নতই হোক না কেন সে সম্পর্কে একথা বলা বৈধ হতে পারে না যে, সত্যিই তা রচনা করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে আর রচয়িতা এক্ষেত্রে খোদার কাজ করেছে! বরং সামান্য পরিমাণ বিবেকবুদ্ধি যার আছে, সে ভালোভাবে জানে যে, মানবীয় শক্তিবৃত্তি যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার সৃজন

মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে নয়, নতুবা কোন মানুষ তা বানাতে সক্ষম হতো না। একটি বাণী বা গ্রন্থকে মানুষের কথা আখ্যা দিয়ে তোমরা নিজেরাই যখন স্বীকার করছ যে, মানবীয় শক্তিবৃত্তি তা বানাতে সক্ষম, সেখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, যেখানে মানবীয় বৃত্তিসমূহ তা প্রস্তুত করতে সক্ষম সেখানে তা অনন্য মর্যাদা-সম্পন্ন কি করে হলো? অতএব, এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে উন্নাদ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অর্থাৎ এক বন্ধ সম্পর্কে প্রথমে বলে, তা মানবীয় শক্তিবৃত্তির সৃষ্টি আবার বিড়বিড় করে বলে, এখন মানবীয় শক্তিবৃত্তি এ বন্ধের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম ও অসমর্থ। এই উন্মাদনা-প্রসূত কথার সারমর্ম হবে মানবীয় শক্তিবৃত্তি কোন বন্ধ বানাতে সক্ষম, আবার অক্ষমও। অধিকন্তু আজ পর্যন্ত কোন মানুষ এই দাবি করে নি যে, আমার কথা ও আমার সৃষ্টি, খোদার কথা ও সৃষ্টির মত অতুলনীয় ও অনন্য। আর কোন নির্বোধ অহংকারী যদি এমন দাবি করতো তাহলে তার মুখে চুনকালি লেপনকারী তার চেয়ে উন্ম সহস্র সহস্র লেখক দাঁড়িয়ে যেতো। সমগ্র বিশ্বজগতকে স্থীয় বাণী বা গ্রন্থের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ ও অক্ষম আখ্যায়িত করা, কঠোর হতে কঠোরতর ভাষায় তাদের অবিশ্বাসী, অভিশঙ্গ ও জাহানামি সাব্যস্ত করা বরং একপ কোন কিছু রচনায় অক্ষমদের, অস্বীকারের ক্ষেত্রে (খোদার পক্ষ থেকে) মৃত্যুর শাস্তি নির্ধারণ করার মাধ্যমে বারংবার এ মর্মে উদ্বৃষ্ট করা যে, তারা যেন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে ঘাবতীয় প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক জোটবদ্ধতা এবং সাহায্য সহযোগিতায় কোন ত্রুটি না করে আর নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মোকাবিলা করে। কিন্তু কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করেই যদি তারা এভাবে অস্বীকার করতে থাকে, তাহলে তাদের উচিত হবে নিজেদের ঘরকে বিরান, স্ত্রীদের দাসী-বাঁদি এবং নিজেদেরকে মৃতবৎ জ্ঞান করা। এমন দাবি এবং এত জোরালো দাবি কোন যুগে কোন মানুষ করেছে কি? মোটেই নয়— এটি কেবল খোদার মহিমা। অতএব, যেখানে কোন মানুষ স্থীয় উক্তি বা রচনার অনন্যতার দাবি করে নি, আপন শক্তিবৃত্তিকে মানবীয় শক্তিবৃত্তি হতে বেশি কিছুই জ্ঞান করে নি বরং শত শত নামীদামী কবি যুদ্ধ করে মরার পথ বেছে নিয়েছে কিন্তু কুরআনের একটিমাত্র সূরা-র সমতুল্য কোন কিছুও রচনা করতে সক্ষম হয় নি, সেখানে অনর্থক এই গো-বেচারাদের অর্থহীন রচনা বা উক্তিকে অতুলনীয় আখ্যায়িত করা এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে করা চরম অঙ্গতা ও অন্ধত্বই বটে। কেননা এত স্পষ্ট প্রমাণাদির উপস্থিতিতে খোদা ও মানুষের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য দেখেও যে ব্যক্তি দেখে না, সে অঙ্ক এবং নির্বোধ ছাড়া আর কী?

অতএব, এই পুরো গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অনন্যতার প্রকৃত অর্থ ও মাহাত্ম্য ঐশ্বী কর্ম ও ঐশ্বীবাণীরই বিশেষত্ব। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই জানে যে, খোদার ঈশ্বরত্ব মানার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা বুদ্ধি বা বিবেকের কাছে রয়েছে তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে উৎসারিত প্রতিটি বিষয় অনন্যতার এমন স্তরে উপনীত, যা এক-অদ্বিতীয় স্ফুটার অস্তিত্বেরই অকাট্য প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে। আর এ মাধ্যম যদি না থাকতো তাহলে বিবেক বা বুদ্ধির জন্য খোদা পর্যন্ত পৌছার পথ রুদ্ধই থেকে যেত। আর খোদাকে চেনা যেখানে এই নীতির সাথে সম্পৃক্ষ যে, তাঁর পক্ষ থেকে যা কিছু রয়েছে, তাকে অনন্য ও অতুলনীয় বলে মেনে নাও! সেখানে বান্দাদের জন্যও সেই বৈশিষ্ট্য প্রস্তাব করা বিবেক ও ঈমানেরই মূলোৎপাটনের নামান্তর যা খোদারই নিরক্ষুশ বৈশিষ্ট্য। অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রমাণাদির ভিত্তিতে একথা সাব্যস্ত হয় যে, বান্দার কোন কাজই অনন্য বা অতুলনীয় নয়। পক্ষান্তরে খোদার সকল কাজ এবং যাকিছু তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে তা সবই অতুলনীয়।

এমন নিখুঁত আরোহ যুক্তিতেও তোমাদের যদি বিশ্বাস না থাকে, যা খোদার সমূহ প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে; তাহলে যুক্তি-বুদ্ধি বা প্রাকৃতির নিয়মের কথা আর মুখেই এনো না, বরং যুক্তি ও দর্শনের অকেজো গ্রন্থাবলী ছিঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দাও। একটি মাছি যা দেখতেও রঞ্চিতে বাধে, স্বীয় বাহ্যিক আকৃতি ও অভ্যন্তরীণ গঠনবিন্যাসে এতটা অনন্য যে, এর ওপর দৃষ্টিপাতে খোদার পক্ষ থেকে এর সৃষ্টি হওয়া স্বপ্রমাণিত। কিন্তু খোদার বাণী বা উক্তির বাণিজ্য ও প্রাঞ্জলতা কি এতটা অতুলনীয় ও অনন্যও হতে পারে না, যার ওপর দৃষ্টিপাতে প্রমাণিত হবে যে, সেই বাণী বা গ্রন্থ খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত! এর অন্যথা ভাবতে তোমাদের কী লজ্জাও হয় না? হে উদাসীনরা! হে বিবেকবুদ্ধিহীনরা! খোদার বাণীর বাণিজ্য ও আলক্ষ্যারিকতা কি মাছির ডানা ও পা থেকেও নিম্নমানের এবং গুণগত মানে একেবারেই তুচ্ছ?

কতই না পরিতাপের বিষয়! একটি মাছির সৃষ্টি-শৈলী তথা বিন্যাস ও গঠন সম্পর্কে তোমরা পরিষ্কারভাবে স্বীকার কর যে, এমন বিন্যাস ও গঠন প্রদান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না; অথচ ঐশ্বীবাণী বা ঐশ্বী গ্রন্থ সম্পর্কে বল যে, তা ক্রিমভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে! বরং বিতর্ক ও বিতঙ্গার ছলে এই যুক্তি দেখাও যে, যদিও এ পর্যন্ত কোন মানুষ এটি বানাতে সক্ষম হয় নি কিন্তু এ কথার কী প্রমাণ আছে যে ভবিষ্যতেও পারবে না?

ہے نیروُدھ را! اُر پرماغ تا-ہی، یا تو مرا مしゃ، ماحیٰ اور بُکھرِ پاتا یہ پاتا یہ پریشانِ بآبادی کے لکھ کر اور بُکھر کر، کیسٹ اُر اُر شری جیوتی دیکھتے گیوں تو مادے کے صوچ پُنچار نیا یہ انکہ یا آپسا ہوئے یا اُر۔ تاہی تو مرا ماحیٰ کے سب تبارے کے بُشِ بُریٰ ہوئے ماحیٰ جیوتی جیوتیتے نی । یہ سب شد سمسار کے تو مرا بُل یہ، اگر لے سبیّ اُر سہ خُدَادارِ مُعُذ خُدَادار کے نیسٹ ہوئے ہے، سے گولے کے تو مرا سہی لالا کے ماتو ہے کر نا یا مُوماھی کے مُعُذ خُدَادار کے نیسٹ ہوئے، اُر سہ تومادے کے دارِ گناہِ انُسَارِ مانوں مُدھ تیریں شکی را خُدَادار نا ٹھک ای کیسٹ خُدَادار کو کہا یا اُر شری باغی بانا گوں کے شکی را خُدَادار! اُر سہ تومادے کا کھے پُوکا ماماکڈ اُر تاہی مُنْجُوت و پُچنڈ ہوئے گل یہ، خُدَادار اُتکی اس بارے کے سماں پُریٰ ہوئے نی । ہے اُر جڑا! خُدَادار باغی یا دی اننی نا-ہی ہوئے تاہلے کیا پتھر و بُکھر کے پڑھلے کے اُن نی ہو گوں کے سُنْبَاد تومادے کا کھے کو کھے خُدَادار کے پُنچلے؟ تو مرا آدمی چنٹا بآباد کر نا یہ، اُر شری باغی کے بُنیاس و گستنے اکٹی کیٹر دہا بیوی کے بُنیاس پر نیا یہ عُرکَرْتَاد و یا نا ٹھک را کھے تاہلے اُٹی خُدَادار بیرنگدی اپنی کے نام اتھر را۔ اُر سہ تومادے کے ٹھے یہ سماں دیلے نا اوار ٹوچھر ہاتھے سبیّ سُنْدَار بیرنگدی سہی پرماغ ٹولے دیلے، یا عُرکَرْتَاد کر رون نی ।

جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے      قمر ہے چاند اور لوں کا ہمارا چاند قرآن ہے  
کُر آنے کے سُو نیز و سُو سماں سکلن مُسُلِمَانے کے پرانے کے جیوتی । اننی دے رائے چاند  
ہلو چند، کیسٹ اُما دے رائے چاند ہلو کُر آن ।

نظیر اس کی نہیں جب تی نظر میں فکر کر دیکھا      بھلا کیوں گمراہ نہ ہو یکتا کلام پاک رحمان ہے  
آما دا چنٹا کر دے دیکھتے کیسٹ اُما دے دیکھتے آما دا ار کوئی کوئی کوئی کوئی  
جنودی خُنچے پاہی نا  
آوار تا اننی کنہی ہی وہ نہ کوئی کوئی کوئی کوئی  
بہار جاو دا پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں      نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستا ہے  
اُر پر تیکتی باکے چرخا یہی بسانت بیرا جمان । سہی گون ڈیا نے وہ نہی اور  
اُر مات کوئی باغان وہ نہی ।

کلام پاک یزاداں کا کوئی ثانی نہیں ہر گز      اگر لولوئے یعنی ہے وگر لعل بد خشائ ہے

خُودا ر پوریٰ بآنیٰ آدی کو ان سماں کش نئے، ہو ک نا تا و مانے ر موجو  
آر بآدا خشائح اے- اے مانیکی

خدا کے قول سے قول بشر کیوں نکر بابر ہو      وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے  
مأنویہ ر عقیلی، کیا بآبے خُودا ر کथا ر سماں ہتے پارے؟ سے خانے ر یہے  
شکیمتو آر ار اخانے دُریلتا- دُریل ر پارکی اتی سپسٹ ।

ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار علیٰ      سخن میں اس کے ہتھیاریں مقدور انساں ہے  
فیرشنا یار سانیہ اجتناب کثا سُکار کر رے، سے خانے کथا ر تاں  
سماں کشنا آرجن مانویہ ر پکھے کی کر رے سبھی ہتے پارے؟

بنائیں اک پاؤں کیڑے کا بشر ہر گز      تو پھر کیوں نکر بانا نور حق کا اس پہ آساں ہے  
مانویہ یہانے کو نباہے ای کیٹپاتھے ر اکٹی پا پارکشنا سکھم نیا،  
سے خانے ساتھیں جو ای کی کر رے سبھی ہتے پارے؟

ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریاں کا      زبان کو تھام لواب بھی اگر کچھ بونے ای ماں ہے  
ہے مانویہ، خُودا ر ماحا اٹھر اتی کیڑھا تا ہلے و اندھائیل ہو، یتکیمیں  
یتھان و یادی خاکے تا ہلے اخن و سماں آتھے مُرخ ساملا و،

خدا سے غیر کو ہتھ بانا سخت کفرال ہے      خدا سے کچھ ڈریا رویہ کیسا کذب و ہتھاں ہے  
انجیدہ ر کے خُودا ر سماں کش بانیو تھا وہ کو فری । ہے بکھر گان । خُودا کے  
کیڑھا تا ہلے و بھی کر رے । میثھا چار و اپنوا د آر اپ کر را- اتی کے ملن بیچا ر؟  
اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذات واحد کا      تو پھر کیوں اس قدر دل میں تمہارے شرک پہاں ہے  
یادی خُودا ر اک و اندھیاں ساتھا کے مئے خاک تا ہلے تو مادے ر ہدیہ  
کئے اتھ پارکشنا کیمیاں؟

یہ کیے پڑگئے دل پر تمہارے جھل کے پر دے      خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزاداں ہے  
تومادے ر ہدیہ اتھ اتی پر دل؟ تومرا اسیتے نیپاتیت،  
بیرات ہو، یادی کیڑھا خُودا بھیتی خاکے ।

ہمیں کچھ کیس نہیں جھائیو! نصیحت ہے غربانے      کوئی جو پاک دل ہوے دل و جاں اس پر قرباں ہے  
آما دے ر ہدیہ کو ان بیشے نئے، اتی بینیا بانیت سادھن دے ش ما تر । یادی  
کے او پوری مانا ہوے خاک تا ہلے آما ر اسٹرا اٹھا تا ر جنی نیبیدیت ।

এ পর্যন্ত ঐশী বাণী বা কুরআনের অনন্যতা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা এ যুগের দুর্বল বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ও অতি স্বাধীন মুসলমানদের জন্য বর্ণিত হয়েছে, ইংরেজীর সোফিস্ট দর্শন (যারা বক্তব্য অস্তিত্ব স্বীকার করে না বা যারা সত্যকে আপেক্ষিক গণ্য করে) ও প্রতারণামূলক শিক্ষা যাদেরকে দাস্তিক ও অন্তর্দৃষ্টিহীন করে পরিত্র কুরআনের অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া এবং এর খোদার পক্ষ থেকে হওয়ার আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারে প্রবৃত্ত করেছে আর যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে, পরিত্র কুরআনে ঈমান এনে এবং কলেমা পড়ার ভান করে অবিশ্বাসীদের ন্যায় আল্লাহর বাণীকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক তুচ্ছ মানুষের কথার মত মনে করে বসে আছে আর ওয়ামা কাদারঞ্জাহা হাঙ্কা কাদরিহী-এর সত্যায়নস্তল হয়ে খোদার মহাক্ষমতা এবং প্রজ্ঞাসমূহকে ভুলিয়ে দিয়েছে, যা দেখার জন্য খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বা উৎসারিত প্রতিটি বক্তব্য খোদা-দর্শনের আয়নাস্বরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু এসব সত্য এত প্রদীপ্তি ও স্বচ্ছ যে, কোন ব্যক্তি মুসলমানদের জামা'তভুক্ত না হলেও সার্বিক অর্থের নিরিখে সেও বুঝতে পারে যে, যে বাণীকে আল্লাহর বাণী বলা হবে এর অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া আবশ্যিক। কেননা সকল বিবেকবান ব্যক্তি খোদার প্রকৃতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করে এবং যা তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত সকল বক্তব্যকে, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন, সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ও মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে দেখে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত কোন বক্তব্য এমন নয় যার নজির উপস্থাপনে মানুষ সক্ষম হবে। এছাড়া কোন বিবেকবান মানুষের বোধবুদ্ধি এ কথা প্রস্তাব করতে পারে না যে, খোদার সন্তা বা তাঁর গুণাবলী অথবা তাঁর কর্মে সৃষ্টির অংশীদারিত্ব বৈধ।

উল্লিখিত প্রমাণাদি ছাড়াও আরও অনেক দিক আছে যার মাধ্যমে খোদার বাণীর অনন্য হওয়া আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সর্বোজ্জ্বল বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই প্রমাণগুলোর একটি সেসব ভিন্ন ফলাফলে দেখা যায় যা কোন একটি কাজের সময় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাওয়া অবধারিত। এর বিশদ বিবরণ হলো, সকল বিবেকবানের কাছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কয়েকজন সুপণ্ডিত ও সুলেখক, স্ব স্ব জ্ঞানগত যোগ্যতার জোরে যখন এমন এক প্রবন্ধ লিখতে যাবে যার অত্যুক্তি, মিথ্যাচার, অপ্রয়োজনীয়, বাজে, হাস্যক্রম ও অর্থহীন বাক্য এবং অস্পষ্ট ও আগোছালো

ভাষা আর প্রজ্ঞা ও বাণিজ্যের জন্য অন্তরায়, এমন সব বিষয় হতে, অধিকন্তু এমন সব বিপত্তি হতেও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র যা সম্পূর্ণতা ও ঔৎকর্ষের পরিপন্থী এবং শতভাগ সত্য, প্রজ্ঞা, বাণিজ্য, আলঙ্কারিকতা এবং নিগৃঢ় তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে এমন বিষয়াবলী লিখতে কেবল সে ব্যক্তিই সর্বাঙ্গে থাকবে যে কিনা জ্ঞানগত শক্তি, জ্ঞানের ব্যাপ্তি, সাধারণ জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানে যে সবার উপরে আর প্রবন্ধ বা সন্দর্ভ লেখার দক্ষতায় সবচেয়ে সিদ্ধহস্ত।

সামর্থ, জ্ঞান, যোগ্যতা, দক্ষতা, মেধা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে যে তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের, তার জন্য রচনার শ্রেষ্ঠত্বে সে ব্যক্তির সমকক্ষ হওয়া কখনো সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক দক্ষ চিকিৎসক যে চিকিৎসা শাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা রাখে, দীর্ঘদিন অনুশীলনের কারণে যে রোগ নির্ণয় ও রোগব্যাধির গবেষণায় পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখে, এছাড়া বক্তৃতা বা ভাষায় অনন্য আর গদ্য-পদ্য লেখায়ও সমসাময়িক যুগে সবার চেয়ে অগ্রগামী; সেই ডাক্তার কোন রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রকৃতি, এর লক্ষণাবলী ও কারণগুলো যেরূপ ও যতটা বাণিজ্যাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অত্যন্ত সঠিক, সত্য, দৃঢ় ও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরতে পারে, এক ব্যক্তি যার চিকিৎসা শাস্ত্রের আদৌ কোন জ্ঞান নেই আর বক্তৃতা বা ভাষাশৈলী সম্পর্কেও যে পুরোপুরি অনবহিত; সেও প্রথমোক্ত চিকিৎসকের ন্যায় বর্ণনা করবে—এটি অসম্ভব। এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে, অজ্ঞ আর জ্ঞানীর বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছুটা হলেও পার্থক্য থেকে যায়।

মানুষ যতটা জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, তা তার জ্ঞানগর্ত বক্তৃতায় অবশ্যই সেভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় যেভাবে একটি পরিষ্কার আয়নায় চেহারা দেখা যায়। সত্য ও প্রজ্ঞাসমূহ বিষয় বর্ণনার সময় তার মুখ থেকে যেসব কথা বের হয় তা তার জ্ঞানের গভীরতা যাচাইয়ের জন্য একটি মাপকাঠি বলে গণ্য হয়ে থাকে। অধিকন্তু যুগপৎ জ্ঞানের ব্যাপকতা ও বুদ্ধির সর্বোচ্চ প্রস্তরণ হতে উৎসারিত কথা আর সংকীর্ণ, বিমর্শ, তমসাচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ ধারণাপ্রসূত কথার মাঝে পার্থক্য সেভাবে স্পষ্ট, যেমনটি কিনা স্বাধীনশক্তির সামনে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে থাকে— অবশ্য কোন স্বভাবগত বা সাময়িক রোগব্যাধির কারণে স্বাধীনশক্তি যদি লোপ না পেয়ে থাকে!

তোমরা যতটা পার চিন্তা করে দেখ, যত ইচ্ছা প্রণিধান কর, এই সত্যে কোন

ক্রটি দেখতে পাবে না আর কোন দিক থেকে এতে কোন বিপত্তি খুঁজে পাবে না।

অতএব, সকল দিক থেকে যেখানে প্রমাণিত যে, জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তির মাঝে যে পার্থক্য প্রচলন থাকে অবশ্যই তা কথা বা বাণীতে প্রকাশ পেয়ে যায়। এছাড়া যারা যুক্তি ও জ্ঞানে প্রাগ্রসর (শ্রেষ্ঠ) ও মহান, তারা বক্তৃতার বাণীতায় ও বাক্য অলঙ্করণের শ্রেষ্ঠত্বে অন্যদের সমান হয়ে যাবে আর অভ্যন্তরীণ কোন পার্থক্য থাকবে না— এটি সম্ভব নয়। অতএব, এই সত্য প্রমাণিত হওয়া সেই দ্বিতীয় সত্যের সত্যতার প্রমাণের জন্য আবশ্যিক। অর্থাৎ যে বাণী বা গভু খোদার বাণী, মানবীয় কথার চেয়ে স্বীয় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতায় এর শ্রেয়তর, মহান ও অনন্য হওয়া অত্যাবশ্যিক। কেননা কারও জ্ঞানই খোদার সম্পূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানের সমান হতে পারে না। আর এদিকেই ইঙ্গিত করে খোদা বলেছেন, ﴿لَمْ يُسْتَعْجِبُوا لِمَا فَعَلُوا أَنَّهُمْ بِإِلَهٍ مُّنِيبٍ لَّمْ يُقْرَبُ﴾ (সূরা হৃদ: ১৫) অর্থাৎ কাফিররা যদি এই কুরআনের মত কিছু উপস্থাপন করতে না পারে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে ব্যর্থ হয় তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, এই বাণী মানবীয় জ্ঞান হতে উৎসারিত নয়, বরং খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যার ব্যাপক ও সর্বসম্পূর্ণ জ্ঞানের সম্মুখে মানবীয় জ্ঞান অন্তঃসারশূণ্য ও তুচ্ছ। এই আয়াতে আরোহ যুক্তির আদলে ‘প্রভাবের অস্তিত্ব’-কে ‘প্রভাব বিস্তারকারীর অস্তিত্ব’-এর প্রমাণ আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ বিষয়টিকে অন্য ভাষায় সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, খোদার জ্ঞান আপন শ্রেষ্ঠত্ব (পরাকার্ষা) ও উৎকর্ষতার মানদণ্ডে মানুষের দুর্বল ও ক্রটিপূর্ণ জ্ঞানের সদৃশ মোটেও হতে পারে না। বরং যে বাণী সেই শ্রেষ্ঠ ও অনন্য জ্ঞান হতে উদ্ভূত তারও শ্রেষ্ঠ ও অনন্য হওয়া আবশ্যিক আর মানুষের কথা হতে এর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকা চাই। অতএব, এই শ্রেষ্ঠত্বই পরিত্র কুরআনে প্রমাণিত।

মোটকথা, খোদার বাণীর সাথে মানুষের উক্তির পার্থক্য এতটা স্পষ্ট হওয়া উচিত, যেমনটি কিনা খোদা ও মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও শক্তির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। যেভাবে মানব প্রজন্মের প্রত্যেক ব্যক্তি একই শ্রেণিভুক্ত হয়েও জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের তারতম্যের কারণে বক্তৃতা ও কথার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে, ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ও দ্রু বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের উন্নত চিন্তাভাবনার স্তরে কোন সীমিত জ্ঞান ও স্বল্পবুদ্ধির মানুষ যেখানে আদৌ পৌছুতে পারে না, সেখানে খোদা, যিনি শ্রেণিগত সাদৃশ্যের

সম্পূর্ণভাবে উর্ধ্বে আর নিঃসন্দেহে পরম শ্রেষ্ঠত্বসমূহের সমাহার, অধিকন্তু স্বীয় সকল গুণাবলীতে যিনি এক-অদ্বিতীয়, সেখানে কারও তাঁর সমকক্ষ হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও কীভাবে থাকতে পারে? আর সৃষ্টি হয়ে কীভাবে কেউ নিজের তুচ্ছ গুরুত্বহীন জ্ঞানকে স্মৃষ্টির অন্ত ও অসীম জ্ঞানের সমান ভাবতে পারে? এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে এখনও কোন ঘাটতি আছে কি যে, সকল বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান ও কর্মশক্তির অধীনস্ত? এমন কোন মানুষ আছে কি যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আধিক্যিকভাবে হলোও এই সত্যকে দেখে নি? তাই এ সত্য যেখানে এতটা শক্তিশালী ও দৃঢ় এবং এত সুপ্রাচারিত ও সুবিদিত সেখানে মানুষের বিবেকবুদ্ধি যে পর্যায়েরই হোক না কেন সে তা বুবাতে অপারগ বা অক্ষম নয়।

এমন পরিস্থিতিতে চরম নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে দুর্বল মানবের মাঝে এই সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভ্রেণেও সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তার পবিত্র বাণীর সত্যতা গ্রহণে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে যার স্বীয় জ্ঞানের পরাকার্ত্তায় অতুলনীয় ও অনন্য হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। কোন কোন ইসলাম বিরোধী ব্যক্তি এ যুক্তিও দিয়ে থাকে যে, যদিও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিই আবশ্যিক মনে হয় যে, খোদার বাণী অনন্য বা অতুলনীয়ই হওয়া উচিত কিন্তু এমন বাণী কোথায়, যার অনন্য হওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত? যদি কুরআন অনন্য হয়ে থাকে তাহলে এর অনন্যতা স্পষ্ট কোন প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। কেননা এর অনন্য বাণিজ্যিতা সম্পর্কে কেবল সেই ব্যক্তিই অবহিত হতে পারে, যার মাত্তাষা আরবী। তাই সাধারণভাবে মানুষের সামনে এর অনন্যতা, কোনভাবেই প্রমাণগণ্য হতে পারে না আর না এর দ্বারা তাদের লাভবান হওয়া সম্ভব। এর উত্তরে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এটি তাদের বৃথা আপত্তি যারা কুরআনের অনন্যতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে জানার জন্য আন্তরিকভাবে কখনো এদিকে মনোযোগই দেয় নি, বরং কুরআনের আলো দেখে অন্যত্র মুখ ফিরিয়ে রেখেছে; পাছে এই আলোর কোন কিরণ না তাদের ওপর এসে পড়ে।

নতুবা পবিত্র কুরআনের অনন্যতা সত্যাষ্঵ৈদের জন্য এতটাই সুপ্রকাশিত ও সমুজ্জ্বল যে, তা সূর্যের মত স্বীয় কিরণ চতুর্দিকে বিস্তৃত করে চলছে আর যা অনুধাবন করা ও জানার পথে অন্তরায় বা সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যদি

বিদ্বেষ ও শক্রতার অমানিশা আড়াল সৃষ্টি না করে, তাহলে সামান্য মনোযোগেই সেই উৎকর্ষ জ্যোতি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। এটি সত্য কথা যে, পবিত্র কুরআনের অনন্যতার কিছু দিক বা যুক্তি এমন আছে যা জানার জন্য আরবী ভাষার কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা মনে করা চরম অভ্যন্তর ও ভাস্তি যে, কুরআনের নির্দশনকে বোঝা ও অনুধাবন করা পুরোটাই আরবী জানার ওপর নির্ভরশীল বা কুরআনের সকল বিস্ময় ও সকল মহান বৈশিষ্ট্য কেবল আরবদের সামনেই উন্মোচিত হতে পারে, অন্যদের জন্য তা উদ্ঘাটনের সকল পথই রংক। মোটেই নয়, আদৌ তদৃপ নয়। সকল জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে একথা স্পষ্ট যে, কুরআনের অনন্যতার কারণগুলোর বেশিরভাগ এত সহজ ও সহজবোধ্য যে, তা জানা ও অবগত হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় দক্ষতার আদৌ প্রয়োজন নেই বরং এসব এতটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, মানুষ আখ্যা পাওয়ার জন্য সামান্যতম যে বিবেকবুদ্ধিটুকু দরকার, তা বোঝার জন্য ততটুকুই যথেষ্ট।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এর অনন্যতার একটি দিক হলো, বাণী এত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ গড় মাপের অক্ষরে যদি এটিকে লেখা হয়, তাহলে চার-পাঁচটি খণ্ডে হয়ত তা সংকুলান সম্ভব, এতে সেসব ধর্মীয় সত্য অস্তর্ভুক্ত রয়েছে যা পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী ও নবীদের সহিফায় অগোছালো এবং বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। অধিকক্ষে এতে অন্তর্নির্দিত আরেকটি শ্রেষ্ঠত্ব হলো, মানুষ পরিশ্রম, চেষ্টা ও সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে নিজেদের চিন্তাভাবনা ও ধর্মীয় বৃৎপত্তির জোরে যেসব সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে বা যে সূক্ষ্ম বিষয় আবিষ্কার করতে পারে বা সেই বিষয় সম্পর্কে কোন প্রকার ভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব বা কোন প্রকার দলিল ও প্রমাণ নিজের যুক্তিশক্তি দ্বারা দাঁড় করিয়ে দেখাতে পারে বা এমনই কোন সূক্ষ্ম সত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপস্থাপন করতে পারে যা অতীত জ্ঞানীরা দীর্ঘকাল শ্রম ও সাধনার বলে আবিষ্কার করেছেন, অথবা অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি যতটা রয়েছে, যাতে বেশিরভাগ মানুষ আক্রান্ত থাকে, এর চিকিৎসা যদি সে পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ঘাটন করতে চায় তাহলে সে যেভাবে এবং যেক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে চায় (পবিত্র কুরআনকে) পরীক্ষা করে দেখতে পারে। সকল ধর্মীয় সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনায় পবিত্র কুরআন একটি বৃত্তের মত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কোন ধর্মীয় সত্য এর বাইরে নয়। বরং যেসব সত্যকে জ্ঞানীরা জ্ঞান

ও বুদ্ধির অভাবে ভাস্তভাবে উপস্থাপন করেছে, পবিত্র কুরআন সেসবকে পূর্ণতা দেয় ও এর সংশোধন করে। যেসব সূক্ষ্ম রহস্য কোন জ্ঞানী ও দার্শনিকের বর্ণনা করার সুযোগ হয় নি, আর কোন মানব মস্তিষ্ক যে সম্পর্কে ভাবতেও পারে নি, কুরআন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ও সততার সাথে তা বর্ণনা ও প্রকাশ করে। আর ঐশ্বী জ্ঞানের সেসব সূক্ষ্ম দিক যা শত শত পুস্তকপুস্তিকা ও মোটা মোটা বইয়ে লেখা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণই রয়ে গেল, তা কুরআন পূর্ণাঙ্গীন রূপে লিপিবদ্ধ করে আর ভবিষ্যতে কোন বুদ্ধিমানের জন্য নতুন কোন বিষয় অবতারণা করার জায়গা খালি রাখে না। অথচ এটি এত ছোট একটি গ্রন্থ যা মধ্যকৃতির অক্ষর লিপিতে চালিশ পৃষ্ঠার অধিক হবে না। এখন জানা কথা, এটি এমন এক প্রকার অনন্যতা যার সত্যতা সম্পর্কে একজন স্তুলবুদ্ধির মানুষও সন্দেহ করতে পারে না। কেননা সকল সুস্থ চিন্তার মানুষের সামনে স্পষ্ট যে, সকল প্রকার ধর্মীয় সত্য ও ঐশ্বী বিষয়াদি-সংক্রান্ত তথ্য এবং তত্ত্ব, সত্যনীতি-সংক্রান্ত সকল যুক্তিপ্রমাণ, উপায়-উপকরণ আর পূর্বাপর সবার চিন্তাভাবনার নির্যাস একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে এমন পূর্ণতার সাথে পরিবেষ্টন করা, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন কোন সত্ত্বের নামগন্ধি ও পাওয়া সম্ভব হয় নি যা এর বাইরে রয়ে গেছে— আর এটি বানানো মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ কথাটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য জ্ঞান সম্পন্ন বা নিরক্ষর প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে সোজা পথ খোলা রয়েছে। কেননা এ বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে যে, পবিত্র কুরআন সকল ঐশ্বী সত্য কীভাবে ধারণ বা পরিবেষ্টন করতে পারে, তাহলে আমরাই এই দায়িত্ব নিছি যে, কেউ সত্যামৈষী হিসেবে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের লিখিত প্রতিশ্রূতি দিয়ে কোন হিন্দু, গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, সংস্কৃত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে কিছুটা ধর্মীয় সত্য বের করে উপস্থাপন করুক বা নিজের বুদ্ধির জোরেই কোন ঐশ্বী নিগৃত সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা রচনা করে দেখাক, তাহলে আমরাও কুরআন থেকে তা বের করে দেখাবো। শর্ত হলো, এই গ্রন্থ প্রকাশকালেই আমাদের কাছে তা পাঠিয়ে দিতে হবে যাতে উক্ত গ্রন্থের যথাযথ স্থানে টীকা হিসেবে আমাদের কথা সংযুক্ত হয়ে ছেপে যেতে পারে।

কিন্তু এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে এই শর্তও ভালোভাবে স্মরণ থাকা উচিত যে, যে ব্যক্তি এই বিতর্কের সূচনাকারী, সে প্রথমে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কোন পত্রিকায় একথা ছাপিয়ে দিক যে, এই বিতর্ক শুধুমাত্র সত্য সন্ধানের উদ্দেশ্যেই সে করছে এবং নিজের প্রশ্নের পুরো উত্তর পেলে সে মুসলমান হতে প্রস্তুত।

কেননা যার সত্য সন্ধানের মন-মানসিকতা বা সদিচ্ছা নেই আর যার হৃদয়ে খোদাভীতি নেই অথচ অন্তরের নোংরামির বশবর্তী হয়ে নেরাজ্যবাদীদের ন্যায় আজেবাজে কথাবার্তাই বলে বেড়ায়, তার প্রতি মনোযোগ নিবন্ধ করা সময় নষ্ট করা বৈ আর কী। অনুরূপভাবে অনন্যতার আরও একটি দিক রয়েছে আর তা সকল সত্যান্বেষীর পক্ষে সহজেই বোধগম্য, অর্থাৎ পরিত্র কুরআন এতটা সংক্ষিপ্ত আর সত্য ও প্রজ্ঞাকে এমনভাবে আয়ত্ত করা সত্ত্বেও যার আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি; এর বাক্যবিন্যাসে বাগীতা, ভারসাম্য, স্পর্শকাতরতা, কোমলতা ও ঔজ্জ্বল্য-এর মোকাবেলায় ইসলামের ভয়াবহ বিরোধী, আরবী রচনা ও প্রবন্ধ লেখায় পূর্ণ দক্ষতা রাখে এমন কোন অত্যুৎসাহী সমালোচককে নিরঙ্গণ ক্ষমতাধর শাসকের পক্ষ থেকে যদি এই কঠোর নির্দেশ দেয়া হয় যে, তুমি যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ ২০ বছরের ভেতর যা একটি পূর্ণ আযুক্তাল, এভাবে কুরআনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না কর অর্থাৎ কুরআনের কোন স্থান থেকে শুধু দু'চার লাইনের কোন বিষয় নিয়ে যদি এর সমান বা এর চেয়ে উত্তম কোন নতুন বাক্যগুচ্ছ রচনা করে নিয়ে না আস যাতে সেসব বিষয় নিজস্ব যাবতীয় সূক্ষ্মতা ও সত্যসহ বিদ্যমান থাকবে আর বাক্যগুলোও হওয়া চাই কুরআনেরই ন্যায় প্রাঞ্জল ও বাগীতাপূর্ণ, অন্যথায় ব্যর্থতার দায়ে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কিন্তু ভয়াবহ শক্রতা আর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও মৃত্যুর আশংকা থাকলেও আর পৃথিবীর শত শত ভাষাবিদ এবং প্রাবন্ধিককে সাহায্যকারী হিসেবে সাথে নিলেও সে এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে আদৌ সক্ষম হবে না। উল্লিখিত এ দৃষ্টান্ত কাল্পনিক বা ধারণাপ্রসূত কোন কথা নয় বরং এটি সত্য ঘটনা যা কুরআনের যুগেই পরীক্ষা করা হয়েছে আর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এর সত্যতা সকল সত্যান্বেষীর সামনে প্রমাণিত হয়ে এসেছে। এখনও যদি কোন সত্যান্বেষী কুরআনের এই নির্দর্শনকে স্বচক্ষে দেখতে চায় তাহলে আমরা অনায়াসে তার সামনে এই নির্দর্শন প্রদর্শনের দায়িত্ব নিচ্ছি। অধিকক্ষ এ বিষয়টি পরীক্ষা করা আর সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা কোন কঠিন কাজ নয়, এমন কোন বিষয় নয় যাতে কিছু ব্যয় হবে বা অন্য কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে। সত্যান্বেষীদের জন্য আবশ্যিক হবে কেবল নিজেদের পছন্দ অনুসারে কুরআনের কোন স্থান থেকে কোন বিষয় নিয়ে কোন আরবী ভাষাভাষীকে, বর্তমানে যারা এদেশে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বিদ্যমান, এই উদ্দেশ্যে দেয়া, যাতে বিষয়টি এর মধ্যকার সমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও নিগৃতত্ত্বসহ সে নিজের রচনায় সৃষ্টি করে দেখায়।

অতএব, এমন বিষয় প্রস্তুত হয়ে গেলে তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। আমরা এই রচনা বা বাক্যাবলীর কুরআনে বিধৃত শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তুলনার নিরিখে অসার ও রিক্তহস্ত হওয়া স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করবো, যে বর্ণনা প্রত্যেক উর্দুভাষী সহজেই বুঝতে সক্ষম হবে। এখানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে যেভাবে অন্যান্য বক্তৃর বৈশিষ্ট্য বা গুণগুণ যাচাই করা যায়, তদুপর পরিবিত্র কুরআনের বাণিজ্ঞান ও বাকশেলিতে অন্যতার যে বিশেষত্ব রয়েছে তাও পরীক্ষার মাধ্যমে অবগত হওয়া সম্ভব। খোদা তাঁলা বক্তৃর গুণগুণ প্রকাশের জন্য এই রীতিই নির্ধারণ করেছেন যে, কোন বক্তৃর বিশেষত্ব সম্পর্কে যদি সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে যতক্ষণ আত্মিক প্রশান্তি লাভ না হয় ততক্ষণ এ সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া উচিত। যে বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব কোন বক্তৃর মধ্যে বিদ্যমান তা সফলভাবে পরীক্ষা করার পরও যে ব্যক্তি সে বৈশিষ্ট্য কেন বা কী করে সেই বক্তৃর ভেতর থাকতে পারে মর্মে সন্দেহ করে, সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই পাগল এবং উন্নাদ। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেছে আর বারংবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উদ্ঘাটন করেছে যে, আর্সেনিক বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রাণহারী; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সে অভ্যন্তর ভান করে আর্সেনিকের এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে বলে যে, আমি জানি না, এটি কীভাবে প্রাণহারী হতে পারে? তাহলে এমন ব্যক্তি বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে উন্নাদ বরং উন্নাদদের চেয়েও অধিম বলে গণ্য হবে। কেননা প্রধানত এই সত্য নিজ গন্তি ও পরিসীমায় একটি বাস্তব বিষয় যে, সৃষ্টিতে নানাবিধি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং যেখানে একটি নির্দিষ্ট বক্তৃর বিশেষত্ব ক্রমাগত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিতও হয়ে গেল, সেখানে তা অস্বীকার করা যদি নির্বুদ্ধিতা ও উম্মাদনা না হয় তাহলে আর কী!

সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা হলো, মহাসম্মানিত খোদার গুণাবলী ও এর বাস্তব প্রতিফলনকে অস্বীকার করা। কেননা অন্যান্য জিনিসের বৈশিষ্ট্য, যা তাদের বাইরে অন্য কিছুর মাঝে দেখা যায় না আর এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন যৌক্তিক প্রমাণও পাওয়া যায় না, এটি কেবল অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি, খোদার বৈশিষ্ট্যের আবশ্যিকতা... [অবশিষ্টাংশ চতুর্থ খণ্ড -অনুবাদক]।

## টীকা নম্বর এগার (১১)

কোন কোন নির্বোধ (যাদের গভীরভাবে চিন্তা করার অভ্যাস নেই) এখানে এই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে যে, খোদার উক্তি ও মানুষের কথায় নিঃসন্দেহে একক (অযৌগ) অক্ষর ও শব্দ ব্যবহার হয় তাই অক্ষর ও শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে খোদার সাথে মানুষের অংশীদারিত্ব আবশ্যিকীয়ভাবে প্রমাণিত হলো।

বইয়ের মূল অংশে এর বিশদ উত্তর দেয়া হয়েছে আর তা হলো, ভাষাঙ্গান খোদার পক্ষ থেকে আসে। তাই (মানতে হবে) অক্ষর ও মৌলিক শব্দ জ্ঞান খোদা-ই মানুষকে শিখিয়েছেন। মানুষ নিজের বুদ্ধিবলে এসব আবিক্ষার করে নি। কেবলমাত্র শব্দের বিন্যাসই মানুষ আবিক্ষার করে অর্থাৎ মানুষের একমাত্র ঐচ্ছিক ও অর্জিত বিষয় হলো, কোন ভাব প্রকাশের জন্য সে নিজের পক্ষ থেকে বাক্যগুচ্ছ বা অনুচ্ছেদ গঠন করতে পারে যাতে এক বাক্য এক স্থানে আর অপর বাক্য ভিন্ন স্থানে বিন্যস্ত করে থাকে। কোন শব্দের সংশ্লেষণ একস্থানে বিন্যস্ত করে আর অপরটি করে ভিন্ন স্থানে। অতএব, রচনা বা নিছক বাক্যগুচ্ছ লিপিবদ্ধ করার কাজটি তার নিজের হাতে হয়ে থাকে। এ কারণেই আমরা বলি যে, মানুষের রচনা ও শব্দ-সমাহার কোনভাবেই খোদার রচনার সমান হতে পারে না আর সমান হওয়া কোনভাবে বৈধও নয়। কেননা এতে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির অংশীদারিত্ব আবশ্যিক হয়ে যায়। কিন্তু খোদা স্বীয় বাণী বা গ্রন্থে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন সেসব অক্ষর ও শব্দ মানুষের ব্যবহার করা অংশীদারিত্ব নয় বরং এটি অবিকল এমনই এক বিষয়, যেভাবে মানুষ খোদার সৃষ্টি মাটিকে স্বীয় ব্যবহারাধীনে আনে আর বিভিন্ন প্রকার মৃৎ-তৈজসপত্র তৈরি করে থাকে। কিন্তু এর মাধ্যমে এটি প্রমাণ হয় না যে, মানুষ খোদার অংশীদার হয়ে গেছে। কেননা সন্দেহাতীতভাবে মাটি খোদার সৃষ্টি, মানুষের নয়। অংশীদারিত্ব তখন প্রমাণ হবে যদি মানুষ মাটি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু, উক্তি ও বিভিন্ন মণিমুক্তা বাস্তবেই বানিয়ে দেখাবে। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, খোদা মাটি দ্বারা যে কাজ সাধন করেছেন মানুষও মাটি দ্বারা তা সম্পন্ন করবে— সেই ক্ষমতা মানুষের নেই। এটি অবশ্য সত্য কথা যে, আবিক্ষার ও সৃষ্টির জন্য মানুষের হাতেও সেই উপাদানই রয়েছে যা খোদা স্বীয়

বি. দ্র.: টীকা নম্বর এগার (১১) মূল পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে। -অনুবাদক

প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মানুষের আবিষ্কার ও সৃষ্টি, খোদার আবিষ্কার ও সৃষ্টির মতই হবে (নাউয়াবিল্লাহ)- এটি কী করে সম্ভব? এমন ধারণা পোষণ করা হতে আমরা খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি। খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ যদি কোন সহজ কাজও করতে চায় অর্থাৎ যে সৃষ্টি জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্ষিণ্ণ বিছিন্ন হয়ে গেছে তারই হাড়গোড়, মাংস-চর্ম একত্রিত করে পুনরায় যদি একই প্রাণী বানাতে চায় তাহলে এতে প্রাণ সঞ্চারের কথা না হয় বাদই দিলাম; কেবল যদি পুনরায় দেহও বানাতে চায় তাও তার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং দুর্বল মানুষ খোদার মোকাবিলা কী করে করতে পারে? সে যে অন্যান্য প্রাণীর মোকাবিলা করতেই অক্ষম বরং ছোট ছোট পোকামাকড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও সে ব্যর্থ। সত্যিকার অর্থে কোন কোন কৌটপতঙ্গ সৃষ্টি-শৈলীতে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি নিপুন। কোনটি তার জন্য রেশম বুনে, কেউ তাকে অমৃতসুধা পান করায়, কেউ প্রস্তুত করে কোন কিছু, কেউবা আবার ভিন্ন কিছু, অথচ মানুষের সেসব নৈপুণ্যের একটিও আয়ত্ত হয় নি। অতএব, বলুন! এখন এই মুখ আর একেপ যোগ্যতা নিয়ে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডয়মান হওয়া তার অভিতা নয় কি?

چوں نیست بیک گے تاپ ہمسری پس چوں کنی بپار مطلق برابری  
যেখানে তুই একটি মাছির মোকাবিলা করতে পারিস না সেখানে সর্বশক্তিমান  
খোদার সমকক্ষ হওয়া তোর জন্য কী করে সম্ভব?

شرم آیدت زدم زنی خود به کرد گار ر و قدر خود به میں که زیک کرم کمتری  
খোদা তাঁলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে তোর লজ্জা হওয়া উচিত, (আয়নায়)  
নিজের চেহারা দেখ, (কেননা) তুই এক কীটের চেয়েও অধিম।

এখানে একথাও যথাবিহিত স্মরণ রাখা দরকার, মানব দেহের মৌলিক উপাদানের ন্যায় বাক্যের মৌল উপাদানও খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্টি। বাক্য বা কথার মৌল উপাদান বলতে আমরা অক্ষর, শব্দ-ধ্বনির সমাহার ও ছোট ছোট বাক্য বুবাই যার ওপর ভাষা শিক্ষা নির্ভরশীল। যেমন খোদা আছেন, বাদ্য নশ্বর, সকল প্রশংসা আল্লাহর, বিশ্বজগতের প্রতিপালক ইত্যাদি। এগুলো সবই বাক্যাংশ, যা খোদা নিজের পক্ষ থেকে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন। কেননা মাটির এক পুতুল বানিয়ে এর সাথে সম্পর্ক ছিল করে বসে থাকবেন, খোদার কাজ কেবল এতটুকুই নয়। বরং জানা কথা যে, মানুষ নিজের প্রকৃতিগত উৎকর্ষের জন্য যা কিছু পেয়েছে তা খোদার পক্ষ থেকেই পেয়েছে,

ঘর থেকে কিছু আনে নি। অতএব, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে সত্যাষ্টীর প্রতারিত হওয়া উচিত নয় যে, অক্ষর এবং অযৌগ শব্দ বা ছোট ছোট যেসব বাক্য খোদার কথায় বিদ্যমান, তা মানুষের কথায়ও রয়েছে। আর একথাও ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এগুলো কেবল বাক্যের মৌলিক উপাদান যা খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। মানুষও তা ব্যবহার করে আর আল্লাহ্ তা'লাও, তবে পার্থক্য হলো, শব্দ ও অর্থের নিরিখে। যা খোদার উক্তি, তাতে সেসব শব্দ ও বাক্য সুন্দর-সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারা বিন্যাস, পরম উপরোগিতা ও ভারসাম্য বজায় রেখে স্ব স্ব স্থানে ঠিক সেভাবে বিরাজ করে, যেভাবে পৃথিবীতে খোদার সব কাজ পরম যথার্থতা, ভারসাম্য ও প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে বিরাজমান। মানুষ যেভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে খোদার সমকক্ষ নয় একইভাবে রচনার ক্ষেত্রেও খোদার সমর্মাদায় পৌছুতে পারে না। এ কারণেই কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সকল অবিশ্বাসী বাগিচা ও বাকপুটুতার দাবি এবং কবি-সন্মাট আধ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও মুখ বন্ধ করে বসে থাকে এবং এখনও নীরব ও নির্বাক হয়ে আছে আর এই নীরবতাই তাদের অক্ষমতা বা ব্যর্থতার সাক্ষ দিচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তি শুনে ও বুঝে যদি তা খণ্ডন করে না দেখানো হয় একেই দুর্বলতা বলা হয়, তা না হলে অক্ষমতা বা ব্যর্থতা আর কাকে বলে?

এ টীকায় এ পর্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ কালাম বা ঐশ্বী বাণীর অনন্যতার আবশ্যকতা প্রমাণ করেছি। এছাড়া অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও আল্লাহ্ কালাম বা ঐশ্বী বাণীর অনন্যতা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক মনে হয় যা এই টীকায় বর্ণনা করা যুক্তিসংগত হবে। আর তা হলো; এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের সংশয়াতীত এমন শুভ পরিণাম, যার কল্যাণে নিশ্চিতভাবে মুক্তির আশা করা যায়, তা নির্ভর করে তার সত্যিকার স্ফটার অঙ্গে, তাঁর নিরক্ষুশ ক্ষমতাবান হওয়ায় এবং তাঁর শাস্তি ও পুরুষারের প্রতিশ্রূতিতে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের মাঝে। আর এরূপ বিশ্বাস কেবল ‘সৃষ্টিকে’ চোখে দেখে অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

বরং বিশ্বাসের এ পর্যায়ে পৌছানোর জন্য এমন একটি ঐশ্বী গ্রহের প্রয়োজন যার অনুরূপ বা সমতুল্য গ্রহ বানানোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। এ বক্তব্য ভালোভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে এখন দু'টো কথা বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রধানত নিশ্চিত মুক্তির আশা নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে কেন সম্পৃক্ত? দ্বিতীয়ত সেই পূর্ণ বিশ্বাস শুধু সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করেই কেন

অর্জিত হতে পারে না? অতএব, প্রথমে একথা বুঝতে হবে যে, সুসংহত পরিপূর্ণ বিশ্বাস, সেই সত্য ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসের নাম যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না আর যে বিষয়ে গবেষণা করা উদ্দেশ্য, সে বিষয় সম্পর্কে হৃদয়ে পুরোপুরি প্রতীতি, প্রশান্তি ও প্রবোধ জন্মে। প্রত্যেক এমন বিশ্বাস, যা এর চেয়ে অধঃপতিত ও নিম্নমানের তা উৎকর্ষ মানের বিশ্বাসের পর্যায়ে থাকে না বরং তা সন্দেহ বা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ধারণা-সর্বস্ব বিষয় বৈ অন্য কিছু নয়।

মানুষের স্বীয় সম্মানিত প্রভুর নৈকট্যকে সমগ্র পৃথিবী, এর ভোগবিলাস, পার্থিব ধনসম্পদ এবং সকল জাগতিক সম্পর্ক, এমনকি নিজের প্রাণাধিক মনে করা আর অন্য কোন ভালোবাসা তাঁর ওপর অগাধিকার না পাওয়াই হলো তার মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু। আর নিশ্চিত পরিত্রাণের আশা উৎকৃষ্ট বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার এটিই কারণ। কিন্তু মানুষের সমস্যা হলো যেসব রীতিনীতির মাঝে মানুষের মুক্তি নিহিত, সে এর বিপরীতে এমন সব বিষয়ের মোহে আচ্ছল, যার প্রতি আসঙ্গ হওয়ার আবশ্যকীয় ফলাফল হলো খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর আসঙ্গ ও মোহ এমন যে, সে নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে, তার সমূহ সুখস্বাচ্ছন্দ্য এসব সম্পর্কের মাঝেই নিহিত। সে কেবল এমনটি ধারণাই করছে না বরং সেসব ভোগবিলাস, তার মতে সুনিশ্চিত অর্থে পরীক্ষিত ও অনুভূত বিষয়। এসবের অস্তিত্বে তার হৃদয়ে এতটুকু সন্দেহও নেই। অতএব, এটি জানা কথা যে, যতদিন খোদা তাঁ'লার অস্তিত্ব ও তাঁকে পাওয়ার আনন্দ, তাঁর দেয়া শান্তি ও পুরক্ষার এবং তাঁর নিয়ামতরাজি সম্পর্কে সে পর্যায়ের সুড়ঢ় ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হবে, যেমনটি নিজের ঘরের সম্পদে, নিজের সিন্দুকে সুরক্ষিত অর্থে, স্বহস্তে লাগানো বাগানে, নিজের ক্রয় করা বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে, নিজের পরীক্ষিত ও চ্যজ স্বাদে এবং আন্তরিক বন্ধুদের প্রতি থেকে থাকে; ততদিন একান্ত আবেগে ও উচ্ছ্বাস নিয়ে একনিষ্ঠভাবে খোদার পানে প্রত্যাবর্তন করা মানুষের জন্য অসম্ভব। কেননা দুর্বল কোন ধারণা দৃঢ় ধ্যানধারণার ওপর জয়যুক্ত হতে পারে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন মানুষ যার বিশ্বাস পারলৌকিক বিষয়াদির চেয়ে পার্থিবতায় অধিক, এই পাঞ্চশালা থেকে তার বিদায়ের ক্ষণ এসে গেলে সেই নাজুক বা স্পর্শকাতর মুহূর্ত, যাকে মৃত্যুর বিভীষিকা বলে অভিহিত করা হয়, অক্ষমাং তার সামনে আত্মপ্রকাশ করে তাকে সেই নিশ্চিত সুখ সংস্কার হতে দূরে ঠেলে দিতে চায়, যা পৃথিবীতে তার

নাগালের ভেতরে। তাকে সেসব প্রিয়জন হতে বিছিন্ন করতে চায় যাদের সে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে দেখে। সে সব অর্থসম্পদ ও স্বত্ত্ব থেকে বিছিন্ন করা আরম্ভ করে, যাকে সে অবশ্যই নিজের স্বত্ত্ব মনে করে। এমতাবস্থায় তার মনোযোগ খোদার প্রতি নিবন্ধ থাকা অসম্ভবই বটে। এটি কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সেই পূর্ণ বিশ্বাসের পরিবর্তে খোদার সন্তা, তাঁকে পাওয়ার আনন্দ এবং তাঁর শাস্তি ও পুরক্ষারের প্রতিশ্রুতিতেও অনুরূপ বরং সমধিক বিশ্বাস থাকে। যদি এই অস্তিম মুহূর্তেও সেই মানের বিশ্বাস তার অর্জিত না হয় যা বৈষয়িক চিন্তাধারাকে প্রতিহত করতে পারে তাহলে এ বিষয়টি তার জন্য অঙ্গভ পরিণতি ডেকে আনবে।

কেবল সৃষ্টিকে দেখেই দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্জিত হতে পারে না সেকথা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি এমন কোন গ্রহ নয়, যাতে দৃষ্টিপাতে মানুষ লিখিতভাবে একথা দেখবে যে, এটিকে খোদা বানিয়েছেন আর বাস্তবেই খোদা আছেন! তাঁকে পাওয়ার আনন্দই প্রকৃত প্রশাস্তি লাভের নিশ্চয়তা। তিনিই অনুগতদের পুরক্ষার দেবেন আর অবাধ্যদের শাস্তি দেবেন! বরং সৃষ্টিজগতকে দেখে আর এই বিশ্বজগতকে পরম সুন্দর ও অনুপমরূপে বিন্যস্ত পেয়ে নিছক অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, এসব সৃষ্টির অবশ্যই কোন স্রষ্টা থাকা উচিত। ‘থাকা উচিত’ ও ‘আছে’ শব্দ দু’টির অর্থে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ‘আছে’ শব্দটি বিশ্বাসের যে পর্যায়ে পৌছায় ‘থাকা উচিত’ শব্দটি সেই পর্যায়ে পৌছুতে পারে না, বরং এতে সন্দেহের কিছুটা অবকাশ থেকেই যায়। যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে বলে যে, তা হওয়া উচিত, তার কথার নির্যাস হলো, আমার ধারণা অনুসারে তা থাকা আবশ্যিক, কিন্তু বাস্তবে আছে কি নেই তা আমি জানি না। সে কারণেই নিছক সৃষ্টিজগৎ নিয়ে ভাবতেন, এমন যত চিন্তাবিদ গত হয়েছে তারা ফলাফল বের করতে গিয়ে কখনো একমত হতে পারে নি, এখনও একমত নয় আর ভবিষ্যতেও একমত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য যদি আকাশের কোন কোণে মোটা ও উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকতো যে, আমি অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় খোদা, যিনি এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যিনি পুণ্যবান ও পাপীদেরকে তাদের পাপ ও পুণ্যের প্রতিফল দান করবেন তাহলে নিঃসন্দেহে সৃষ্টিকে দেখে খোদার সন্তা এবং তাঁর শাস্তি ও পুরক্ষারে পূর্ণ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যেতো। এমন পরিস্থিতিতে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত করার জন্য খোদা তাঁ’লার অন্য কোন উপায়

উঙ্গাবনের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু এখন সে বিষয় আর নেই। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি তোমরা যত গভীরদৃষ্টিতেই তাকাও না কেন, কোথাও এমন লেখার কোন হন্দিস খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি ব্যক্তির নিছক অনুমান বৈ কিছু নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সকল বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাতে স্রষ্টার অস্তিত্বের সত্যিকার কোন সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল একটি আনুমানিক সাক্ষ্য লাভ হয় যার একমাত্র ভাবার্থ হলো, এক স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকা চাই আর তাও কেবল সে ব্যক্তির দৃষ্টিতে যে মনে করে যে, এসব বস্তুর অস্তিত্ব নিজ থেকে হওয়া অসম্ভব। কিন্তু নাস্তিকের দৃষ্টিতে সে সাক্ষ্য সঠিক নয়। কেননা তার বিশ্বাস হলো বিশ্বজগৎ অনন্তকাল থেকে চলে আসছে। এ কথার ভিত্তিতেই সে বলে যে, আবিক্ষারক ছাড়া যদি কোন বস্তুর অস্তিত্বের কথা ভাবা না যায় তাহলে আবিক্ষারক ছাড়া খোদার অস্তিত্বের কথা ভাবা কীভাবে বৈধ হতে পারে? যদি বৈধ হয়ে থাকে তাহলে যেসব বস্তুকে কেউ স্বচক্ষে অস্তিত্ব লাভ করতে দেখে নি সেসবের অস্তিত্ব কেন আবিক্ষারক ব্যতীত মানা যাবে না? এখন আমাদের কথা হলো, মহান আল্লাহর আদি সত্তা সম্পর্কে এক নাস্তিকের সাথে একজন অনুমানপূর্জারির যে বাকবিতভা দেখা দিতে পারে তা কেবল এ কারণে যে, সৃষ্টির ওপর দৃষ্টিপাতে বিশ্বস্তার অস্তিত্বের কোন সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না! অর্থাৎ এটি প্রকাশ পায় না যে, সত্যিই একজন বিশ্বস্তা রয়েছেন। বরং কেবল এতটা বোঝা যায় যে, কোন স্রষ্টা থাকা উচিত। এ কারণেই কেবল কিয়াস বা অনুমানের ভিত্তিতে বিশ্বস্তাকে চেনার বিষয়টি নাস্তিকের জন্য সন্দেহের আবরণেই আবৃত থেকে যায়। এ বিষয়টি আমরা চার নম্বর টীকায় কিছুটা হলেও বর্ণনা করেছি, যাতে এ প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে যে, বুদ্ধি বা যুক্তি শুধু কারো অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বা আবশ্যকতা প্রমাণ করে, কিন্তু উপস্থিতি প্রমাণ করতে পারে না। কোন কিছুর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত হওয়া এক কথা আর স্বয়ং সেই সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়া ভিন্ন কথা। অতএব, যার দৃষ্টিতে খোদাকে চেনা বা খোদা সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের বিষয়টি নিছক সৃষ্টিকে দেখার মাঝেই সীমাবদ্ধ, তার কাছে একথা স্বীকার করার কোন উপায় বা উপকরণ নেই যে, সত্যিই খোদা আছেন। বরং তার জ্ঞানের বহর কেবল ‘থাকা উচিত’ পর্যন্তই, আর সেটিও তখনই সম্ভব যদি সে নাস্তিকতার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। এ কারণেই প্রাচীন দার্শনিকদের মাঝে যারা কেবল অনুমান ভিত্তিক প্রমাণের ওপর

নির্ভর করত, তারা অনেক বড় বড় ভুল করেছে আর শত (শত) প্রকারের বিরোধের সূত্রপাত ঘটিয়ে নিষ্পত্তি না করেই ইহধাম ত্যাগ করেছে। এমন সব অশান্তির মাঝে তাদের জীবনের যবনিকাপাত ঘটেছে যে, সহস্র সহস্র সন্দেহ ও সংশয়ে নিয়জিত থেকে তাদের অধিকাংশ নাস্তিক, প্রকৃতিপূজারি ও খোদাদোহী হিসেবে প্রয়াত হয়েছে। দর্শন শাস্ত্রের কাণ্ডে নৌকা তাদেরকে নিরাপদে তীরে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা একদিকে জাগতিকতার মোহ তাদের আচল্ল রেখেছে, অপরদিকে ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে তাও তারা নিশ্চিতভাবে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয় নি। তাই বড় আক্ষেপ ও উৎকর্ষার মাঝে সত্যভিত্তিক বিশ্বাস হতে রিভত্ত, বঞ্চিত ও বিতাড়িত অবস্থায় তারা এই ধরাধাম ত্যাগ করেছে। এ সম্পর্কে তাদের নিজেদেরই স্বীকারোভিত্তি রয়েছে যে, বিশ্বস্তা ও অন্যান্য পারলৌকিক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিশ্চিত বিশ্বাসভিত্তিক ধরাধাম ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ তাদের জ্ঞান এমনই *من حيث ما هو اشب*<sup>۴</sup> নয় বরং *من حيث المقيمين* এমনই যেমনটি কিনা কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞানতা সত্ত্বেও নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কোন জিনিস সম্পর্কে বলে বসে যে, ‘অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এই বন্দটি এমনই হওয়া উচিত’— কিন্তু বাস্তবে এমন কিনা তা সে জানেই না। জ্ঞানীরা সীয় ধারণা অনুসারে যখন কোন বিষয় সম্পর্কে ধরে নিল যে, এটি এমনই হওয়া উচিত, তখন ঘরে বসেই স্থির করে ফেলল, হঁা এমনই হবে! দ্রষ্টান্বক বলা যায়, ধরণ! কেউ বলে যে, যায়েদের এখন আমাদের কাছে আসা যুক্তিযুক্ত! আবার মনে মনে আত্মপ্রসাদ নেয় যে, সে এলো বলে! পুনরায় ভাবে যে, যায়েদের ঘোড়ায় চড়ে আসাই যথাযথ হবে আর একই সাথে ধরে নেয় যে, সে হয়ত ঘোড়ায় চড়েই এসে থাকবে। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানরা! এভাবেই ধারণার ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে আসছে আর খোদা যে সত্যিকার অর্থেই আছেন, এমর্মে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করা তাদের ভাগ্যে জোটে নি বরং তাদের সবচেয়ে সঠিক বুদ্ধির দৌড় কেবল এ পর্যন্ত যে, ‘একজন স্মৃষ্টা থাকা দরকার’! সত্য কথা হলো, এই তুচ্ছ ধারণার ক্ষেত্রেও বিশ্বাসহীনদের ন্যায় তাদের হস্তয়ে সন্দেহ ও সংশয়ই মাথাচাড়া দিতে থাকে আর সত্য ও সঠিক পথে তাদের পদচারণা হয় নি। কেউ কেউ একথা অস্বীকার করে যে, খোদা তাঁলা সচেতন নিয়ন্তা ও সচেতন স্রষ্টা। কেউ আবার তার সাথে দৈহিক আকৃতি এবং অবয়বও যোগ করেছে। কিছু মানুষ আবার অনাদি-অনন্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্যে সকল রূহ বা আত্মাকে ভাইবন্ধুদের ন্যায় খোদার অংশীদার

আখ্যায়িত করেছে আর এদেরই উত্তরাধিকারী হিসেবে আজ পর্যন্ত আর্যরা বিদ্যমান। কেউ কেউ (মৃত্যুর পর) মানবাত্মার পুনর্জীবন লাভ ও শান্তি-পুরস্কার-নিবাসকে অস্থীকার করে বসেছে। আবার কেউ কেউ কাল বা সময়কেই খোদার মত প্রকৃত অর্থে সত্যিকার প্রভাববিস্তারী শক্তি আখ্যায়িত করেছে। খোদা যে প্রতিটি অণুপরমাণু সম্পর্কেও সম্যক অবগত সে বিশ্বাস হতে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কতক প্রতিমার নামে কুরবানী বা নৈবেদ্য উৎসর্গ করে আসছে আর অলীক দেবতাদের সামনে করজোড়ে মিনতি করে আসছে। অনেক বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তি খোদা তা'লার অস্তিত্বে অস্থীকারকারী ছিল আর তাদের একজনও এমন ছিল না যে এসব ব্যাধি বা নৈরাজ্য হতে মুক্ত থাকবে। এখন আমরা মূল কথায় ফিরে এসে লিখছি যে, কেবল সৃষ্টিজগতকে দেখে কোনভাবেই পূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত হতে পারে না আর না কখনো কারো হয়েছে। বরং যতটা অর্জিত হতে পারে আর খুব সম্ভব কারো কারো হয়েও থাকবে, সেটি কেবল এতটা যা 'থাকা উচিত'-এর অর্থের মাঝে সীমাবদ্ধ আর সেটিও কেবল বিশ্বস্তার অস্তিত্ব পর্যন্তই; শান্তি-পুরস্কারের ক্ষেত্রে অতটাও নয়। সৃষ্টিকে দেখে যেখানে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন হতে পারে নি সেখানে দুঁটো কথার একটি মানতে হয়। প্রধানত হয় বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত করার কোন ইচ্ছাই খোদার ছিল না অথবা তিনি অবশ্যই পূর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছানোর কোন না কোন ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রথমোক্ত বিষয়টি স্পষ্টতই মিথ্যা ও ভাস্ত। আর এর ভাস্ত ও মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে কোন বিবেকবান মানুষের দ্বিমত নেই। দ্বিতীয় বিষয়টি সঠিক আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি আমরা স্বীকার করি যে, খোদা সৃষ্টির মুক্তির জন্য অবশ্যই কোন সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকবেন তাহলে একথা স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে, সেই পরম উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হবে এমন এলহামী গ্রহ্ণ যা নিজ গুণে অনন্য ও অতুলনীয় হবে এবং যা নিজের বর্ণনায় প্রকৃতির সকল রহস্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যেহেতু শর্ত হলো, সেই জিনিসের অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া, একইভাবে তা যে খোদার পক্ষ থেকে এর অনুকূলে এবং সকল ধর্মীয় বিষয়ের পক্ষে লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা— সেহেতু এসব বৈশিষ্ট্য কেবল এলহামী গ্রহ্ণে বিদ্যমান থাকবে যা হবে অনন্য ও অতুলনীয়, অন্যত্র এর সমাহার ঘটতে পারে না। কেননা স্বীয় বর্ণনাশেলী ও অনন্যতার সুবাদে পূর্ণ বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গে

পৌছানোর বৈশিষ্ট্য কেবল এলহামী গ্রন্থেরই থাকতে পারে। এর কারণ হলো, আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন দুর্ভাগ্য নাস্তিক সন্দেহ করলে হয়ত করতে পারে যে, এগুলো চিরকাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু একটি বাণী বা গ্রন্থ রচনা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে মেনে নেয়ার পর মানুষের জন্য একথা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না যে, খোদা সত্যিকার অর্থেই বিদ্যমান, যিনি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এছাড়া এখানে খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করা কেবল কারও অনুমান নির্ভর কোন বিষয় নয় বরং একই গ্রন্থ বাস্তব সংবাদ হিসেবে একথাও বলে যে, খোদা বর্তমান, বিদ্যমান ও বিরাজমান আর শাস্তি ও পুরস্কার দিবস সত্য। অতএব, পূর্ণ যে বিশ্বাস, কোন সত্যাবেষী আকাশ ও পৃথিবীতে সন্ধান করে বেড়ায় কিন্তু খুঁজে পায় না, তার সেই অভীষ্ট এখানে অর্জিত হয়। তাই নাস্তিককে খোদা মানানোর জন্য অনন্য গ্রন্থ বা বাণীর মাধ্যমে যেভাবে চিকিৎসা করা যেতে পারে, আকাশ ও পৃথিবী দেখে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, নিছক ধারণা বা কিয়াস পূজারি প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে অবশ্যই নাস্তিকতার একটি সুষ্ঠু ব্যাধি থাকে। আর একই ব্যাধি বৃদ্ধি পেয়ে নাস্তিকদের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তা গোপন থাকে। এই ব্যাধির চিকিৎসা কেবল সেই ঐশ্বী গ্রন্থ করে থাকে যা রচনা করা সত্যিকার অর্থেই মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। কেননা যেভাবে আমরা ওপরে উল্লেখ করে এসেছি, আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে প্রণিধান করে ফলাফল নির্ণয়ে মানুষের মাঝে সর্বদা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বিদ্যমান ছিল। কেউ একভাবে বুঝেছে আর কেউ অন্যভাবে। কিন্তু অতুলনীয় কালাম বা গ্রন্থে এমন স্ববিরোধ থাকতে পারে না। কেউ নাস্তিক হলেও সে অনন্য গ্রন্থ বা ঐশ্বীবাণী সম্পর্কে এই মতামত ব্যক্ত করতে পারে না যে, কোন কথকের কথা বলা ছাড়াই তা আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় আদি থেকেই স্বীয় অস্তিত্বে বিদ্যমান! বরং অনন্য কালাম বা ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে কোন নাস্তিক ততক্ষণ পর্যন্ত বিতর্ক ও বিতঙ্গয় লিপ্ত থাকবে যতক্ষণ এর অনন্য হওয়া সম্পর্কে তার আপত্তি থাকবে। যখনই সে স্বীকার করে নিবে যে, এটি রচনা করা সত্যিই মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে তখনই তার হাদয়ে খোদাকে মানার জন্য একটি বীজ বপিত হবে। কেননা এই সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশই নেই যে, এই বাণী যার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে সে কি কাল্পনিক, নাকি বাস্তব অস্তিত্ব। কেননা কথক বা বক্তার অস্তিত্ব ছাড়া বাক্য বা কথার কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

এছাড়া অনন্য গ্রন্থ বা ঐশ্বী বাণীর আর একটি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য হলো, আত্মার পরাকাষ্ঠা বা পূর্ণতা লাভের জন্য মবদা ও মাআদ বা পরকাল সম্পর্কে যতটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক, বাস্তব সত্য বিষয় হিসেবে তা এতে লিখিত রয়েছে, কিন্তু আকাশমালায় ও পৃথিবীতে এ বৈশিষ্ট্য নেই। কেননা প্রধানত এগুলোর প্রতি প্রণিধানে ধর্মীয় নিগুঢ় রহস্যবলীর কিছুই জানা যায় না আর কিছু জানা গেলেও এ সম্পর্কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই প্রবাদই প্রযোজ্য যে, ‘বোবার ভাষা তার মা-ই বোবে’। এই পুরো বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐশ্বীবাণী বা ধর্মীয় গ্রন্থের অনন্যতা কেবল এ দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক নয় যে, প্রাকৃতিক বিধানের সুরক্ষা এর ওপর নির্ভরশীল বরং এদিক থেকেও আবশ্যক যে, অনন্য গ্রন্থ ছাড়া মুক্তির বিষয়টি অসম্পূর্ণ বা সুদূর পরাহত থেকে যায়। কেননা খোদাতেই যদি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকে তাহলে মুক্তির অর্থ কী আর এর উৎসই বা কোথায়? যারা খোদার বাণী বা ধর্মীয় গ্রন্থের অনন্য হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, তাদের কত বড় অজ্ঞতা যে, প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক সম্পর্কে এ মর্মে কুধারণা পোষণ করে যে, তিনি গঢ়াবলী নায়িল করলেও বিষয় তথ্যেচ আর মানুষের ইমানের পূর্ণতার জন্য যা প্রয়োজন সে কাজটি তিনি করেন নি। পরিতাপ! এরা চিন্তা করে না যে, খোদার প্রাকৃতিক নিয়মাবলী এমনভাবে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে যে, তিনি পোকামাকড়কেও অনন্য হিসেবে সৃষ্টি করতে দ্বিধা করেন নি, যেগুলোর খুব একটা উপকারিতা আছে বলেও মনে করা হয় না। তাই এটি কি তাঁর প্রজ্ঞাকে প্রশ়ংসনে জর্জরিত করবে না যে, তিনি এমন এক স্থানে এসে দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিঙ্গ হয়েছেন যার ফলে সমগ্র মানবতার ভরাডুবির আশঙ্কা দেখা দেয়? অধিকন্তু এর ফলশ্রুতিতে এ ধারণার উত্তর হওয়াই স্বাভাবিক যে, কোন মানুষ মুক্তি লাভ করাক তা খোদা আদৌ চান না! যেহেতু খোদা তা'লা সম্পর্কে এমন ধারণা করা অনেক বড় কুফরী, তাই অবশেষে এই দ্বিতীয় কথাটিই শিরোধৰ্য করতে হলো, যা খোদার মহিমাসম্মত আর বান্দাদের চাহিদার সাথে একান্ত সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ বান্দাদের পরিভ্রান্ত ও তত্ত্বজ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য খোদা অবশ্যই এমন গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন যা স্বীয় অতুলনীয়তার সুবাদে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায়ে উপনীত করে, অধিকন্তু যে কাজ কেবল বুদ্ধির জোরে সম্ভব নয় তা পূর্ণ করে দেখায়। অতএব, সেই গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন শরীফ যা এই পূর্ণ উৎকর্ষতার দাবি করেছে আর একে সত্যের পরম মার্গে পৌঁছিয়েছে।

ہست فرقان آفتابِ علم و دین تا برندت از گمان سوئے یقین  
پवیٹ کورآن شریف جذان و ذرمهٰ سری، یمن تو ماکے سندھ هتھے  
بیشاسےٰ دیکے نیوے یتھے پارے ।

ہست فرقان از خدا جل المتن تا کشت سوئے رب العالمین  
کورآن خودا ر سعدت رنجو، یمن تو ماکے بیش پرتپالکے دیکے آکھڑ  
کرتھے پارے ।

ہست فرقان روز روشن از خدا تا دہنڈت روشنی دیده ہا  
کورآن خودا ر پکھ خکے اکٹی سمعانی دیس، یمن تو ماکے  
(آدھا ایک) چوکھے االو دا ان کرتھے پارے ।

حق فرستاد این کلام بے مثال تا رسی در حضرت قدس و جلال  
خودا تالا ائی اننی گھٹ پرے رن کر رہن یعنی تۇمی پیٹھی و پرتا پاھیت  
خودا ر در با ر پیچھے پارے ।

داروئے شک است الہام خدائے کاں نماید قدرتِ تمام خدائے  
خودا ر ائلہام ہلولو سندھے ر پریمہ وکھکا ر  
کئننا تا خودا ر پورن شکیم بنا پرکاش کرے ।

ہر کہ رُوئے خود ز فرقان در کشید جان او رُوئے یقین ہرگز نہ دید  
یے کورآن نے اپنی ابوجزا و بیمیختا پردازش کر رہے  
سے نیکی و بیشاسےٰ چھارا دے دے نی ।

جان خود را سے کنی در خود روی بازے مانی ہاں گول و غوی  
اھنکاروں کا رنے تھوڑے نیجے کے دھنگسے ر مुکھے ٹھلے دیس  
کیسٹ تا ساتھ و اکھی بابے چیر آہامک و پختا پتھری خکے یاس ।

کاش جانت میل عرفان داشتے کاش سعیت تھم حق را کاشتے  
تو ما ر ہدی یا دی گھنی تکڑ جذان ارجمنے ر پری اکریش را خات  
ہا یا، تو ما ر ہدی یا دی ساتھ یا بپنے ر چھٹا کرتھے  
خود نگہ کن از سر انصاف و دین از گمان ہا کے شود کار یقین

তুমি স্বয়ং ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে চিন্তা কর যে, সন্দেহের ওপর নির্ভর  
করে কিভাবে বিশ্বাসের কাজ চলতে পারে?

ہر کہ راسویں درے بکشودہ است از یقین نے از گماں ہا بوده است  
�ا ر دوار خودا ر دیکے یا ویار جنی خولے، تا سندھرے کارণے نی  
برانیشیسے ر کارণے ہوئے

قدر فرقاں نزدت اے غدار نیست ایں ندانی کت جزا روے یار نیست  
ہے بیشاس�اتک! تؤر کاچے کوئی آنےর کون ملی نہی!  
ٹوئی جانیس نا اٹی ٹھاڈا تؤر کون سا ہایکاری نہی!

وچی فرقاں مردگاں را جاں دہ صد خبر از گوچ عرفان دہ  
کوئی آنےر وہی مُتدهرے جیبیت کرے آر تکڑجنا نے  
জগতের شত شত سংবাদ দেয়।

از یقین ہے نمایہ عالے کاں نہ بیند کس بصر داعم ہے  
تا نیشیت ڈانےر ام دعیشی دেখায় یا شত جগতেও  
کেউ دেখাতে پارবে نা।

ব্রাহ্মসমাজীরা এখানে কয়েকটি সন্দেহ দাঁড় করানোর প্রাণান্তকর ব্যর্থ প্রয়াস  
চালিয়েছে, যাতে ঐশী গ্রন্থ গ্রহণ না করার খোঁড়া কোন ওজর-আপত্তি দাঁড়  
করানো যায়, ধর্মীয় ব্যবস্থাদি যাতে কোনভাবে উৎকর্ষতা লাভ না করে বরং  
অসম্পূর্ণ থেকে যায় আর কোথাও যেন একথা বলতে না হয় যে, খোদা সেই  
দয়ালু ও করণাময় সন্তা, যিনি মানবের দৈহিক প্রতিপালনের লক্ষ্যে মানুষের  
খোরাকের ব্যবস্থা করার জন্য যেভাবে চন্দ্ৰ-সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন,  
অনুরূপভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রতিপালন ও সঠিক পথের দিশা দেয়ার  
জন্য স্বীয় গ্রন্থাবলী পাঠিয়েছেন। যেহেতু এরা দয়ালু ও করণাময় খোদার  
ওপর কার্পণ্য, নির্মতা ও অব্যবস্থার অপবাদ দিতে চায় আর তাদের ব্যাধিগ্রস্ত  
বিশ্বাসে স্পষ্ট সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কুধারণা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং  
অবমাননাকর বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয় তাই এ বিষয়ে তাদের যত সন্দেহ বা  
কুমন্ত্রণা রয়েছে তা এখানে যথাসম্ভব দূরীভূত করা বাঞ্ছনীয়, তাই উত্তরসহ তা  
নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে-

**প্রথম সন্দেহ:** কোন এলহামী গ্রাহ বানানো মানবীয় শক্তিসামর্থের উর্ধ্বে—এ মর্মে বিতর্ক এলহাম-সংক্রান্ত মূল বিতর্কেই একটি শাখা মাত্র। এলহাম সম্পর্কে এটি প্রমাণিত বিষয় যে, যুক্তির নিরিখে এর কোন আবশ্যিকতা নেই! তাই মানবীয় শক্তিবৃত্তি কোন গ্রহের দ্রষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম নাকি সক্ষম—সেই বিতর্কই অর্থহীন।

**উত্তর:** এর উত্তর পূর্বেই কিছুটা দেয়া হয়েছে যে, যুক্তিভিত্তিক অনুমান বা ধারণার মাধ্যমে খোদা ও পারলৌকিক বিষয়ে যা কিছু ভাবা বা অনুমান করা যায় তার সাহায্যে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের কোনটিই অর্জিত হয় না। আর অনুমান পূজারিদের হাতয়ে যেসব কুমন্ত্রণা বা সন্দেহ উঁকি ঘারে এলহাম ছাড়া তার নিরসন সম্ভবই নয়। প্রশ্ন হলো প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে এই ধারণায় উপনীত হলেও যে, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা থাকা উচিত! একথা কে বলবে যে, সেই স্রষ্টা বাস্তবে বিদ্যমান? এটি সত্য কথা যে, ভবন দেখে এক নির্মাতার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ হয়, কিন্তু সে বিশ্বাস আমাদের অর্জন হয়েছে অভ্যাসজনিত কারণে। এর কারণ হলো, ভবন দেখার পাশাপাশি নির্মাণ মিস্ত্রিও আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টাকে কে দেখাবে? এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস তখনই অর্জিত হবে যখন নির্মাণ কারিগরের ন্যায় তাঁরও কোন খোঁজখবর পাওয়া যাবে। বুদ্ধি যদি এ মর্মে সাক্ষ্যও দেয় যে, বিশ্বের কোন স্রষ্টা থাকা উচিত কিন্তু একই বুদ্ধি আবার বিস্ময় সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে এ প্রশ্নও করবে যে, এই ধারণা সত্য হলে সেই স্রষ্টার বিষয়ে আজ পর্যন্ত কিছুটা হলেও জানা যেতো। অতএব, যুক্তি ও বুদ্ধি স্রষ্টার অঙ্গিতের পানে কিছুটা পথের দিশা দিলেও স্মরণ রাখা উচিত যে, একই বুদ্ধি লুটেরার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছে। কাউকে নাস্তিক বানিয়েছে আর কাউকে করেছে প্রকৃতিপূজারি। কেউ কোন দিকে আকৃষ্ট হয়েছে আবার কেউ অন্য কোন দিকে। নিচক যৌক্তিক ধারণার ভিত্তিতে কীভাবে সেই বিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারে যার কখনো সত্যায়ন হয় নি? আর ভবিষ্যতে কোন সময় হবেও না। যুক্তি ও বুদ্ধি অনুমানের ভিত্তিতে যদি বলেও যে, কোন স্রষ্টা অবশ্যই থাকা উচিত! প্রশ্ন হলো, কে এমন আছে, যে আমাদের পুরোপুরি নিশ্চিত করবে যে, এই ধারণায় কোন প্রতারণা নেই? এর বেশি যদি আমরা ভাবিও তাহলে প্রশ্ন হলো, আমরা কী ভাববো? যদি বুদ্ধির বলে পুরো কাজ সমাধা করা সম্ভব হতো তাহলে কেন বুদ্ধি বা বিবেক আমাদেরকে পথিমধ্যে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয় আর সামনে

اگیوے یہ تو ایک کار کرے؟ آماں دے ر تکڑ جان و خودا کے چنار اے تھی کی پر م مار یے، کون نیمہ تا یا سرستا یا کاٹھیت؟ یہ دن بیشاسے ر جنی آماں دے ہدایت بکار، یا تادے ر جنی پرست کرنا ہے یا ر تکڑ جان و بیشاسے ر پر م مار گئے۔ اے ان عالمیک دین دارانہ ر گاہر و پر نیمہ کرے آماں ر کی سے اے چریکھی ایڈھیاٹیک پرشانتی لاب کرaten پاری؟ یہ د کے بول یعنی یا بُدھی ر و پر نیمہ کرے آماں دے تا لاب ہو یا سبھا ہتھا تو تاھلے آماں دے اے تھی یا خار یہ، اخن آماں دے ایلہامیں اے اے کون پروجیں نہیں، کننا آماں ر آماں دے ایٹھی لکھے پہنچے گئی۔ پریتاپ! اس سبھا ہو یا سبھا و یہ دی آماں ر چکیتیا ر سبھا نا کری اے و پورا سو سبھا یا لابر ڈپاے ایں سبھا نا کری تاھلے اے تھی آماں دے دیور گے کارن بیے!

اے در انکار ماندہ از الہام کرد عقل تو عقل را بنام  
ہے ایلہامیں ایسے کارکاری توماں بیوک بُدھی  
بیوک کے بدنام کرے رہئے ہے۔

از خدا رو بخویش آوردی ایں چ آئین، کیش آوردی  
خودا کے ہڈے نیج پربتی پوجا یا لیٹھ ہے! اے کے میں دھرم و کے میں  
بیشاس تومی پرداش کرائے؟

تنه کس سر زخویشن تاب راز توحید راچ ساں یا پر  
یاتکھن کون بُدھی پربتی پوجا یا ایں پریا ر ہے! اے کے میں دھرم و کے میں  
رہسی کیا بابے ڈیکھاٹن کرaten پارے?

تنه بر فرق نفس پا بُنی کے ب پاک، پلید فرق کنی  
یاتکھن ایہمیکا کے پد تلے پیٹھ نا کرave تا دنیں تومی پریا و اپریا  
ماں پا رکھ کیا بابے کرave؟

ہر ک شد تالع کلام خدا رست از ایتھی حرص و ہوا  
یہ بُدھی خودا ر باشیا ر ان سرگان کرave ساں نا ر و لاب لالسا ر  
دا ساٹھ خیکے مُنکھی لاب کرave!

از خود و نفس خود خلاص شدہ مہبیط فیض نور خاص شدہ

যে নিজের অহমিকা ও আত্মস্তরিতা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে, সে বিশেষ ঐশ্বী  
জ্যোতির বিকাশস্থলে পরিণত হয়।

برتر از رنگِ ایں جہاں گشته آنچہ ناید بوہم آں گشته  
سے ا پُرثیبیوں پ्रথا سیکھ ریتی نیتیوں کی تاریخ  
کथا دھارণا و مکاریا کرنا یا یاد کرنا ।

۶۔ اسیرانِ نفسِ امارہ بے خدامِ سخت ناکارہ  
آمرا را ابادخی آٹاوارا ہاتے بندی، آمرا خودا بجاتیات سامپورن بناوے  
اُرثہتین ।

۳۔ میاں بست وحیٰ حق برشاو اے بسا عقد ہائے ماکہ کشاد  
یخن ختم کوئے خداوے کوئے خداوے کوئے خداوے  
آنکے رہنسے یہ دنار ایسا ہے مکاریا ہاتے بندی، آمادے ہلے، آمادے ہلے  
آنکے رہنسے یہ دنار ایسا ہے مکاریا ہاتے بندی، آمادے ہلے

نہ شود از تو کارِ ربانی آسائے تھی چ گردانی  
تؤر ہاتے خودا را کا ج ہاتے پارے نا تائی کن خالی چاکی بُراؤ چیس بَا  
کن بُراؤ چستا کر چیس؟

تو و علم تو ما و علم خدا فرق بین از کجاست ۳۔ کجبا  
کوئا خویاں تھیں آر تؤر جان آر کوئا خویاں آمرا و خودا را جان! اخن دیکھ  
ڈیکھیاں تھیں آر تؤر جان آر کوئا خویاں آمرا و خودا را جان!

آں یکے را ٹکار خوبیش بے بر دیگرے چشمِ انتظار بے در  
একজন এমন, যে প্রেমাঙ্গদের সাথে কোলাকুলিতে রত, পক্ষান্তরে অপরজন  
অধীর নয়নে বন্ধুর অপেক্ষায় দারগানে চেয়ে আছে।

آں یکے ہمیشیں بے مہ روزے دیگرے ہر زہ گرد در کوئے  
একজন এমন, যে স্বীয় প্রেমাঙ্গদের সান্নিধ্যে বসে আছে, অপরদিকে একজন  
এমন যে গলিতে ভবঘূরের ন্যায় হাবড়ুবু খাচ্ছে।

آں یکے کام یافت بے تمام دیگرے سونتہ بلکرت کام  
একজন ঘোলআনা তার কর্মকাণ্ডে নিজ অভীষ্টে পৌছেছে আর অপরজন  
অভীষ্টের জন্য জ্বলেপুড়ে মরছে।

عارت آئیز عالم اسرار خود دم زنی زہے پندرار  
تؤر رہسیا بُرت جگاتেر سمرانے لجیت هওয়া উচিত। تুই نিজেকে নিয়ে গর্ব  
کরিস, পরিতাপ! (তোর ধ্যানধারণার জন্য)

مہ کار تو تمام افتاد وہ چ کارت بعقل خام افتاد  
تؤر سکل کاج اসমাঞ্চ রয়ে গেছে, আক্ষেপ! দুর্বল-অক্ষম বুদ্ধির সাথে  
তোকে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে।

অতএব, হে ব্রাহ্মসমাজী ভাইয়েরা! মহা সম্মানিত খোদা যেহেতু দেখা ও  
বিচারবিশ্লেষণের জন্য আপনাদের চোখ দিয়েছেন, তাই আপনারা নিজেরাই  
চোখ মেলে একটু দেখুন যে, এলহামের আবশ্যকতা প্রমাণ হয়েছে কিনা?  
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যৌক্তিক প্রমাণাদির বরাতে যথাস্থানে এর বিশদ বিবরণ  
দেয়া হয়েছে, সেখানে পড়ে দেখুন। এরপর যদি খোদার ভয়ে সত্যপথ গ্রহণ  
করেন আর পথপ্রদর্শনের পদটি যদি খোদার হাতে ছেড়ে দেন তাহলে এটি  
মহাসৌভাগ্যের লক্ষণ হবে। অন্যথায় যোগ্যতায় কুলালে যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে  
তা খণ্ডন করে দেখান। কিন্তু উন্নাদের মত আচরণ পরিহার করুন, যারা  
কারো কথায় কর্ণপাত না করে কেবল নিজেদের বুলিই আওড়াতে থাকে। এটি  
কি আশ্চর্য হওয়ার মত বিষয় নয় যে, আপনারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত  
হচ্ছেন, পদে পদে হেঁচট খাচ্ছেন? জানি না, এ কেমন অলক্ষ্মনে পর্দা যা  
অপসারিত হওয়ার নামই নেয় না আর কেমন হন্দয় যা বুঝাতেই চায় না?  
বিবেকের মানদণ্ড কোনু তাকে তুলে রেখে বেমালুম ভুলে গেলেন যে,  
সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে জ্ঞান করছেন? অলীক ধারণার পূজা  
করতে কে না জানে? নুতন কী এমন উপহার এনেছেন যে কারণে আনন্দে  
বগল বাজাচ্ছেন? আপনাদের হন্দয়-আগল কেন খোলে না, এর কোন কারণ  
আমরা খুঁজে পাই না। আপনাদের চোখ দেখতে কেন অপারগ? বুদ্ধি  
আপনাদের সাথে এ কেমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করলো যে, আপনাদের  
মত নিবেদিত পুজারিদেরকে ছেড়ে চলে গেল? সাথীগণ! ভালোভাবে চিন্তা  
করে দেখুন! এলহাম ছাড়া পূর্ণ ঈমানও অর্জন সম্ভব নয়, ভুলভাস্তিও এড়ানো  
যায় না আর খাঁটি একত্রবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং প্রবৃত্তির কামনা  
বাসনার ওপরও নিয়ন্ত্রণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ‘আল্লাহু আছেন’ বলে সর্বত্র  
যে ‘সাজ সাজ’ রব শোনা যায় আর সারা বিশ্ব যে ‘আছেন আছেন’ বলে তাঁকে

ডাকছে তা এলহামেরই কল্যাণে। আদিকাল থেকে এলহামই হৃদয়ে এই প্রেরণা সম্বর করে আসছে যে, খোদা বিরাজমান রয়েছেন আর এ কারণেই ইবাদতকারীরা ইবাদতের স্বাদ পায় এবং খোদার সত্তা ও পরকাল সম্পর্কে বিশাসীদের প্রতীতী ও নিশ্চয়তা লাভ হয়। আর এটি তা-ই, যার সুবাদে কেটি কোটি তত্ত্বজ্ঞানী দৃঢ় অবিচলতা ও গভীর ঐশ্বীপ্রেমের সুগভীর উচ্ছ্঵াস নিয়ে ক্ষণভঙ্গুর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এটি তা-ই, স্বীয় রক্ত দিয়ে যাঁর সত্যতার সাক্ষ দিয়ে গেছেন সহস্র সহস্র শহীদ। হ্যাঁ, এটি তা-ই, যার দুর্বার আকর্ষণী শক্তির কারণে বাদশাহুরা ‘দরিদ্রের বেশ’ ধারণ করেছেন। বড় বড় সম্পদশালীরা বিভ্রান্তি-বৈভবের ওপর দরবেশী বা দ্বীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এরই কল্যাণে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর, অশিক্ষিত মানুষ এবং বৃদ্ধারা দৃঢ় ঈমানের সাথে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এটি সেই তরীরই কীর্তি, যা বারবার অগণিত মানুষকে সৃষ্টির পূজা ও কুধারণার ঘূর্ণবর্ত থেকে মুক্ত করে একত্রিত ও দৃঢ়বিশ্বাসের নিরাপদ উপকূলে পৌঁছে দিয়েছে। সেটিই (অর্থাৎ এলহাম) অন্তিম মুহূর্তের বন্ধু আর নাজুক সময়ের সাহায্যকারী। কিন্তু নিছক ও নিরেট ‘যুক্তিরুদ্ধি’ নামের পর্দার মাধ্যমে পৃথিবীর যতটা ক্ষতি হয়েছে, তা অজানা কোন বিষয় নয়। তোমরা নিজেরাই বল, খোদার সৃজনী বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করতে পুরুষ ও তাঁর অনুসারীদেরকে কে বাধ্য করেছিল? শাস্তি ও পুরক্ষার দিবস আত্মার স্থায়ীত্ব সম্পর্কে কে গ্যালেনকে সন্দেহের আবর্তে নিষ্কেপ করেছিল? খোদা, প্রতিটি অগুপরমাণু সম্পর্কে সম্যক অবগত, সেকথা অস্বীকারে কে এসব দার্শনিককে বাধ্য করেছিল? কে বড় বড় দার্শনিকদের দ্বারা প্রতিমাপূজা করিয়েছে? প্রতিমার উদ্দেশ্যে মোরগ ও অন্যান্য প্রাণী বলি দিতে কে বাধ্য করেছে? এটি কি এলহামবিহীন সেই বুদ্ধি নয়? অধিকন্তু, এই সন্দেহ প্রকাশ করাও সমীচীন নয় যে, অনেক মানুষ এলহামের অনুসারী হয়েও মুশরিক হয়ে গেছে, নিত্য নতুন উপাস্য বানিয়েছে! যদিও এর জন্য খোদার সত্য এলহাম দায়ী বা দোষী নয় বরং এটি সেসব লোকের নিজেদেরই ভাস্তি যারা সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে আর কামনা ও বাসনার দাসত্বকে খোদার ইবাদতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও খোদার এলহাম তাদের সংশোধন ও দেখাশুনার বিষয়ে অমনোযোগী হয় নি, তাদেরকে ভুলে থাকে নি বরং যেসব বিষয়ে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে দ্বিতীয় এলহাম সেসব কথার সুরাহা করেছে। যদি তুমি বল যে, স্বল্পবুদ্ধির লোকেরাই বুদ্ধির বিকৃতির জন্য দায়ী, উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্নরা নয়, তাহলে জেনে

রাখ, একথা সঠিক নয়। এটি জানা কথা যে, নিরক্ষুণভাবে ও সাকুল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধি একা কোন কাজ করার সামর্থ রাখে না। কেননা এ পর্যায়ে এর রূপ হলো সামষ্টিক বা সাকুল্যের। আর স্বতন্ত্র সত্তা ছাড়া সমষ্টির অস্তিত্ব প্রয়াণিত হতে পারে না, বরং ব্যক্তির মাধ্যমেই সমষ্টির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু যে নিছক বিবেক বা বুদ্ধির অনুসারী হিসেবে স্বপ্রস্তাবিত বিশ্বাসে কখনো ভুল করে নি, ঐশ্বী বা ধর্মীয় বিষয়াদি বর্ণনার ক্ষেত্রে হোচ্ট খায় নি— এমন উৎকর্ষ মানুষ কে দেখাতে পারে? যার বিশ্বাস বিশ্বজগতের স্মৃতা ও শান্তি, পুরুষার ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ে ‘আছে’ এর স্তরে পৌঁছে গেছে আর যার একত্ববাদের বিশ্বাসে শিরকের কোন সংমিশ্রণ নেই এবং খোদার দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তনে যার প্রবৃত্তি স্বীয় কামনা ও বাসনার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছে— এমন পূর্ণ মানব কোথায়? এ সম্পর্কে আমরা একটু আগেই লিখে এসেছি যে, স্বয়ং দার্শনিকদের স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, নিছক বুদ্ধির জোরে ঐশ্বী বা ধর্মীয় বিষয়ে মানুষ পূর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না বরং তারা একটি সন্দেহযুক্ত ও অলীক ধারণা লালন করে মাত্র। এটি জানা কথা যে, যতদিন কারো জ্ঞান সন্দেহপূর্ণ ও ধারণা নির্ভর, বিশ্বাসের স্তর থেকে অধঃপতিত ও নিম্নমানের থাকে, ততদিন ভাস্তি হতে সে নিরাপদ নয়। যেমনটি কিনা অঙ্গ ব্যক্তি পথভোলার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। একথা মনে করা যে, শুধু বুদ্ধির ওপর নির্ভর করলে ভুল হলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের দৃষ্টিপাতে তার সংশোধনও হয়ে যায়। তাও তোমাদের উদ্ভৃত বুদ্ধিরই আরেকটি ভাস্তি, যা এখন পর্যন্ত দূরীভূত হয় নি। কেননা আমরা ইতিপূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, দৃষ্টির ক্রটির কারণে কোন না কোন সময় এবং কোন কোন স্থানে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মানববুদ্ধির ভুল হয়ে যাওয়া একটি অবধারিত বিষয়, যা কোন বিবেকবান অস্বীকার করবে না। কিন্তু (তোমরা ভালোভাবে ভেবে দেখ,) যাবতীয় ভাস্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া ও এর সংশোধন করতে পারা আবশ্যিক নয়। অতএব, এমন পরিস্থিতিতে জানা কথা যে, আবশ্যিকীয় বিষয়ের সমাধান অনাবশ্যিকীয় বিষয় দ্বারা সর্বাদা সর্বাবস্থায় হওয়া সম্ভব নয় বরং যা নিশ্চিতভাবে ভাস্তি ও সঠিক আর যাতে ফুলার্যিবুল্কাই এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে, তা-ই আবশ্যিকীয় ভাস্তির সংশোধন করতে পারে। এরপরও (প্রশ্ন দাঢ়িয়া) কেন খাঁটি একত্ববাদ খোদার এলহাম ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়?

আর এলহামের অস্বীকারকারী কেন শিরকের কল্যুষ থেকে মুক্ত হয় না? —এ

বিষয়টি একত্ববাদের মর্ম ও অর্থ সম্পর্কে একান্তভাবে চিন্তা করলেই জানা যেতে পারে। কেননা সত্তা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে খোদার অন্যের অংশিদারিত্ব হতে মুক্ত থাকা এবং যে কাজ কেবল তাঁর শক্তি ও সামর্থের মাধ্যমে হওয়া উচিত, সে কাজ অন্যের শক্তিবলে সাধিত হওয়ার বিশ্বাস না রাখাই হলো তৌহীদ বা একত্ববাদ। এই তৌহীদ বা একত্ববাদকে পরিত্যাগের কারণেই আগ্নি, সূর্য ও প্রতিমার পূজারিয়া বহুত্ববাদী বা মুশারিক আখ্যা পায়। কেননা তারা নিজেদের প্রতিমা ও দেবতাদের কাছে এমন সব কামনা বাসনা পূর্ণ করার মিনতি করে, যা কেবল খোদা তাঁলাই দান করতে পারেন। এখন এটি জানা কথা যে, এলহামে যারা বিশ্বাস করে না তারাও সৃষ্টি সম্পর্কে প্রতিমাপূজারিদের মতই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা খোদার গুণে গুণান্বিত। অধিকন্তু এ বিশ্বাসও রাখে যে বান্দাদের মাঝেও সেই সর্বশক্তিমানের শক্তি বা ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা তাদের ধারণা হলো, আমরাই নিজেদের বুদ্ধিবলে খোদাকে খুঁজে বের করেছি। সৃষ্টির সূচনালগ্নে আমাদের অর্থাৎ মানবকুলের মাথায় এ ধারণা জাগ্রত হয়েছিল যে, কোন খোদা নিযুক্ত করা উচিত আর আমাদের চেষ্টা-চরিত্রের সুবাদেই তিনি অপরিচিতির গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে, পরিচিত হয়েছে, সৃষ্টির প্রভু গণ্য হয়েছে, ইবাদতের যোগ্য আখ্যা পেয়েছে! নতুবা পূর্বে তাঁকে কে জানত? কে তাঁর অস্তিত্বের খবর রাখত? আমরা বুদ্ধিমান লোকেরা জন্ম নিয়েছি বলেই তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে! প্রশ্ন হলো, এ বিশ্বাস প্রতিমাপূজারিদের বিশ্বাস হতে কোন অর্থে কি কম ঘৃণ্য? মোটেই নয়। কোন পার্থক্য যদি থেকে থাকে তাহলে তা কেবল এতটুকু যে, প্রতিমাপূজারিয়া অন্যান্য বঙ্গনিয়কে নিয়ামতদাতা ও অনুগ্রহশীল সাব্যস্ত করে থাকে আর এরা খোদাকে বাদ দিয়ে নিজেদের তমসাচ্ছন্ন চিন্তাধারা ও বুদ্ধিমত্তাকে পথের দিশারী ও অনুগ্রহকারী নির্ধারণ করে। বরং চিন্তা করলে এদের পাল্লা প্রতিমাপূজারিদের চেয়েও বেশি ভারী মনে হয়। কেননা প্রতিমাপূজারিয়া যদিও এ কথায় বিশ্বাসী যে, খোদা আমাদের দেবতাদের অনেক বড় বড় শক্তি দিয়ে রেখেছেন আর তারা কিছু উপহার ও উপটোকন গ্রহণের বিনিময়ে পূজারিদের অভীষ্ট ও উদ্দিষ্ট পূর্ণ করে থাকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা একথা বলে নি যে, সেসব দেবতারাই খোদাকে আবিষ্কার করেছে আর এই মহান নিয়ামত অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা জানা গেছে তাদেরই বাহ্যিকভাবে! একথা এলহামকে অস্বীকারকারী সেসব লোকদের মাথায়ই কেবল উদয় হয়েছে, যারা খোদাকেও নিজেদের আবিষ্কারাদির

তালিকায় যোগ করেছে আর চরম গর্দভসুলভ মানসিকতাবশত সুউচ্চ কঠে ঘোষণা করে বসেছে যে, খোদার পক্ষ থেকে কখনো ‘আনাল মওজুদ বা আমি বিদ্যমান ও বিরাজমান’ ধরনি প্রতিধ্বনিত হয় নি।

এ কৃতিত্ব আমাদেরই যারা নিজেরাই কারো বলা বা শেখানো ছাড়া তাঁকে আবিক্ষার করেছি। সে তো ছিল ঘূমন্ত বা মৃতবৎ ব্যক্তির ন্যায় নীরব ও নিখর। আমরাই অনেক মাথা খাটিয়ে এবং খুঁজে, খুঁড়ে তাঁকে বের করেছি। বলা যায় তাদের প্রতি খোদার অনুগ্রহের তো প্রশংস্ত ওঠে না বরং এক অর্থে খোদার প্রতি তারাই অনুগ্রহ করল। অর্থাৎ খোদাও যে কেউ আছেন, এ কথার নিশ্চিং সংবাদ না পেয়েও আর তাঁর অবাধ্যতায় শাস্তি এবং আনুগত্যে পুরস্কার লাভ হয় এ বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও তারা কাল্পনিক খোদার আনুগত্যের বেড়ি গলায় পরিধান করেছে, অথচ নিশ্চিং এলহামও লাভ করে নি আর কোন বাণীও শোনে নি। এক কথায়, তারা নিজেরাই রাখা করলো আর নিজেরাই খেয়েও নিলো। কিন্তু খোদা এমন দুর্বল ও শক্তিহীন ছিলেন যে, স্বয়ং আপন সন্তার সংবাদ দেবেন এবং নিজের প্রতিক্রিয়ার পূর্ণতা সম্পর্কে বান্দাদেরকে আশ্চর্ষ করবেন— তাঁর পক্ষে এতটুকুও হয়ে ওঠে নি। বরং তিনি লুকিয়ে ছিলেন আর তারা তাঁকে প্রকাশ করেছে! তিনি অজানা ও অচেনা ছিলেন তারা তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে! তিনি নীরব ছিলেন আর তারা নিজেরাই তাঁর কাজ করেছে! বস্তুত মাত্র কিছুকাল পূর্বেই তিনি খোদা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন! আর তা-ও তাদেরই চেষ্টা প্রচেষ্টার ফসল— এ হলো তাদের হাবভাব। সকল বিবেকবান জানে যে, এ কথাটি প্রতিমাপূজারিদের কথার চেয়েও হীন ও ঘৃণ্য। কেননা প্রতিমাপূজারিয়া তাদের দেবতাদের শুধু অনুগ্রহকারী ও পুরস্কারদাতা আখ্যা দিয়ে থাকে কিন্তু এলহামের অস্বীকারকারীরা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের দাবি অনুসারে তাদের দেবীর (অর্থাৎ বুদ্ধির) শুধু মানুষের প্রতিই নয় বরং খোদার প্রতিও অনুগ্রহ রয়েছে, যার সুবাদে (তাদের ধারণানুসারে) খোদা পরিচিতি লাভ করেছেন। এহেন পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট বিষয় যে, এলহামে অবিশ্বাসের ক্ষতি কেবল এটিই নয় যে, তারা খোদার অঙ্গিতে কাল্পনিক ও অলীক ঈমান এনেছে আর বিভিন্ন প্রকার আস্তিতে নিপতিত। অধিকস্তু, তারা খাঁটি একত্রবাদ যাকে বলে তা হতেও বিপ্রিত এবং শিরকে কল্পুষিত। কেননা খোদার অনুকম্পা ও নিয়ামতরাজি সম্পর্কে ধারণা করা যে, অন্যদের পক্ষ থেকে তা এসেছে, এটিই তো শিরক! তা না হলে শিরক আর কাকে বলে?

ত্রাক্ষসমাজীরা হয়ত এখানে এ উত্তর দেবে যে, আমরা মনে করি আমাদের বুদ্ধি খোদার পক্ষ থেকে লাভ হয়েছে এবং আমরা তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে বিশ্বাসী। কিন্তু স্মর্তব্য যে, তাদের এই উত্তর প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়। মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস হলো, যে বিষয়ে সে নিজেকে সবল ও সক্ষম মনে করে বা যে কাজ নিজের শ্রম দ্বারা সাধন করে সেটিকে নিজেরই কৃতিত্ব মনে করে। পৃথিবীতে অধিকার বা মালিকানাস্তু যেভাবে বা যতটা প্রতিষ্ঠিত হয় তা কেবল এ দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকেই নিজ প্রচেষ্টায় যা অর্জন করে একে নিজেরই ব্যক্তিগত স্বত্ত্ব ও সম্পদ জ্ঞান করে। ঘরের মালিক যদি মনে করে যে, আমার কাছে যা আছে তা খোদার, এতে আমার কোন অধিকার নেই, তাহলে চোরকে কেন ধরে আর খণ্ডনেরকে দেয়া খণ্ড কেন ফেরত চায়? নিঃসন্দেহে মানুষ নিজ শক্তিবলে যা কিছু করে সেই সাফল্যের বরমাল্য নিজেই গ্রহণ করে। বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে খোদা তাঁলাও এ রীতিই নির্ধারণ করে রেখেছেন, সকল প্রকৃতি এরই প্রতি আকৃষ্ট। শ্রমিক পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দাবি করার অধিকার রাখে আর চাকুরিজীবিও বেতন চায়। অন্যের অধিকার অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করা মানুষকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। সারা রাত নিজ গৃহে সুখনিদ্রা যাপন করে প্রত্যুষে ক্ষেতে গিয়ে যে দেখে, রাতে মেঘ নেমেছে আর প্রবল বর্ষণের কল্পণে তার ক্ষেতকে অতি প্রয়োজনীয় পানিতে টইটম্বুর করে দিয়েছে, সে যেভাবে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, এর বিপরীতে যে পুরো রজনী বিনিদ্র কাটিয়ে, এক মুহূর্তও না ঘুমিয়ে জঙ্গলে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে প্রবল শীত সহ্য করে ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করে, সে-ও প্রভাতে একইভাবে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে— কোনভাবেই তা সম্ভব নয়। অতএব, জানা কথা, যেভাবে এ বিশ্বাস কেউ রাখে না যে, মানুষকে আল্লাহ তাঁলা অক্ষম, দুর্বল, অসম্পূর্ণ, জ্ঞানহীন, প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত আর ভুলভাস্তিতে নিপত্তি পেয়ে তার প্রতি করণাবশত স্বীয় এলহামের মাধ্যমে সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন বরং সে মনে করে, আমরা নিজেরাই কষ্ট ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে খোদাকে চেনার ও আবিষ্কারের সকল কাজ সমাধা করেছি; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সে আদৌ সে ব্যক্তির মত হতে পারে না, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, খোদা আমার কোন পরিশ্রম ও চেষ্টাসাধনা ছাড়াই একান্ত শ্রেষ্ঠ ও অনুকম্পাবশত আমাকে স্বীয় বাণীর মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। আমি ঘুমস্ত ছিলাম খোদা

আমাকে জাগ্রত করেছেন, মৃত ছিলাম খোদা আমাকে জীবন দিয়েছেন, অযোগ্য ছিলাম, খোদাই আমার হাত ধরেছেন।

অতএব, এ পুরো বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, এলহামে অবিশ্বাসীরা খাঁটি একত্রবাদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত আর তাদের আত্মা হতে প্রকৃত বিশ্বাসীদের ন্যায়- (سُرَا আল-আরাফः 88) **أَعْصَمْدُلِّيْلِهِ الْبَزُّৰِيْلَوْ لَآنْ هَدَنَا اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ** অর্থাৎ- সকল প্রশংসন খোদা তাঁলার, যিনি স্বয়ং আমাদেরকে জান্নাতের পানে পরিচালিত করেছেন, খোদা যদি পথ না দেখাতেন, তাহলে আমরা কোন ছার যে, নিজ যোগ্যতাবলে গন্তব্যে পৌছে যাবো- এ ধ্বনি উপরি হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। খোদার মূল্যায়ন তারা অতি ঘণ্ট্যভাবে করেছে। যেসব উত্তম গুণাঙ্গণ আবশ্যিকভাবে খোদার প্রতি আরোপ করা আবশ্যক ছিল, তার সাধুবাদ দিয়েছে নিজেদের বুদ্ধিকে আর তাঁর যে মহিমা প্রকাশ করা উচিত ছিল, সেই মাহাত্ম্য প্রদান করেছে নিজেদের প্রবৃত্তিকে। আর যে শক্তিনিয়ন্ত্রণ একান্তই তাঁর বিশেষত্ব, সেসবের মালিক সেজে বসেছে নিজেরাই। তাদের সম্পর্কে সম্মানিত খোদা সত্যই বলেছেন যে- **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقًّا فَرَدُوا لَهُ مِنْ شَيْءٍ** (সুরা আল-আনাম: ৯২) অর্থাৎ এলহামের অস্তীকারকারীরা খোদার কল্যাণময় সন্তান মূল্য বোঝে নি আর তাঁর করণারাজিকে চিনেও নি, যা বান্দাদের সকল প্রয়োজনে উত্থলে উঠে। এ কারণেই তারা বলেছে, খোদা কোন মানুষের প্রতি কোন গ্রহ্ণ নায়িল করেন নি।

تَرَاعَقْلُ تُوْهَرْ دَمْ پَائِيْ بَنْدَ كَبْرَ مِيدَارْد  
بِرْ عَقْلِ طَلَبْ كَنْ كَتْ زَخْوَدِيْنِيْ بِرْوَلْ آرْد  
তোর (তথাকথিত) বুদ্ধি সদা তোকে অহংকারে লিঙ্গ রাখে, যা! এমন বিবেক  
সন্ধান কর যা তোকে অহংকার থেকে মুক্তি দেবে।

هَمْ بَهْتَرَ كَمَاَسِ عَلِمْ حَقْ بِيَامُوزِيمْ كَهِيْ إِلِيْ كَهِيْ مَادَارِيمْ صَدْ سَهْو وَخَطَا دَارِد  
খোদার জ্ঞান খোদা হতে শিখবো আমাদের জন্য এটিই অধিক উত্তম। কেননা  
আমাদের কাছে যে জ্ঞান আছে তাতে শত শত ভুলভাস্তি রয়েছে।

كَهِيْ غُويْدَ بَهْتَرَ ازْ قَوْلَشْ گَرْ اوْ خَامُوشْ بَشِينِدْ كَهِيْ دَرَدَسْتَ اَنْ دَالَ گَرَادَسْتِ تُوْ گَنْدَارَد  
খোদা যদি নীরব বসে থাকেন, তাহলে তাঁর চেয়ে উত্তম কথা আর কে বলতে  
পারে?

আর তিনি যদি তোর হাত ছেড়ে দেন, তাহলে কে তোর হাত ধরবে বা তোকে  
সাহায্য করবে?

بروقدرش بہ میں واژجت بے اصل دم درکش کر ایں ججت کر می آری بلاہابر سرت آرد

যা! তাঁর মর্যাদা অনুধাবনের চেষ্টা কর আর অমূলক বিতর্ক পরিহার কর,  
কেননা তুই যে যুক্তি উপস্থাপন করছিস তা তোর জন্য সমস্যা ডেকে আনবে।

আমি দৃঢ়কঠে নিশ্চিতরূপে বলছি, এলহামকে বাদ দিয়ে নিছক বুদ্ধির দাসত্ত  
কেবল ক্ষতিকরই নয় বরং এটি সেই বিপদ বা সমস্যা যা হতে বহু বিপদাপদ  
ও সমস্যা জন্ম নেয়, যার বিশদ বিবরণ (ইনশাআল্লাহ) যথাস্থানে দেয়া হবে।  
মহাসম্মানিত খোদা যেভাবে প্রত্যেক বস্তুর পারস্পরিক জুটিবন্ধন সৃষ্টি করেছেন  
অনুরূপভাবে তিনি এলহাম ও বুদ্ধিরও পারস্পরিক জুটিবন্ধন সৃষ্টি করেছেন।  
সেই নিরঙ্গুশ প্রজ্ঞার প্রকৃতিতে বিরাজমান সর্বজনীন রীতি হলো, যতদিন  
একটি বস্তু স্বীয় জুটি হতে বিচ্ছিন্ন থাকে ততদিন এর বৈশিষ্ট্যাবলী সুগংথি থেকে  
যায়, বরং অধিকাংশ সময় লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হয়। বুদ্ধি বা যুক্তিশক্তির  
অবস্থাও অনুরূপ। ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর শুভ ও কল্যাণকর লক্ষণাবলী  
তখনই প্রকাশ পায়, যখন তা জুটি অর্থাৎ এলহাম এর সাথে যুক্ত হয়। নতুন  
জুটি ছাড়া তা পিশাচ বা প্রেত বিশেষের ন্যায় আচরণ করে আর পুরো গৃহ  
গ্রাস করতে উদ্যত হয় আর গোটা শহরকে ধ্বংস ও বিরান করে দিতে চায়।  
কিন্তু জুটিবন্ধন গড়ে উঠলে তার চেহারা ও বৈশিষ্ট্য কতই না সুন্দর হয়ে  
যায়— অশুভ দৃষ্টি হতে খোদা একে রক্ষা করুন। যে গৃহে তা অবস্থান করে সে  
গৃহকে প্রাচুর্যে ভরে দেয়, যার কাছে যায় তার সকল দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটায়।  
তোমরা নিজেরাই একটু চিন্তা করে দেখ! জুটি ছাড়া কোন জিনিস একা কী-ই  
বা কাজ করতে পারে? তাই প্রশ্ন হলো, তোমরা কেন এই ভোতা বুদ্ধিকে এত  
অহংকারের সাথে উপস্থাপন কর? এটি কি তা নয় যা বারবার প্রতারণার  
কারণে লাঞ্ছিত হয়েছে? এটি কি তা নয়, বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ার কারণে  
যার মাথায় বড় বড় ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান? আমাকে একটু বল দেখি যে, এতে  
ভালো লাগার কী আছে যার প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হচ্ছ? এটি কোথাকার অঙ্গীয়া  
উড়ে এসে জুড়ে বসল, যাকে তোমরা মনপ্রাণ সঁপে দিলে? তোমরা কি জান  
না, এটি তোমাদের পূর্বে কতজনের রক্ত চুম্বেছে? কত জনকে ভষ্টার কুপে  
নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছে? তোমাদের মত অনেক প্রেমিককে সে ভক্ষণ  
করেছে, সে শত শত লাশ ফেলেছে। আমাকে একটু বল! একা এই বুদ্ধির  
জোরে তোমরা এমন কোন् ধর্মীয় সত্য আবিষ্কার করেছ যা পূর্ব হতেই পৰিত্র  
কুরআনে উল্লেখ নেই? বেশি নয়, কেবল দু'চারটি এমন দ্রষ্টান্ত দেখাও। নিছক

যুক্তি ও বুদ্ধির জোরে যদি তোমরা এমন সুমহান সত্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই, তবুও মানা যেতো। এমন পরিস্থিতিতে তোমরা অতি গর্বের সাথে নিজেদের বৈঠকে বসে বলতে পারতে যে, আমরা এমন মানুষ, যারা সেসব সত্য উদ্ঘাটন করেছে যা ঐশ্বী গ্রন্থাবলীতে নেই। কিন্তু আক্ষেপ! তোমাদের বিভিন্ন পুস্তিকায় গুটি কতক সেসব কথা ছাড়া আর কিছুই নেই, যা পবিত্র কুরআন হতে চুরি করা। এছাড়া যা কিছু চোখে পড়ে তা অকেজো বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়, যা হতে বুদ্ধির পরিবর্তে তোমাদের জ্ঞানহীনতা, নির্বাদিতা ও আভিষ্ঠ প্রকাশ পায়, যার স্বরূপ এ গ্রন্থে খোলাশা করে লেখা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

অতএব, এই মুখ এবং এই যোগ্যতা নিয়ে ঐশ্বী এলহামকে অস্বীকার করা নিজেই খোদার স্থলাভিষিক্ত সাজা আর পবিত্র নবীদেরকে স্বার্থপর মনে করা— এই হলো আপনাদের পৃত পবিত্র প্রকৃতির স্বরূপ! আত্মপ্রতারণায় মগ্ন হয়ে না যে, বুদ্ধি ভালো বা উন্নত এক বিষয় আর সকল প্রকার গবেষণা আমরা যুক্তিবুদ্ধির ভিত্তিতেই করি! বুদ্ধি বা বিবেচনার কল্যাণকর হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর গুণাগুণ তখনই প্রকাশ পায়, যখন এটি আপন জুটির সাথে সম্পৃক্ত থাকে নতুবা প্রতারিত করার ক্ষেত্রে সে শক্তিদের চেয়েও ভয়াবহ আর দৈত আচরণ প্রদর্শনে মুনাফিকদের চেয়েও এগিয়ে। অথচ তোমাদের দুর্ভাগ্য, তোমরা এর বেলায় ‘জুটি’র নামটি শোনাও পছন্দ কর না! বন্ধুগণ, ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ! জুটি ব্যতীত কোন কিছুরই গত্যন্তর নেই। খোদা জোড়া জোড়া সৃষ্টি বা ‘জুটি’কে এক বিস্ময়কর বিষয় হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যেদিকেই তাকাবে, জুটির মাধ্যমেই কাজ হতে দেখবে। আমরা তোমরা সবাই চোখ দিয়েই দেখি, কিন্তু সূর্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। কানের মাধ্যমে শুনলেও বাতাসের প্রয়োজন রয়েছে। সূর্য আত্মগোপন করলেই অন্ধ হয়ে যেতে হয়। কানে বাতাস প্রবেশের পথ বন্ধ করে দাও তাহলে শ্রবণশক্তি কাজে আসবে না। স্বামীর সাথে যে মহিলার মেলামেশাই হয় না, সে কীভাবে অন্তঃসন্তু হতে পারে? যে জমিকে পানিই স্পর্শ করে নি, তাতে কীভাবে ফলন হতে পারে?

এ কথাগুলো এমন নয়, যা তোমাদের জ্ঞানের অতীত। এটি সেই প্রাকৃতিক নিয়ম, যার অনুসরণের দাবি তোমরা করছ। অতএব, এখন এই দাবিকে কার্যে রূপায়িত করে দেখাও, যেন লোক-দেখানোর মাঝেই তোমাদের সমূহ কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ না থাকে।

حاجتِ نورے بود ہر چشم را ایں چُنیں اُفتاد قانونِ خدا  
پر تھے ک چو خیر کے جنے اُن لئے اُنکے ساتھیں خداوند آفرید

چشمِ بینا بے خوبِ تاباں کہ دید کے چُنیں چشے خداوند آفرید  
دُعْتی شکلی سامپناں چو خیر کے جنے اُن لئے اُنکے ساتھیں خداوند آفرید  
پارے؟ امّا چو خیر کے جنے اُن لئے اُنکے ساتھیں خداوند آفرید

چوں تو خود قانونِ قدرتِ بُلکنی پس چرا بر دیگر ان سر میزِ  
یہ خانے تُمی سُریں اُنکیلیں نیام لجھان کر سے خانے ان نیام کے اُن  
آپستی کر؟

آنکہ در ہر کار شد حاجت روا چوں رواداری کہ نبود رہنما  
یہ نیں سکلن بیشی (سُستی) چاہیدا پُرمان کرے سے خانے ان نیام کے اُن  
پھرے دیشا دے بنن نا؟

آنکہ اسپ و گاؤ خر را آفرید تا رہ پشت تو از بار شدید  
یہ نیں تُمما کے پیٹکے کٹھن بُوکا خیکے مُعکنی دیوار کے جنے ڈوڈا، گاہا و  
گاہی سُستی کرے ہنن؛

چوں ترا جیاں گزارد در معاد اے عجب تو عاقل و ایں اعتقاد  
تُمیں تُمما کے پر کالنے بیشی کے نیام کے جنے ڈوڈا، گاہا و  
گاہی سُستی کرے ہنن؛

چوں دو چشمیں دادہ اند اے بے خبر پس چرا پوشی یکے وقت نظر  
ہے اجڑ! یہ خانے تُمما کے دُوٹے چو خیر کے جنے ڈوڈا، گاہا و  
گاہی سُستی کرے ہنن؛

آنکہ زو ہر قدرتے گشته عیاں قدرتِ گفتار چوں ماندے نہاں  
سے ہی ساتا، یا ر پکش خیکے سکلن پر کار کنکنی سپٹتھی پر کاشم ان، پر کاشم حلوہ  
تاں باکشکی کی کرے اُنکاشمیت خاکتے پارے؟

آنکہ شد ہر وصفِ پاکش جلوہ گر پس چرا ایں وصف ماندے مُسٹر  
سے ہی ساتا، یا ر سکلن پر بیشی پر کاشمیت و بیکاشمیت، سے خانے اُن  
بیشی پر کی کرے گوپن خاکا سُستی؟

هر کہ او غافل بود از یار دوست چارہ ساز غفلتیش پیغام اوست  
پرتوک بختی یے بسکر سمرانے عداسین تاریخ عداسینےر اکماڑا چکنگسا  
ھللو تاری باگی؟

تو عجب داری ز پیغام خدائے ایں چے عقل و فکر تست اے خود نمائے  
خودا را باگی سمسارکے تومی بیسمیل پراکاش کر، ہے احংকاری! اٹی تو ماڑا  
کے ملن بیوک بُوندی؟

اطف او چوں خاکیاں را عشق داد عاشقان را چوں بیگنڈے زیاد  
تاری دیوارا یখন ماتیر مانو ہوئے ماءوے بালোবাসা سঞ্চার করলো সেখানে তিনি  
নিজের প্রেমিকদেরকে কী করে ভুলতে পারেন?

عشق چوں بجیئه از اطفِ اتم چوں نه بجیئی دوائے آں ام  
پریم دয়াপরবশ হয়ে যেখানে তিনি স্বয়ং ভালোবাসা দিয়েছেন, সেখানে  
তোমাকে এই প্রেমানলের ওষধ কেন দেবেন না?

خود چو کرد از عشق خود دلها کباب چوں نه کردے از سر رحمت خطاب  
যেখানে তিনি স্বয়ং স্বীয় প্রেমানলে হিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন সেখানে  
কেন তিনি দয়াপরবশ হয়ে তোমার সাথে বাক্যালাপ করবেন না?

دل نیاراد بجز گفتار یار گرچ پیش دیدها باشد نگار  
بسکر سাথে বাক্যালাপ ছাড়া হাদয় স্বত্তি পায় না, বস্তু চোখের সামনেই (বসে)  
থাকুক না কেন?

پس چو خود دلبر بود اندر حباب کے توں کردن صوری از خطاب  
যেখানে بسکر نিজেই پর্দাবৃত সেখানে বাক্যালাপ ছাড়া ধৈর্য ধারণ কী করে  
সম্ভব হতে পারে?

لیک آں داند کہ او دلداده است در طریق عاشقی افتاده است  
کিন্ত (এ সকল কথা) কেবল সে জানে, যে ভালোবেসে প্রেমের পরম মার্গে  
উপনীত রয়েছে।

حسن را با عاشقان باشد سرے بے نظر در کے بود خوش منظرے

প্রেমিকদের সাথে সৌন্দর্যের সম্পর্ক থাকে, মূল্যায়নকারী বা কদরদান ছাড়া  
সুন্দর দৃশ্যের মূল্যই বা কী?

عشق آں باشد کہ او گم از خوداست در طریقِ عشق خود بینی بدست  
پ्रেمیک سے، یہ نیچے کے بُلے یاَوَّیٰ । پ्रেমের گلیتے آمیخت نندنیَّیَّ ।

لیکن استیصال ایں کبر و خودی نیست ممکن جز بُحیٰ ایزدی  
کیسے سے ہی اہنگ کار اب و آمیخت کے مُل ہتے ٹےپاٹن کراؤ ہُدوَّار وہی  
ছাড়া সম্ভব নয় ।

هر کہ ذوق یار جانی یافت ست آں ز وحی آسمانی یافت ست  
یہ بُخاکی پریا-بُخُور سাথে ساکھاترے سُواد پے یو چے، سُوگُریا وہی ر کلیا گئے  
تار تا لاب ہو یو چے ।

عشق از الہام آمد در جہاں درد از الہام شد آتش فشان  
اُلہامِ اُمرے مادھیمے پرِم پُرثیبیتے اسے چے، بُدناو اُلہامِ اُمرے کلیا گئے  
آگُونیگیریتے رُنپ نیو چے ।

شوق و اُنس و اُفت و مهر و وفا جملہ از الہام مے دار د ضیا  
آغڑ، سُنہ، بُلُو ہا سا، دُریا و بیشستتا، سُوکی چُور سُو ندَرْ اُلہامِ اُمرے  
مادھیمے ہی اُلُو گوکُنڈا سیت ہو یا ।

هر کہ حق را یافت از الہام یافت ہر رُنخ کو تافت از الہام تافت  
یے-ہی ہُدوَّار کے پے یو چے، اُلہامِ اُمرے کلیا گئے پے یو چے آر پر تیک دیشیمان  
چهارا اُلہامِ اُمرے مادھیمے ہی اُلُو کیت ہو یو چے ।

تو نہِ اہلِ محبت زیں سب از کلام یار مے داری عجب  
تُرمی پرِم جگاتِ لُوك نو، تائی بُخُور بُکالاپےِ بیشمی پر کاش  
کر ।

عشق می خواہد کلام یار را روپرس از عشق ایس اسرار را  
پرِم بُخُور سাথে بُکالاپےِ دا بی را خو । یا وو! اک پرِمیک کے پرِمےِ ایس  
رہسی جیزےس کر ।

ایں مگو کز درگھش ڈوریم ما ربط او با مشت خاک ما کبا  
اکथا بولونا یے، آمرارا یهہتُ تاں دارگاھ خکے دوڑے، تاہی آمادارے  
مات ماتیر تلوار ساٹھے کیتاںے تاں سمسک رچت ہتے پارے؟

داند آں مردے کہ روشن جاں بود کیس طلب در فطرت انساں بود  
آلوکیت ہدیا جانے یے، خودا ر سناں مانوں پرکृتیں آبشنیکیاں  
بیشستی ।

دل نی گیر تسلی جز خدا ایں چنیں افتاد فطرت ز ابتدا  
ہدیا خودا چاڈا کونتاںے سنت پتے پارے نا، آدی خکے مانوں پرکृتی  
امنائی چلنے آسائے ।

دل ندارد صبر از قول ہگار کاشند ایں چنم از آغاز کار  
پرماسپدے ر ساٹھے باکیالاپ چاڈا ہدیا سنت (دیہی) پایا نا، آدی خکے  
(تاں پرکृتیتے) خودا ایسیج بپن کرے رے خکے ہن،

آنکہ انساں را چنیں فطرت بدار چوں کمال فطرت ش دادے باد  
(سےہی سبسا) یعنی مانوں کے امیں پرکृتی دان کرے ہن، تینی کیتاںے تار ا  
ٹوکرے پورے پرکृتیگات بیشستیکے نئے کرتے پارے ن؟

کار حق کے از بشر گردد ادا کے شود از کرکے کار خدا  
خودا ر کا ج مانوں کیتاںے کرتے پارے؟ اکٹی ٹوچھ کیٹ دارا کیتاںے  
خودا ر کا ج ساٹھیت ہتے پارے؟

ماہم جہلم و او دنانے راز ماہم کوریم و او را دیدہ باز  
آمرارا سبایا اجتن آر تینی سکل رہسی سمسکرے ابھیت، آمرارا سبایا  
اکھ آر تینی چکھومان

باغدا هم دعوے فرزانی سخت جلسہ و رگ دیوانی  
خودا ر سامنے بُوندیمتو یا پرچار دا بی کرا چرم اجتنتا و ٹنڈانار  
پریچاۓ ک ।

تافتن رو از خور تاباں کہ من خود برام روشنی از خویشتن

প্রদীপ্ত সূর্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এই ধারণায় যে, আমি নিজের ভেতর থেকে  
নিজেই আলো বের করব,

عالی রাকুর কর্দস্ত ইস খিল স্রগুস অঞ্চ দ্র ছাহ প্লাল  
এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে এ ধারণা অঙ্ক করে দিয়েছে আর ভষ্টতা বা ধৰণ্সের  
কুপে উল্টো করে নিষ্কেপ করেছে।

নাজ ব্রফ্লেট কুন গুৰ্জেট স্ট দ্র রো তো ইস খৰ মন্ডি বুং স্ট  
যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অহংকার করো না, এই (অলীক)  
বুদ্ধিমত্তা তোমার পথে একটি প্রতিমাস্বরূপ।

عقل کاں با کبر میدارند غلق ہست ہمن و عقل پندراند غلق  
ماں ہوئےর اہنگکارے کلیمیت بُعدیمیتای بی کیھو نی، کیسٹ تاسدڑے و ماں ہو  
اکے بُعدیمیتای مانے کارے।

کبر شہر عقل را ویراں کند عاقلاں را گم رہ و ناداں کند  
اہنگکار بُعدیمیت کے بیان کارے دیئے بُعدیمیتای پথبڑست و اجتی کارے  
تُلے।

آنچہ افراید غور و مجھی چوں رساند تا خدیت اے نوی  
اہنگکار و آٹاٹشاؤয়াকে যা বৃদ্ধি করে, হে ভষ্ট! তা তোমাকে খোদা পর্যন্ত  
কিভাবে পৌছাতে পারে?

خود روی در شرک اندازد ترا تو بکن از خود روی اے خود نما  
آٹاگৰ্ব তোমাকে শিরকে লিঙ্গ করবে, হে লোক-দেখানোতে অভ্যন্ত ব্যক্তি!  
আহংকার পরিত্যাগ কর, আত্মারিতা থেকে তওবা কর।

হেست مشرک از سعادت دُور تر و از فیوضِ سرمدی مُہুরْ تر  
মুশরেক سৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থাকে আর খোদার চিরস্থায়ী রহমত হতে  
বিতাড়িত ও বহু দূরে থাকে।

از خدا باشد خدا را یافت نے بِ مکرو حیله و تدبیر و فن  
খোদাকে কেবল খোদার সাহায্যেই পাওয়া সম্ভব, কোন ষড়যন্ত্র, ধূর্ততা,  
পরিকল্পনা ও কৌশলের মাধ্যমে তাঁকে পাওয়া যায় না।

তানায়ি পিশ ছে ছে খুর খুর খুর হস্ত জাম তো স্বাস্থ প্রে ন দুর  
খোদার সামনে যতদিন ছোট বাচ্চার ন্যায় না আসবে, ততদিন তোমার  
পেয়ালা কেবল তলানী সর্বস্বই (কাদা) হবে।

শর্ত ফিল ছে বুদ উৎ ও নিয়া ক্ষ নদিয়ে আব ব্র জায়ে ফ্রাজ  
ঐশ্বী কল্যাণরাজি লাভের জন্য অনুনয়বিনয় হলো শর্ত। পানিকে কেউ উচু  
জায়গায় স্থির থাকতে দেখে নি।

ছে নিয়াজি জুয়িড আংজা নাজ নিয়ে এ প্রে খুর তা দ্রষ্ট প্রোজ নিয়ে  
খোদা বিনয় পছন্দ করেন, সেখানে অহংকারের কোন স্থান নেই, স্বীয় ডানায়  
ভর করে তাঁর দ্বারে পৌঁছা সম্ভব নয়।

عاجز اں را پپور دا جل سرکشان محروم و مردود ازل  
سےই مہامہ تھیما سبیت سبتو بینی دیئر کے لالن پالن کرئن۔ بیدڑاہی را  
چیر بختیت و پ्रتیا خیا تھی تھا کے ।

চোল নিয়াই নির তা আফত কে ফ্রেব তো শুয়া দ্র জাব  
যতক্ষণ তুমি সুর্যের আলোতে না আসবে, পর্দার অন্তরালে তোমার ওপর  
আলো কীভাবে পড়তে পারে?

آبِ شور اندر کفت ہست اے عزیز نازہا کم کن اگر داری تمیز  
ہے سنه بنا جن! تোমার অঞ্জলিতে কেবল লোনা পানিই রয়েছে, যদি কিছুটা  
পার্থক্যশক্তি থাকে, তাহলে গর্ব করো না।

آبِ جاں بخشی ز جاتاں آيدت رو طلب میکن اگر جاں بایت  
কেবল প্রেমাস্পদের পক্ষ হতেই তুমি জীবনসুধা লাভ করতে পার। যদি  
জীবনের প্রত্যাশী হও, তাহলে যাও তাঁর কাছে যাচ্না কর।

হست آل آب بقا بس نাপدید ক্ষ ব্র মিচ্বাই ছে রাইশ নদিয়  
সেই জীবনসুধা এখন সম্পূর্ণভাবে দুষ্প্রাপ্য, এর পথ স্বর্গীয় প্রদীপ ব্যতীত  
কেউ দেখে নি।

آل خیالاتے که بنی از خرد پرتو آن ہم زوجیٰ حق رسد

سے سکل دھندا رہا یا تُمی نیج بُوندیوں لے رانگ کر، اور آلواؤ خُدوں اور  
وہیں مادھیمے ہی لآٹ ہے ।

لیک چشم دیدن چوں بازیست زیں دل تو محروم ایں راز نیست  
یہ ہے تو تُمہارا آدھیاتیک چوکھ دُشمنان نہیں، تاہی تُمہارا ہدایہ اے رہنمائی  
سمپارکے انوار ہیت ।

سرکشی از حق کہ من دنا دلم حاجتِ عیش ندارم عالم  
تُمی خُدوں اور آلواؤ ہے اسی تھے یہ، آمی سریں بड بُوندیوں، آمی تاں  
وہیں کوئی پروجیون دیکھ نا، کہننا آمی نیجے ہی بُوندیوں ।

لغزش تو حاجت پیدا کنڈ در دے عقل ترا رُسوہ کنڈ  
تُمہارا سُلیمان تُمہارا کے بیخاری بانیوں ہٹا دے اور تُمہارا بُوندی نیمی میں  
تُمہارا لاشیت کر رہے ।

عقل تو گورِ مجھص از بروں واندرنوش چیست؟ یک لاشے زبوں  
تُمہارا بُوندی باہر ہے کہ سادا-شہر-سوندھ سماں دیر نیاں اथاث اے رہ تھے  
کی؟ اکٹی شوچنیاں لاش؟

منہائے عقل تعلیم خداست ہر صداقت را ظہور از انبیاءست  
بُوندیوں پر ایسا مارگ ہلے خُدوں ایسا شیکھا ایسا نبیوں کے پکھ ہتھیں سکل ساتھیوں  
بھیختکا ش ۔

ہر کہ علے یافت از تعلیم یافت تافت آں روئے کزو روئے نافت  
یہ-ہی جان لآٹ کر رہے شیکھاں مادھیمے کر رہے ہے، یہ چھڑا (خُدوں) بیمُو خ  
ہے نا سے ہی چھڑا ہی جو اتممیت ہے گھے گھے ।

با زبانِ حال گوید روزگار اے قصیر العمر گیر آموزگار  
با سُنگ ایسا بُوندیوں کے لئے سماں تُمہارا نیریخے سماں تُمہارا ہے کشیدھیاں مانوں! اک  
شیکھ کر ایسا ایسا اکادمیوں دھر ।

طبع زاد ناقصاں ہم ناقص ست گرتا گوشے بود حرنے بس ست  
یارا دُرْبَلِ جنما نے ایسا تادے ایسا پرکُتیو دُرْبَلِ ہے یہ خاکے، یہ دی تُمہارا کا ن  
خاکے تاہلے نسیہت ایسا اکٹی شہدیت یہ خوئے ।

حق منزہ از خطا تو پُر خطا داوسہا کم گن و بحق پا  
خودا بُلبرانی مُکت آوار تُومی مُرتیمان آنی، بیواد بیسنداد ہئے دیوے بوار  
ستوئر و پور پریشیت خاک ।

عقل تو مغلوب صد حرص و ہواست تکیہ بر مغلوب کار اشیاست  
تو ما ر بیوک بُلڈی شت لُوبلیکلا و کامنا واسنا ر کاھے پر اسٹ، پر اجیت  
شکر و پور نیر کرنا دُرْبَانِ گا دے ر کا ج ।

از کس و ناس بیاموزی فنوں عار داری زاں حکیم بے چکوں  
تُومی سکلن یادو-مذکور کاھے شیکھ جان نا او کیسٹ سے ای اک-ادیتیا پر جانے نے  
کاھے یتھے تو ما ر لج جا هے ।

از تکبیر را حق بُنداشتی ایں چ کر دی ایں چ تختے کاشتی  
اہنگ کار برشات تُومی ستھے ر پاھے ہے دیوے، تُومی اٹی کی کر لے؟  
ای کے ملن بیج تُومی بپن کر لے؟

اے تُنگر ایں ہاں مولائے ماست کر عطیا تیش بھے ارض و سماست  
ہے نیڑھو! اینی آما دے ر سے ای مانی، ای اکا ش و پُری بیوی ر سب تاں را  
دانے ر اکش ।

اب و باران و مہ و مہر آفرید کرد تابتستان و سرما را پید  
تینی میڈ، بُنڈی، چند و سُری سُنڈی کر رہے ن آر گریم و شیت و سُنڈی کر رہے  
تا بُغصل او غذائے خود خوریم زندہ مانیم و تن خود پروریم  
یون تاں انو غاہے آما را خاوار یتھے پاٹی، بُنچے خاکی آوار آما دے ر  
دیہیک لالن پالنے ر بُجھا هے ।

آنکھ بُر تن کرد ایں لطفِ اتم کے کند محروم جاں را از کرم  
یعنی آما دے ر دے رہے پریم پریم مهہر بانی کر رہے ن تینی آما کے  
کیا باءے انو غاہ بخشیت کر تے پارئن?

وھی فرقان ست جذب ایزدی تا بردت از خودی در بے خودی  
تو ما کے پر بُنڈی دا ساتھ ہتھے بینی وَا آدھا اتھک تار دیکے نیوے یا ویا ر  
جنی کو ر آنے ر وھی ہلے خو دا ر چُمک کشکی ।

ہست قرآن دافعِ شرکِ نہاں تا مرادِ راہم ازو یابیِ نشاں  
کُر آناں پرِ چلن شیرکِ دُور کر اار مَادِیْم، یئن تُومِ خُوداَر نِیدَرْن خُوداَر  
پکشِ خُکے سرالسَرِ پِتے پار ।

تا رَیِ از کبر و خود بینی و ناز تاشویِ ممنونِ فضلِ کارساز  
یئن تُومِ اہنگاَر، گرْ و آتَانْشَاَغا هتے مُعْنی پِتے پار، یئن تُومِ  
خُوداَر کُنپارِ جنْج کُتْج هتے پار ।

ڈور شو از کبر تا رحم آیدش بندگی کن بندگی سے بایدش  
اہنگاَر پاریہار کر، یئن تینی دیوارْ هتے پارِن । داسِٹ بَرَن کر،  
کِنَنَا تاُر داسِٹ آبَشَک ।

زندگی در مُردنِ عجز و بکاست هر که افتادست او آخر بخاست  
مُتُّھُر، بِنَیَ و کرْنَدِنِرِ مَا کو جیَوَن نیھیت آچھے । یے خُوداَر پِتے مُتُّھُر کے  
بَرَن کرِے، سے ابَشَوے جیَوَن لَبَّت کرِے ।

ہست جامِ نیستی آپِ حیات هر که نوشیدست اُورست از ممات  
آتَانِ بیلُونِتِرِ شوْدَه ای ہلُو جیَوَن سُوْدَه یے سُوْتی پان کرِے سے مُتُّھُر هتے مُعْنی  
لَبَّت کرِے ।

عاقِل آں باشد کہ جوید یار را و از تَذَلَّل ہا برآرد کار را  
بُوندیمان سے، یے بُنُرِ سُنکانے راتِ خاکے آر بِنَیَ و کاکُوتِ مِنْتِرِ مَادِیْمے  
لَكْشَرِ اَرْجَن کرِے ।

اعلیٰ بہتر ازاں عقل و خرد کت بچاہ کبر و خوت اَفْنَد  
سے ای بُوندی و دُرْتَتَا هتے نیرُونِتَا شرے، یا تُوماکے اہنگاَر و اہمِیکاَر  
کُنپے نیکِپ کرِے ।

طالبِ حق باش و بیرون از خود آ خود روی ہا ترک کن بہر خدا  
آلانْهَارِ سُنکان کر ابر و آمیتِ خُکے بَرِیَوے اسُو، خُوداَر دُوہاَرِ  
آتَانْشَرِتَا پاریہار کر ।

من ندامِ ایں چے ایمان ست و دیں دم زدن در جنبِ رب العالمین

আমি জানি না এটি কেমন সমান ও কেমন ধর্ম যে, বিশ্বপ্রতিপালকের সামনে  
বড় বড় কথা বল।

তো কুবা ও আন তাদের মুল্লত কুবা তো কুন ইস আপ্সি হাকম না  
কোথায় তুমি আর কোথায় সেই সর্বশক্তিমান খোদা! তওবা কর আর এমন  
নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করো না।

যিক দে গুরু ফিশ কম শুড ইস হে খল্ল ও জেহান বৃহৎ শুড  
যদি খোদার কল্যাণ-প্রবাহের ছিটাফেঁটা এক মুহূর্তের জন্যও হ্রাস পায়,  
তাহলে পুরো সৃষ্টি ও বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রেত হ্যাতি লাফ এস্টুলা মুন ও এজ গুলি খুইশ বিরুদ্ধ পা মুন  
(তুমি) নগণ্য সন্তা, অতএব শ্রেষ্ঠত্বের আস্ফালন করো না আর নিজের পা নিজের  
চাদরের বাইরে বের করো না, অর্থাৎ নিজের সাধ্যের বাইরে কথা বলো না।

عابد آں باشد کہ پیشش فانی است عارف آں کو گویدش لاثانی است  
ইবادতকারী সে, যে তাঁর দরবারে আত্মবিলীন হয় আর তত্ত্বজ্ঞানী সে, যে  
তাঁকে অদ্বিতীয় আখ্যা দেয়।

খুইশ্টেন রা নিক এন্ডিশিডে এ হ্যাক ল্লে জে ব্র ফেহিডে  
তুমি নিজেকে পুণ্যবান জ্ঞান কর, হে হতভাগা! খোদা তোমাকে হিদায়াত দিন,  
তুমি কত (ভয়াবহ) ভুল ধারণায় লিষ্ট!

এস চেন্সিস বালা র বালা চুজু প্ৰি যা ম্বুর রাজ জাত বিজুস মন্ত্ৰী  
তুমি কেন এত বেশি উড়ছ? নাকি তুমি সেই অনন্য সন্তার অস্বীকারকারী?  
কাখ দিনা রা জে দিদিতি ব্যা কত খুশ এফাদস্ত এস ফানি স্রা  
কিসের মোহে তুমি এই পার্থিব জীবনের উপর নির্ভর করছ? এই নশ্বর  
মুসাফিরখানা কি তোমার ভালো লেগে গেছে?

دل چرا عاقل بے بند اندرایں ناگهاباں باید شدن بیرول ازیں  
بুদ্ধিমান কেন এর মোহে আচ্ছন্ন হবে? এখান থেকে যে হঠাত করে বের হতেই  
হবে।

از پے دُنیا بُریدن از خدا بس ہمیں باشد نشانِ اشقمیا  
پُرثیوبیویں جنی خُودا ر ساٹھے سمسکر کھن کروا، اتھی تو دُرْبَنگاده ر سپت  
پاریچیا ।

چوں شود بخشش حق برکے دل نے ماند ہ دُنیاش بے  
کاروں اپتی وختن خُودا ر انواعیا ہے، پُرثیوبیویتے تار آر بیشی مان بسے نا ।

ہوش کُن کیں جائگ جائے فناست باخدا میباش چوں آخر خداست  
بیوکے خاتا او، ایس پُرثیوبی کشان بسے نا۔ خُودا ر ساٹھے سمسکر سُھان کر،  
کئنا اب شوے تُرمی خُودا ر ای مُخُودیوی ہے ।

زہر قاتل گر بدست خود خوری من چ ساں دام کہ تو دانشوری  
تُرمی یادی نیج ہاتھیا پُرثیوبیوی وختا و تاہلن آمی کیتا رے بُرکا بُو یے،  
تُرمی بُرکیمان؟

آل گروہے بیں کہ از خود فانی اندر جاں فشاں برگفتہ ربانی اندر  
سے سکلن لُوك دے رکے دے، یارا نیج دے رکے بیلیاں کرے دے یار خُودا ر  
نیردشے ر کھاتیرے نیج دے رکے پُرثیوبیوی وسیل دے یار ।

فارغ افتاده ز نام و عز و جاه دل ز کف و از فرق افتاده کلاہ  
تارا نام، سماں و پُرثیوبیوی و پُرثیوبیوی ساٹھے سمسکر ہیاں، تارا خُودا ر پڑھے  
بینڈوں آر ماٹا ر پاگڈی سمسکر کے (ار्थاً سماں سمسکر) تارا بُرکشپ ہیاں ।  
دُور تر از خود بے یار آمیختہ آبرو از بہر رُونے ریختہ  
اہنگ کار ہتھے تارا خُودا ر سُکڑا ر اکا کار ہے گھے، تارا چھارا دُرْشَنے ر  
جنی سماں و مَرْيَادا جلاؤ لی دیوے ہے ।

دیدنِ شاں میدید یاد از خدا صدق ورزش در جناب کبریا  
تادے ر دُرْشَن لَاَبَ کروا خُودا ر سُمران کروا یا، تارا مہییان خُودا ر دُرْبَان ر  
نیشان ।

توزِ ایکبار سر بر آهان پازده بیرون زراہ بندگاں  
نیج دے رکے بڈ ملنے کرے ماٹا ڈیچیے تُرمی ہاندے ر پَلَخ دیوے ہے ।

تାଙ୍କରୁ ଉଜ୍ଜ ଦେ ନଫ୍ତ ଏଯା ନୁହ ଖାଲି ଚାହ ତାବ ବାଇ  
ତୋମାର ଜୀବନେ ସତଦିନ ବିନୟ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ନା ହବେ ତତଦିନ ତାତେ ଐଶ୍ଵି  
ଜ୍ୟୋତି କିଭାବେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ହତେ ପାରେ?

ତାନିମିର ଦାନେ ଅନ୍ଦର ଜମି କେ ଜିକ୍ ଚଦ ମିଶୁଦ ତୁ ଖୁଦ ବେ ମିଳି  
ସତଦିନ ଶସ୍ୟଦାନା ମାଟିର ସାଥେ ମିଶେ ନା ଯାବେ ତୁମି ନିଜେଇ ଚିନ୍ତା କର ଏକ  
ଥେକେ ହାଜାର କି କରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବେ?

ନିଯିତ ଶୁ ତା ବର ତୁ ଫିଚାନେ ରସ ଜାଲ ବୈଣିଶ ତାଙ୍କର ଜାନେ ରସ  
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ନିଜେକେ ବିଜୀନ କର ଯେନ ତୋମାର ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣରାଜି ବର୍ଧିତ ହୟ,  
ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଯେନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରତେ ପାର ।

ତାତୋ ଶର , ଉବ୍ଜ ଓ ମୁହଁରେ ଲାଭ ଫିଚାନ ଆ ରହିବେ  
ସତଦିନ ତୁମି ଦୁର୍ଦ୍ଶା କବଲିତ, ଅକ୍ଷମ ଓ ନିର୍ମପାଯ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତ ନା ହବେ ତତଦିନ  
ତୁମି ସେଇ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକେର ଅନୁଗ୍ରହେର ଯୋଗ୍ୟ ହବେ ନା ।

ଚିହ୍ନିତ ଏଯାଶ ଓ ପଦାଶନ କାରହୁ ରା ବାହା ବନ୍ଦାଶନ  
ଈମାନ କୌ? ଖୋଦାକେ ଏକ ମନେ କରା ଆର ଖୋଦାର କାଜକେ ଖୋଦାର ହାତେ  
ସମର୍ପଣ କରା ।

ପୁରୁଷ ର ଆମୁଶ ଖର ରା ଯାଫି ପି ର ତୁମିଶ ଚାର ସର ତାତି  
ଯେଥାନେ ତୁମି ତାର ଶିଖାନୋ ଜାନେର ଭିନ୍ତିତେ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରେଛ, ସେଥାନେ ତାର  
ଶିକ୍ଷା ହତେ କେନ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନିଚ୍ଛ?

ଅନ୍ଦରୁଣ ଖୁଶି ରା ରୁଷନ ମାଲ ଆଞ୍ଜି ମି ତାବ ବାବ ର ଆମା  
ନିଜେର ହଦୟକେ ଆଲୋକିତ ମନେ କରୋ ନା, ଯା କିଛୁ ଉଜ୍ଜଳ, ତା ସ୍ଵର୍ଗେରଇ  
କଲ୍ୟାଣେ ।

କୁରହେତ ଆ ଦିଦିକ୍ଷା ଏଇ ନୁରନିଯିତ ଗୁରହେତ ଆ ସିନ୍ଧେ କରଶକ ଦୁରନିଯିତ  
ସେଇ ଚୋଥ ଅନ୍ଧ ଯାତେ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ନେଇ, ସେଇ ବକ୍ଷ କବର ଯା ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ।

ସାଲୁଖିନ ଓ ଚାଦିକିନ ଓ ଅତ୍ୟା ଜମଳେ ରେ ଦିଦିନ ଏ ଓହି ଖଦା

پُونچبَان، ساتِیبَادی و مُعْتَدَلَکَارا اِمَن مَانُوَش، یَا رَا وَهِیَر کَلِیَّاَنِے سَثِیَک پَخ  
لَّاَبَ کَرَرَهِنِ ।

آَل کَبَا عَقْلَے کَه از خُود دَانِد شَفَعَه آَل شَخَصَ کَه او فَهَمَانِد شَفَعَه  
اِمَن بُونِدِی کَوَّاَرَی، یَا نِیْج شَکِّلَوَلِنِ خَوَدَاکَه بُونِتَه پَارَهِنِ اَتِی کَبَل  
سَے-ای بُونِتَه پَارَهِنِ، یَا کَه سَهَرَنِ خَوَدَا بَوَّاَرَنِ ।

عَقْلَ بَے وَ حِیْشَ بَنِتِ دَارِی بَرَاه بَتِ پَرَسِتِ ہَائِنِ شَام وَ گَلَّوَه  
تاَرِ وَهِیَرِ چَادَّا بُونِدِی تَوَمَارِ پَخِه اَكَتِي تَوَمَارِ مَتِ آَرِ تُومِی سَکَال-سَنْدَا  
مُوتِیپُونِجَاَیِ کَرَرَه چَلَّاَنِ ।

پِیْشَ چَشمَت گَرَشَدِی اِس بَنِتِ عِیَان از سِرِ شَکِّ تو شَدِی جَوَیِ رَوَانِ  
يَدِی اَهِی مُوتِی تَوَمَارِ چَوَّخِرِ سَامَنِنِ اَنْکَاشِ پَهَوَهِ یَهَتِ تَاهَلَنِ تَوَمَارِ چَوَّخِرِ  
خَوَکِ اَنْکَاش-بَنْجَا بَوَّاَهِ یَهَتِه ।

لَیْک از بِرْ قَمَتِی چَشمَت نَمَانِد بَتِ پَرَسِتِ آَخِرَت چُوَوِ بَتِ نَشَانِد  
کِنْتِی دُرْبَانِجَی بَرَشَت تَوَمَارِ چَوَّخِی هَارِیَهِ گَهِ، اَتِی تَوَمَارِ پُونِجَا اَبَشَوَهِ  
تَوَمَارِکَوِ مُوتِیِرِ مَتَاهِی نِیْسَنْدَانِ کَرَرَه تُولَّهِه ।

عَقْل در اسرارِ حق بِس نَارِسَاست آنچِ گَه گَه می رسَد هم از خداست  
مَانَوَیِیَّ بُونِدِی اَرْشَیِ رَهْسَنْیاَبَلَّی پَرَسَنْتِ پَوَّاَتِه سَكَفَم نَهَی، کَخَنَوَه کَخَنَوَه  
يَا کِیْلُو لَّاَبَ هَيَّ تَاَوِ خَوَدَاَرَی دَانِ ।

گَر خَرَد پَکِیْزَه رَائِیَه آَورَد آَل نَه از خُود هم زَجاَیَه آَورَد  
بُونِدِی يَدِی اَنْنَتِ با پَرِیَّا مَتَاهِمَت آَنَنِدِه تَبَهِ تَا نِیْجِرِ پَكَشِ خَوَکِه نَهَی  
بَرَنِ اَنْجَی سَتَّانِ هَتِه آَنِه ।

تو بِ عَقْلِ خَوِیش در کَبَرِ شَدِیدِ ما فَدَائِ آَنَکَه او عَقْلِ آَفرِید  
سَیَّارِ بُونِدِیِرِ نَامِه تُومِی بَهْلَوَه اَهْنَکَارِه نِیْپَتِیَّتِ هَوَهِه اَهَوَهِه آَرِ آَمَرَوَه اَتِی  
جَنَّی نِیْبَدِیَّتِ، يَنِی بُونِدِیِرِ سَرَّشِ ।

در قِیَاسَتِ تَهِی جَانت اِسِرِ جَانِ ما قُرْبَانِ عَلَم آَل بَصِیر  
تَوَمَارِ هَدَیَّ اَرْثَهِنِ اَنْنُومَانِنِ دَاسَتِرِه هَاتِه بَندَی اَرْثَه اَمَادَهِرِ هَدَیَّ  
سَے-ای پَرَم دُرْضَمَانِنِ جَنَّی نِیْبَدِیَّتِ ।

نیک دل بانیکواں دارد سرے بر گھر ٹف میزند بد گورے  
پُتھ ہدیہوں کا مانوں پُونجواندنے کا ساتھ سمسکر را خو، یہ نوں را ہدیہوں کا مانوں  
سے مانیمۇنگوی خُتۇ فەلە!

ہست بر اسرار اسرار ڈگر تا کجا تازد خېر فکر و نظر  
رہنسے کا وپر رہنسیا بولنی ہوئے آتھ، بُوندی و چیتا را گادھا آوار کاتدۇر یەتە  
پارە?

ایں چراغ مُردە از زور ھوا چۈپ رە باریک بُناید ترا  
لُوئى لِنگا را پُرابلە نیبۇ نیبۇ اهی پُنچاپ توماکە کیا بابے سُنکھ را ساتا  
دەخاتە پارە?

وھی یزدانی ز رە آگ کند تا بُنzel نور را ھەر کند  
خُودا را وھی پُتھ سمسکر کا ابھیت کرے آوار گاتبے پُئچا پُرھن اپالاکە  
سنجی کرے دئە!

ماقناہ بے ھەر در جسم و جاں حمق باشد دم زنی با آل یگان  
آمازدەر دەھ و آتھا یار کوئ دکھنے کا نەھ سەھنے کا نەھ سەھنے  
آوڈانو چارم نیری دیتا!

چیست دین خود را فنا اگاشتن و از سر ھست قدم برواشتن  
دھرم کی؟ نیجے کے بیلۇشى جان کرائے ایک نیجے را آمیر ساتھ سمسۇرۇندا بابے  
سمسکر چىڑھ کرائے!

چۈپ بیفتى با دو صد درد و نفیر کس ھمی خیزد کە گردد دست گیر  
پادھ گیئے ياخن تۇمی ساھا یەر جنی بىخوا و بەدنالا برا آارتلەن دکر تاخن  
توما را ھات دھارا را جنی سردىا کەنڈ دۇغا یارما ن ھەي!

باخجر را دل تپ بے خبر رحم بر کورے کند اھل بصر  
بیکن بىخىزىر ھدیہ اجھەر جنی ھٹھکت کرے آوار دۇشىما ن دۇشىھىنەر پەتى  
کارنغا پُرھن کرائے

ہنچنیں قانون تدرت او فتاد مر ضعیفان را قوى آرد بیا د

প্রকৃতির নিয়ম এভাবেই চলে আসছে যে শক্তিশালী দুর্বলের প্রতি দৃষ্টি রাখে  
জ্বোল এর কানুন শুধু রাজা ব্রহ্ম যিদাই বায়ি ফ্রোল  
রহমান খোদা এই আইনের কানাবে থাকতে পারেন? কেননা খোদার  
দয়া সবার দয়া ও করণা হতে বেশি হওয়া উচিত।

আন্ধে ও হের বাবে মা বৃদ্ধি প্রতি রাফু নেওয়া উচিত এস্ত  
সেই খোদা, যিনি আমাদের সকল বোৰা নিজের কাঁধে বহন করছেন আর  
কোন করণার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য ঘাটতি বা অভাব রাখেন নি;

জ্বোল জ্বোল শুধু এম দিন শৰ্মত আই এজ চৈস একার কীন  
ধর্মীয় বিষয়ে কানাবে তিনি আমাদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতে পারেন?  
এমন অস্বীকার ও বিশ্বের জন্য তোমার লজিত হওয়া উচিত।

গল মিনে দের খাল্কদান বে বে বে বে বে বে বে  
এই বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীকে ভালোবেসো না, খোদার বিশ্বস্ততার কথাগুলোকে  
কোন সময় স্মরণ কর।

বারাশদ ব্রত তাবত কাই উচুল ব্রত তাবত দের স্বে বে বে বে  
তোমার সামনে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল বুদ্ধি ভুলভাস্তিতেই  
নিপত্তি থাকে।

বারা দিয়ি বুক্ত খুড ফসাদ বারা জীব উচ্চল মাদী বে মুরাদ  
তুমি স্বীয় বুদ্ধির ভুলভাস্তি বারবার দেখেছ আর এই বুদ্ধির কারণে তুমি বারবার  
ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছ।

বা জ ন্যূনত মিকনি ব্রুচল খুবিশ ও এজ দিয়ি মিরো নাদিয়ে পিশ  
তাসত্ত্বেও তুমি স্বীয় বুদ্ধি নিয়ে অহংকার কর আর সম্মুখে কী আছে তা না  
দেখে বীরত্বের সাথে এগিয়ে যাচ্ছ।

ফস খুড রাপাক কন এজ হে ফসুল তুক খুড কুন তাকন্দ রহত ন্যূন  
সকল বৃথা কার্যকলাপ হতে নিজেকে পবিত্র করে নিঃস্বার্থ হয়ে যাও যেন  
খোদার করণা বর্ষিত হতে পারে।

لیک تر ک نفس کے آسائ بود مردن و از خود شدن یکساں بود  
کিন্তु پ্ৰতিৰ বশ্যতা পরিহার কৰা কি সহজ কাজ? মৃত্যু বৱণ কৰা ও  
প্ৰতিকে হত্যা কৰা সমান কাজ।

ایں چنیں دل کم بود در سینه کاں بود پاک از غرور و کینہ  
এমন বক্ষ বিৱলই দেখবে, যাতে এমন হৃদয় থাকবে যা অহংকার ও  
বিদ্বেষমুক্ত হয়ে থাকে।

درحقیقت مردم معنی کم اند گو همه از روئے صورت مردم اند  
সত্য কথা হলো, অর্থবহ মানুষ কমই হয়ে থাকে যদিও বাহ্যিক চেহারার দিক  
থেকে সকলেই মানুষ।

ہوش کن اے در چېءے افتاده عقل و دیں از دستِ خود در داده  
হে سেই مানুষ! যারা বিবেক ও ধৰ্মকে জেনেশুনে বিসৰ্জন দিয়ে কৃপের গভীরে  
পড়ে আছ! বিবেক খাটোও।

غیر محدودی بِ محدودی بُو کارِ نورِ مُحسن از دودی بُو  
অসীম খোদাকে সীম বোধবুদ্ধির মাধ্যমে সন্ধান করো না আৱ আলোৱ কাজ  
ধূম্রে মাধ্যমে সাধনেৰ চেষ্টা করো না।

آنچه باید جست باجزر و نیاز تو مجبو با کبر و خود بینی و ناز  
যে বিষয়টি বিনয় ও মিনতিৰ সাথে সন্ধান কৰা উচিত তুমি তাকে অহংকার,  
আতঙ্গাঘা ও অহমিকার ভিত্তিতে সন্ধান করো না।

ওه چে خوب ست ایں اصول رہروی یادگارِ مولوی در  
বাহ্বা! আধ্যাত্মিক সফরেৰ এই পথ কত অভিনব! যা মসনভীতে মৌলভীৰ  
(রূমী'র) স্মৃতিচিহ্নে উল্লেখ রয়েছে।

زیرکی ضد ٹکست ست و نیاز زیرکی گذار و باگولی باز  
অতিবুদ্ধি বিনয় ও ন্মতার বিপরীত অৰ্থ রাখে, তুমি অতিবুদ্ধি পরিহার কৰ  
আৱ বিনয়ী হও

زانکه طفل خورد را مادر نهار دست و پا باشد نهاده در کنار  
ছোট বাচ্চাকে যেভাবে মা সারা দিন কোলে-কাখে নিয়ে ঘুৰে বেড়ায়।

**দ্বিতীয় সন্দেহ:** যদি একথা মেনেও নিই যে, তত্ত্বজ্ঞানের সম্পূর্ণতার জন্য এমন একটি এলহামের প্রয়োজন রয়েছে যা হবে উৎকর্ষ ও অনন্য, তবুও খোদা অবধারিতভাবে সেই এলহাম নায়িল করে থাকবেন- তা আবশ্যক নয়। কেননা এ পৃথিবীতেও মানুষের বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে, তথাপি খোদা তার সেসব চাহিদা পূরণ করেন নি। মানুষের যেমন বাসনা হলো ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে’, দারিদ্র্য ও অসুস্থতা যেন কখনো আমাকে স্পর্শ না করে; কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একদিন সে ইহধাম ত্যাগ করে আর দারিদ্র্য এবং রোগ-বালাইও উপর্যুপরি দেখা দিয়ে থাকে।

**উত্তর:** যেহেতু সেই সম্পূর্ণ ও অনন্য এলহাম আর্থৎ পবিত্র কুরআন বিদ্যমান, যার আমরা মুখাপেক্ষি, যার শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্যতার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারে নি; সেখানে উপস্থিতকে অনুপস্থিত মনে করা এবং এর প্রয়োজনকে কাল্পনিক আখ্যা দেয়া তাদের কাজ, যাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। হ্যাঁ, পবিত্র কুরআনের অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব প্রমাণ আমরা এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছি, যদি সাধ্যে কুলায় তা খণ্ডন করে দেখাও, নতুবা নির্বাক হয়েও বাগাড়ম্বর করতে থাকা শালীনতা ও লজ্জা-শরমের মাথা খাওয়ার লক্ষণ বৈ কি? যেখানে এমন অনুপম ও অনন্য এলহাম এসে গেছে, যা অনন্যতার দাবি করে নিজেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, প্রথমে এর অনন্যতাকে খণ্ডন করে তবেই কেউ এলহামের বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে; সেখানে এর কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর না দিয়ে এলহামের প্রয়োজনীয়তাকে কাল্পনিক আখ্যা দেয়া কী ঝীমানদারী, নাকি হঠকারিতা? ইহজাগতিক মাপকাঠিতে পরকালকে পরিমাপ করা অনেক বড় ভাস্তি। ইহজগতকে আল্লাহ তা’লা স্থায়ী সুখ বা দুঃখের জন্য সৃষ্টি করেন নি, বরং একদিন দুঃখ ও সুখ দুটোই অবসান ঘটবে এবং উভয় চক্র একদিন থেমে যাবে। পক্ষান্তরে, পারলৌকিক নিবাস সেই জগৎ, যা চিরস্থায়ী সুখ বা দীর্ঘকালীন শাস্তির জায়গা, যার জন্য প্রত্যেক দূরদর্শী নিজে কষ্ট স্বীকার করে এবং অশুভ পরিণতির ভয়ে সকল কষ্ট শিরোধার্য করে খোদার আনুগত্য করে এবং ভোগবিলাস পরিহার করে কাঠিন্য ও ক্লেশকে বরণ করে। এখন আপনি নিজেই বলুন, চিরস্থায়ী সেই জগতের সাথে ক্ষণভঙ্গুর জগতের তুলনা করা কি দৃষ্টিভ্রম নয়?

**তৃতীয় সন্দেহ:** নিছক বুদ্ধিবলে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান এবং পূর্ণবিশ্বাস অর্জিত না হলেও অস্তত কিছুটা হলেও লাভ হয় আর মুক্তির জন্য সোচ্চাই যথেষ্ট!

**উত্তর:** এটি সম্পূর্ণরূপে বিদেশপ্রসূত এক কুমন্ত্রণ। আমরা পূর্বেও লিপিবদ্ধ করেছি যে, নিঃসংশয় ও দ্বিধাদৰ্শমুক্ত শুভ পরিণাম নির্ভর করে উৎকৃষ্টতম বিশ্বাসের ওপর আর সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্বাস খোদার অনন্য গুরু ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে, অস্তিমুক্ত থাকাও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয় আর পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানও উৎকৃষ্ট এলহাম ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। অতএব, নিছক মোটাবুদ্ধি কী করে মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে? বিশেষ করে, খোদাকে চেনার সেই রীতি, যা ব্রাহ্মসমাজীদের অভিনব বোধবুদ্ধি এবং কতিপয় ইউরোপিয়ান দার্শনিকের অনুকরণে বরণ করে নিয়েছে, তা এতটাই বাজে ও অনিশ্চয়তার কারণ যে, এর মাধ্যমে কোন প্রকার তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের আশা তো দূরে থাক, বরং এটি নিজেই মানুষকে নানা প্রকার সন্দেহে নিপত্তি করে। কেননা তারা খোদা তাঁলাকে এমন একটি নিষ্পাণ পুতুল হিসেবে ধরে নিয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁর সকল সম্মান ও পবিত্রতা ধূলোয় মিশে যায়। তাদের একটি প্রসিদ্ধ বচন হলো, খোদার অস্তিত্বের জ্ঞান খোদার পক্ষ থেকে লাভ হয় নি, বরং এটি একটি কাকতালীয় বিষয়, যা বুদ্ধিজীবিদের চেষ্টার ফলে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি তারা এভাবে বর্ণনা করে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আদমসন্তান ছিল সম্পূর্ণরূপে বিবেকবুদ্ধিহীন ও বন্য-পশুর ন্যায়; নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে খোদা কাউকে অবহিত করেন নি। এরপর কালের প্রবাহে মানুষের নিজেরই মনে পড়লো যে, কোন উপাস্য নিয়ুক্ত করে নিই। প্রথমদিকে চতুর্পার্শের বস্ত্রনিচয়, যেমন- পাহাড়, বৃক্ষ, নদী, ইত্যাদিকে নিজের খোদা বানিয়েছে। কিছুটা উন্নতির পর বায়ু, ঝাড়বাঘঘা, ইত্যাদিকে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে। এভাবে আরও এগিয়ে গিয়ে, সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রাজিকে প্রভু-প্রতিপালক জ্ঞান করে বসেছে; এভাবে ধীরে ধীরে চিন্তাভাবনা উৎকর্ষতায় পৌঁছুলে প্রকৃত খোদার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এখন একটু ভেবে দেখুন! এই ব্যাখ্যার ফলে খোদার সত্যিকার সত্ত্ব সম্পর্কে কত ঘোরতর সন্দেহ জন্মে আর তাঁর চিরঙ্গীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী-স্থায়ীত্বদাতা এবং সুপরিকল্পনাকারী হওয়া সম্পর্কে কতইনা কু-ধারণার উদ্বেক হয় যে, নাউয়বিল্লাহ, খোদা স্বয়ং আপন সত্ত্বার কোন সংবাদ দেন নি, (যেমনটি কিনা অদ্ব্যের সম্পর্কে জ্ঞাত এক সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত)।

বরং এর পুরো পরিকল্পনাটাই মানবীয়। এভাবে হঠাতে করে তার হৃদয়ে এ ঔৎসুক্য জাগে যে, কোন খোদা নিয়ুক্ত করে নিই। তাই সে কখনও পানিকে

খোদা বানিয়েছে, কখনও বৃক্ষকে, আবার কখনও পাথরকে, আর শেষে আপন হাদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নেয় যে, এ জিনিসগুলো খোদা নয়, খোদা অন্য কেউ হবে, যে আমাদের দৃষ্টির অস্তরালে। এই বিশ্বাস কি মানুষকে এ সন্দেহে নিপত্তি করবে না যে, সত্যিকার অর্থে এই কাণ্ডালিক খোদার অস্তিত্ব বলতে যদি কিছু থাকতো, তাহলে কোন না কোন সময় তো উপস্থিত ও জীবিতদের ন্যায় স্বীয় অস্তিত্বের সংবাদ দিত? বিশেষ করে, এ ধারণার বশবর্তী মানুষ যখন বুবাতে পারবে যে, খোদা তাঁলাকে অসম্পূর্ণ, দুর্বল ও বোবা ধারণা করা সমীচীন মনে হয় না, বরং যেভাবে তার দেখা, শোনা ও জানা ইত্যাদি পরম গুণাবলী থাকা আবশ্যক, একইভাবে তার মাঝে কথোপকথনের শক্তি থাকা আবশ্যক বলে মনে হয়। তখন সে এই ভেবে অবাক হবে যে, যদি তাঁর মাঝে কথোপকথনের শক্তি ও থেকে থাকে, তাহলে এর প্রমাণ কোথায়? যদি না থাকে, তাহলে সে কী করে সম্পূর্ণ হলো? আর যদি সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে সে খোদা হওয়ার যোগ্য কীভাবে হতে পারে? যদি তার বোবা হওয়া বৈধ হয়, তাহলে বধির বা অন্ধ হওয়া কেন বৈধ হবে না? অতএব, ইলহামে বিশ্বাস স্থাপন করেই কেবল এ সকল সন্দেহ হতে সে মুক্তি লাভ করবে। নতুনা যেভাবে সহস্র সহস্র দার্শনিক নাস্তিকতার গহ্বরে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, অনুরূপভাবে সেও সেই গহ্বরে পড়ে মরবে। সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এখন নিজেই বিচার করুক যে, এ বিশ্বাস খোদাকে অস্বীকার করানোর কারণ নয় কি? যুক্তিবাদীদের জন্য না হলে খোদাই হারিয়ে যেতো— যার দৃষ্টিতে খোদা এতই দুর্বল, তার স্টমানের কোন বিশ্বাস আছে কি? নির্বোধরা জানে না যে, খোদা স্বীয় সব গুণাবলীর সুবাদে বান্দাদেরকে প্রতিপালন করেন, কেবল কতিপয় গুণাবলীর মাধ্যমে নয়।

তাই, এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তাঁর শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বান্দাদের কাজে আসবে না? এটি বলার চেয়ে বড় কুফরী আর কী হতে পারে যে, তিনি পুরো ‘রাবুল আলামীন’ (বিশ্বপ্রতিপালক- অনুবাদক) নন, বরং অর্ধেক বা এক-ত্রুটীয়াৎশ?

**চতুর্থ সন্দেহ:** তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতা যদি এলহামী গ্রন্থের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে সরাসরি তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গে পৌছা ও ঐশ্বী কল্যাণরাজি লাভের জন্য সকল আদমসন্তানের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে এলহাম হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল! কেননা এলহাম প্রাপ্তি যদি বৈধ

বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেক মানুষের এলহাম লাভ করা বৈধ, আর যদি বৈধ না হয়, তাহলে কোন মানুষেরই এলহাম লাভ করা বৈধ নয়!

**উত্তর:** এলহাম লাভের জন্য সামর্থ্য ও যোগ্যতা হলো শর্ত। এমন নয় যে, যদু-মধু সকলেই খোদা তাঁলার পয়গম্বর হয়ে যাবে এবং সবার প্রতিই ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়ে যাবে! এদিকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাঁলা নিজেই ইঙ্গিত করেছেন, আর তাহলো-

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَيَّهُ قَالُوا كُنْ تُؤْمِنَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ مَّا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ  
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

(সূরা আল আনাম: ১২৫)

অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা প্রকাশের জন্য যখন কাফিরদেরকে কোন নির্দশন দেখানো হয়, তখন তারা বলে, যতক্ষণ স্বয়ং আমাদের প্রতি ঐশীগ্রাহ অবতীর্ণ না হবে, ততক্ষণ আমরা আদৌ ঈমান আনব না। কোথায় আর কোন্ জায়গায় রসূল নিযুক্ত করবেন, খোদা তা খুব ভালোভাবে জানেন। অর্থাৎ যোগ্য-অযোগ্য কে, তা তিনি চেনেন, আর যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি এলহামের কল্যাণধারা অবতীর্ণ করেন।

এই সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তারিত বিবরণ হলো, নিরক্ষুশ প্রজ্ঞা, অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে মানব সন্তাকে খোদা তাঁলা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন আর সকল আদম সন্তানের প্রকৃতি এমন একটি রেখার সাথে সামঝস্যপূর্ণ করে বানিয়েছেন, যার একটি দিক পরম উচ্চতায় অবস্থিত আর অপর প্রান্ত অবস্থিত খুবই নিম্ন পর্যায়ে। উঁচু প্রান্তে, সেসব পবিত্র আত্মার মানুষ রয়েছেন, যাদের সামর্থ্য ও শক্তিবৃত্তি তাঁদের স্বতন্ত্র পদমর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে পরম মার্গের। আর নিচের দিকে যেসব লোক রয়েছে, তারা এমন অধঃপতিত স্থান পেয়েছে যে, প্রায় কাঞ্জানহীন পঞ্চর স্তরে নেমে গেছে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে সেসব লোক রয়েছে, যারা বিবেকবুদ্ধির ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণির। এর প্রমাণস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও শক্তিবৃত্তির অধিকারী মানুষের দৃষ্টিক্ষেত্রে দেখাই যথেষ্ট। কেননা কোন বিবেকবান একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, মানুষ তার বিবেকবুদ্ধি, তাকওয়া ও খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে খোদাপ্রেমের ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদায় রয়েছে। প্রকৃতির নিয়মের অধীনে যেভাবে কেউ সুন্দর আর কেউ কৃৎসিত, কেউ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন আর কেউ অন্ধ, কেউ দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন আর

কেউ প্রথর, কেউ দুর্বল দৈহিক গঠন আর কেউ নিখুঁত দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, অনুরূপভাবে মানসিক শক্তিবৃত্তি এবং অন্তরের জ্যোতির ক্ষেত্রে মর্যাদাগত তারতম্য পরীক্ষিত ও জানা একটি বিষয়। অবশ্য এটি সত্য কথা যে, কেউ যদি উন্নাদ এবং কাঞ্জানশূন্য না হয়ে থাকে, তাহলে বুদ্ধি, তাকওয়া ও খোদাপ্রেমের ক্ষেত্রে সে উন্নতি করতে পারে। কিন্তু এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন ব্যক্তি তার যোগ্যতার পরিধি বা গণ্ডির বাইরে উন্নতি করতে পারে না। প্রকৃতিগতভাবে মানসিক শক্তিবৃত্তিতে যে একেবারেই দুর্বল, যেমন এমন একজন অপূর্ণাঙ্গ মানুষ রয়েছে, যাকে আমাদের দেশের সাধারণ লোক ‘দওলে শাহ’র ইঁদুর’ আখ্য দিয়ে থাকে, এমন লোকের শিক্ষাদীক্ষার যতই চেষ্টাই করা হোক না কেন আর যত বড় দার্শনিককেই তার শিক্ষক নিযুক্ত করা হোক না কেন— জানা কথা যে, সে সেই প্রকৃতিগত সীমার বাইরে উন্নতি করতে পারবে না, যা খোদা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। যোগ্যতার গণ্ডি সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে সে সেসব মহান মার্গে আদৌ পৌঁছুতে পারবে না, যে পর্যায়ে কেবল একজন ব্যাপক শক্তিবৃত্তির অধিকারী ব্যক্তি পৌঁছুতে পারে। এটি এমন এক স্পষ্ট বিষয় যে, আমি ভাবতেই পারি না, কোন বিবেকবান ব্যক্তি এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে আর এরপরও তা অস্থীকার করবে! অবশ্য যে ব্যক্তি বিবেকবুদ্ধির জোয়াল পুরোপুরি বিসর্জন দেয় সে যদি অস্থীকার করে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এটি জানা কথা যে, বিবেকবুদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে যদি তারতম্য না থাকতো, তাহলে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও আহরণে পার্থক্য থাকবে কেন? কিছু মানুষের মন্তিক অন্যদের চেয়ে বেশি উর্বর হয় কেন? অথচ যারা পেশাজীবি, শিক্ষাবিদ ও প্রশিক্ষক, তাঁরা এ বিষয়টি খুব ভালো বুঝেন যে, কোন কোন ছাত্র প্রকৃতিগতভাবে এমন মেধাবী হয়ে থাকে যে, আকারাইঙ্গিতেই কথা বুবাতে পারে। কতকের বিবেক এতটা জাহাত যে, নিজেদের ভেতর থেকেই তারা ভালো ভালো কথা উদ্ভাবন করে। আবার প্রকৃতিগতভাবে কিছু মানুষ এতটা মাথামোটা ও স্তুলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে যে, তুমি যতই মাথা খাটাও না কেন আর যত স্পষ্ট করেই কথা বুঝাও না কেন, তারা বুঝে না। আর কঠোর চেষ্টাসাধনার পর বুবালেও স্মরণশক্তি বলতে কিছুই নেই। পানির ছাপ যেভাবে মুছে যায়, সেভাবে স্বল্পতম সময়ে এরা কথা ভুলে যায়। একইভাবে চারিত্রিক শক্তি ও হৃদয়ের আলোর ক্ষেত্রেও একের সাথে অন্যের

ব্যাপক ব্যবধান দেখা যায়। একই পিতার দু'সন্তান, যারা একই শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের একজন সুস্থ প্রকৃতির অধিকারী ও সৎ প্রমাণিত হয়, আর অপরজন নোংরা এবং দুষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকে। কেউ ভীরু, কেউ সাহসী, কেউ আত্মাভিমানী আবার কেউ হয়ে থাকে আত্মসম্মানহীন। কোন সময় হিতোপদেশ দিলে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষও কিছুটা শোধের যায়। কোন কোন সময় ভীরুও সহজাত লোভের বশবর্তী হয়ে কিছুটা সাহসিকতা প্রদর্শন করে, যা দেখে স্বল্প-অভিজ্ঞ মানুষ ভুলে মনে করে যে, এরা নিজেদের মূল স্বভাব পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আমরা বারংবার স্মরণ করাচ্ছ যে, কোন ব্যক্তি নিজের যোগ্যতার গাঁওয়ের বাইরে পা রাখে না। কিছুটা উন্নতি করলেও সেই গাঁওয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে করে, যা তার প্রকৃতিগত শক্তির গাঁও। স্বল্পবুদ্ধির অনেক মানুষ এই প্রতারণার শিকার হয়েছে যে, প্রকৃতিগত শক্তিবৃত্তি যথাযথ অনুশীলনের কল্যাণে জন্মগত সীমা-পরিসীমা ও সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর চেয়েও বেশি অর্থহীন এবং কাণ্ডজানহীন হলো খ্রিষ্টানদের এই কথা যে, কেবল মসীহকে খোদা মানলেই মানুষের প্রকৃতি বদলে যায়। অভ্যাসগত দিক থেকে কোন মানুষ যতই পাশবিক উন্নাদনা বা রিপুর তাড়নার বশীভূত হোক বা বুদ্ধিশক্তির ক্ষেত্রে যতই দুর্বল হোক না কেন, হ্যরত ঈসাকে খোদার একমাত্র পুত্র বললেই সে তার সৃষ্টিগত দুর্বলতা হতে মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এমন ধ্যানধারণা সেসব লোকের হাদয়ে দানা বাঁধে, যারা পদার্থ বা ভৌত বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে কখনও চিন্তা করে নি, বা যাদের চোখ কঠিন বিদ্রে ও সৃষ্টিপূজার গভীর মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। নতুবা মানুষের প্রকৃতিগত ভিন্নতা এমন সুবিদিত ও সপ্রমাণিত এক বিষয় যে, জ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আর ত্রুট্যাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কল্যাণে তাদের সামনে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাহসী বা ভীরু, কৃপণ বা দানশীল, দুর্বলবুদ্ধি বা প্রথরবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া, দুর্বল মনোবল বা দৃঢ়-মনোবলের অধিকারী হওয়া, ধৈর্যশীল বা অসহনশীল হওয়া, রংঘং চিন্তাধারার অধিকারী বা সুস্থ চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন হওয়াটা এমন কোন ব্যাধি নয়, যা দৈবক্রমে দেখা দিতে পারে বা যা ভাসা-ভাসা কোন বিষয়। বরং আদি স্বৃষ্টা আদিম সন্তানের গঠনগত রাসায়নিক উপাদান ও এর অনুপাত আর তাদের বক্ষ, হৃদয় ও মস্তিষ্কের খুলির গঠনে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য রেখেছেন। এসব পার্থক্যের কারণেই মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিগত শক্তিবৃত্তির মাঝে সুস্পষ্ট

পার্থক্য চোখে পড়ে। সুপ্রাচীন এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ডাঙ্কারগণও স্বীকার করেছেন। তাঁদের কথা হলো, চোর ডাকাতদের মাথার খুলি গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করার পর দেখা গেছে যে, সেগুলোর গঠন ও বিন্যাস এমন, যা কেবল এই রংশু চিন্তাধারার অধিকারী শ্রেণিরই বৈশিষ্ট্য। কিছু ইউনানী এর চেয়েও বড় কথা লিখেছেন। কেউ কেউ ঘাড়, চোখ, কপাল, নাক এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে অভ্যন্তরীণ অবস্থার ধারণা দিয়ে থাকে। যাহোক, এটি প্রমাণিত আর না মেনে কোন উপায় নেই যে, আদম সন্তানদের দৈহিক গঠন ও বুদ্ধি-বিবেকগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ভিন্নতা রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি কিছুটা উন্নতির পানে অগ্রসর হলেও স্বীয় যোগ্যতা বা সামর্থের গতির উর্ধ্বে যেতে পারে না।

কারো হন্দয়ে হয়ত এ সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে যে, একত্ত্বাদের বিশ্বাসকে খোদা তাঁলা সকল মানুষের প্রকৃতিগত বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করেছেন আর বলেছেন, **فَطَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لِذِكْرِي** (সূরা আর রুম: ৩১) অর্থাৎ একত্ত্বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানব-প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার ওপর মানব জন্মের ভিত্তি, তিনি আরও বলেছেন **أَسْتُرْ بِكُمْ قَلْوَابِي** (সূরা আল আ'রাফ: ১৭৩) অর্থাৎ সকল আত্মা খোদা তাঁলা যে তার রক্ষণ বা প্রতিপ্রালক, তা স্বীকার করেছে, কেউ অস্বীকার করে নি। এটিও স্বভাবজ স্বীকারোক্তির প্রতি ইঙ্গিত।

তিনি আরও বলেন, **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا يَعْبُدُونِي** (সূরা আয় যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ- জিন্ন ও মানবকে আমি কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। এতেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খোদার ইবাদত একটি প্রকৃতিগত বিষয়। অতএব, একত্ত্বাদ ও খোদার ইবাদত যেখানে সব মানব সন্তানের প্রকৃতিগত বিষয় প্রমাণিত হলো আর কোন মানুষকে বিদ্রোহ ও ঈমানহীনতার জন্য সৃষ্টি করা হয় নি; তাই যেসব বিষয় খোদাকে চেনা ও খোদাভৌতির পরিপন্থী, তা কীভাবে স্বভাবজ বা প্রকৃতিগত বিষয় হতে পারে?

এই সন্দেহ কেবল এক সত্যকে ভুল বুঝার ফলশ্রুতি। কেননা উন্নিখিত আয়াত হতে যা প্রমাণিত, তা কেবল এতটুকুই যে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মাঝে আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে আসা ও একত্ত্বাদকে স্বীকার করার বীজ বপন করা হয়েছে। এই বীজ সকল ব্যক্তির প্রকৃতিতে সমান, এ কথা উন্নিখিত আয়াতে কোথায় লেখা আছে? বরং পরিত্ব কুরআনে বারংবার এ কথার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, এই বীজ আদম সন্তানদের মাঝে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন; কারও মাঝে অত্যন্ত, কারও ভেতর

মাঝামাঝি আর কারো ভেতর অনেক বেশি। যেমন আল্লাহ তা'লা এক স্থানে বলেন, ﴿فِيْهِمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْرَبُصٌ وَمِنْهُمْ سَايِّئٌ بِالْخِيْرٍ﴾ (সূরা ফাতের: ৩৩) অর্থাৎ আদম সন্তানদের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তাদের কতক অত্যাচারী, যাদের প্রকৃতিগত আলোকে তাদের পশ্চালভ স্বভাব বা ক্রোধের বৃত্তি চাপা দিয়ে রেখেছে। কিছু রয়েছে মধ্যবর্তী অবস্থায় আর কতক পুণ্য এবং ফিরেফিরে, বারেবারে খোদার দিকে আসার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে, কারও কারও সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, ﴿مُّهْبِّبِّجَّا وَ مُّهْبِّبِّجَّا﴾ (সূরা আল আনআম: ৮৮) আমরা তাদেরকে মনোনীত করেছি। অর্থাৎ তাঁরা তাদের প্রকৃতিগত শক্তির ক্ষেত্রে অন্য সবার মাঝে বিশিষ্ট্য ও মনোনীত ছিলেন; তাই রিসালত বা নবুয়ত প্রাণ্মুক্তির যোগ্য হয়েছেন। অপর কিছু লোক সম্পর্কে বলেছেন, ﴿مَنْ تَعْلَمُ كَمْ أَلْتَكَ عَلَيْهِ﴾ (সূরা আল আ'রাফ: ১৮০)। অর্থাৎ- তারা চতুর্স্পন্দ জন্মের মত আর তাদের প্রকৃতিগত আলো এত ক্ষীণ যে, পশ্চের সাথে তাদের পার্থক্য অতি সামান্য। তাই প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, যদিও খোদা একথাও বলেছেন যে, একত্রবাদের বীজ সব আত্মাতেই বিদ্যমান, কিন্তু একই সাথে বেশ করেক স্থানে একথাও পরিষ্কার করে বলেছেন যে, সে বীজ সবার মাঝে সমান নয়, বরং কতকের প্রকৃতির ওপর তাদের কামনাবাসনা এতটা ছেয়ে গেছে যে, তাদের ভেতরকার সে জ্যোতি বিলুপ্তগ্রায়। সুতরাং পাশবিক বা ক্রোধসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য স্বভাবজ হওয়া একত্রবাদের প্রকৃতিগত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

কোন মানুষ যতই কামনাবাসনার পূজারি এবং কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হোক না কেন, তার মাঝে প্রকৃতিগত জ্যোতি কিছুটা হলেও দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে ব্যক্তি কামনাবাসনার তাড়না বা ক্রোধের অতিশয়ে চুরি করে বা হত্যা করে বা ব্যাভিচারে লিঙ্গ হয়, তার এ কাজ স্বভাবজ হলেও সৎকর্মের যে জ্যোতি তার স্বভাবের অংশ হয়ে আছে, অবৈধ কাজের সময় তা তাকে অবশ্যই অভিযুক্ত করে। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'লা বলেছেন, ﴿فَإِنْ هُنَّ هُنْ فَجُورٌ وَّ نَقْوَى﴾ (সূরা আশ্ শামস: ৯) অর্থাৎ- প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তা'লা এক প্রকার এলহাম করেছেন, যাকে হৃদয়ের জ্যোতি বলা হয় আর তা হলো, ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য নিরপেক্ষ শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোন চোর বা খুনী চুরি বা হত্যা করে, খোদা তখনই তার হৃদয়ে এ কথা সঞ্চার করেন যে, তুমি এটি মন্দ কাজ করেছ, ভাল কর নি। কিন্তু সে এমন ইলকা বা ঐশী প্রেরণার প্রতি আদৌ

ভ্রক্ষেপ করে না। কেননা তার হৃদয়ের জ্যোতি অত্যন্ত ক্ষীণ, বিবেকবুদ্ধি দুর্বল, পাশবিক-শক্তি প্রবল আর অবাধ্য প্রবৃত্তি স্বীয় চাহিদা প্রকাশে সবল। সুতরাং এমন প্রকৃতি বা স্বভাবও পৃথিবীতে বিদ্যমান, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় যার বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের প্রবৃত্তির স্বভাবজ উপন্দব ও উভেজনা প্রশংসিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা যা খোদা রোপন করেছেন, তা কে উৎপাটন করতে পারে? অবশ্য খোদা এর যে একটি প্রতিকারও রেখেছেন- তা কী? তা হলো, তওবা, ইঙ্গেগফার ও অনুশোচনা। অর্থাৎ তাদের প্রকৃতির দাবি অনুসারে যখন অপকর্ম হয়ে যায় বা প্রকৃতিগত বিশেষত্ব অনুসারে কোন নোংরা ধারণা হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখন তারা যদি তওবা ও ইঙ্গেগফারের মাধ্যমে এর সুরাহার চেষ্টা করে, তাহলে খোদা এই পাপ ক্ষমা করে দেন। পুনঃপুন হোঁচট খেয়ে বারংবার যদি তারা অনুশোচনা ও তওবা করে, তাহলে সেই অনুশোচনা ও তওবা কল্পকে বিরোত করে। এটিই প্রকৃত প্রায়শিত, যা সেই স্বভাবজ পাপের চিকিৎসা। আল্লাহ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, *وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ بَطْلَمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَعْلَمُ أَجْيَابَهُ* (সূরা আন্ন নিসাঃ: ১১১)। অর্থাৎ যার দ্বারা কোন অপকর্ম সাধিত হয় বা নিজ প্রাণের ওপর কেউ যখন কোন প্রকার অবিচার করে আর এরপর অনুশোচনার সাথে খোদার কাছে ক্ষমা চায়, সে খোদাকে অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পাবে। সূক্ষ্ম-সুন্দর ও প্রজ্ঞপূর্ণ এই বাকেয়ের অর্থ হলো, যেভাবে স্থলন ও পাপ করা দুর্বল প্রকৃতির বিশেষত্ব, যা তাদের দ্বারা হয়েই যায়, সেখানে এর বিপরীতে রয়েছে খোদার অনাদি ও অনন্ত ক্ষমা ও দয়ার বৈশিষ্ট্য। নিজ সত্ত্বায় তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ তাঁর ক্ষমা ভাসাভাসা ও কাকতালীয় কোন বিষয় নয়, বরং তা তাঁর আদি সত্ত্বার চিরস্তন বৈশিষ্ট্য, যা তাঁর কাছে অতীব প্রিয় ও পছন্দনীয়। যোগ্য ব্যক্তির ওপর এর বারিধারা বর্ষণে তিনি সততই উদ্ঘৰীব। অর্থাৎ স্থলন ও পাপে জর্জরিত হওয়ার সময় কোন মানুষ যদি অনুশোচনা ও তওবার সাথে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে খোদার দৃষ্টিতে সে তাঁর দয়া ও ক্ষমা লাভের যোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়ে যায় আর অনুশোচনাকারী ও তওবাকারী বান্দার প্রতি খোদার এই দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টি এক বা দু'বারের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি খোদার সত্ত্বার চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। কোন পাপী যতক্ষণ তওবার সাথে তাঁর পথপানে চেয়ে থাকবে, তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব অবশ্যই পুনঃপুন প্রকাশ পেতে থাকবে। সুতরাং প্রকৃতিতে খোদার নিয়ম এমনটি নয় যে, হোঁচট-প্রবণ স্বভাব হোঁচট খেতে পারবে না বা যারা পাশবিক শক্তি বা

ক্রোধের বশীভূত, তাদের স্বভাব পরিবর্তন না হলে চলবে না! বরং আদি থেকে তাঁর যে (ধরা-বাঁধা) নিয়ম চলে আসছে তাহলো, যারা ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে পাপ করে, তারা যেন তওবা ও ইস্তেগফার করে ক্ষমাও লাভ করতে পারে। কিন্তু কতক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল, সে সবল হতে পারে না। তার তেতুর জন্মগত বা সৃষ্টিগত পরিবর্তন আসা আবশ্যিক, যা স্পষ্টতই অসম্ভব। যেমন অভিজ্ঞতালক্ষ ও পরীক্ষিত বিষয় হলো, অভ্যাসগতভাবে যে রংগচটা, সে ধীরে ধীরে বা চিন্তাভাবনা করে রাগ করবে, এটি অসম্ভব। বরং সবসময় যা দেখা যায় তাহলো, এমন মানুষ রাগের সময় ক্রোধের লক্ষণ অবলীলায় প্রকাশ করে থাকে আর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, বা অকথ্য কথা বলে বসে আর ক্ষেত্রবিশেষে নামেমাত্র দৈর্ঘ্য ধরলেও অন্তরে অবশ্যই আগুন ও অস্ত্রিতা লেগেই থাকে। তাই এটি আহাম্মকের ধারণা যে, কোন যাদু-টোনা, ভেঙ্কিবাজি বা কোন বিশেষ পন্থাবলম্বন তার স্বভাব বদলে দেবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই নিষ্পাপ নবী, যার মুখ হতে প্রজার ফল্লুধারা নিঃসৃত হতো, (তিনি) বলেন, ‘খেয়ারঞ্জম ফিল জাহিলিয়াতে খেয়ারঞ্জম ফিল ইসলামে’ অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগে যারা ভালো মানুষ ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা ভালো ও ভদ্র। এক কথায়, মানব প্রকৃতি খনিজ মণি-মুক্তার ন্যায় ভিন্নভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোন কোন প্রকৃতি রূপার মত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হয়ে থাকে আর কতক গন্ধকের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, যা হঠাতে করেই অগ্নিশর্মা হয়ে যায় আর কতক পারদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল হয়ে থাকে, আবার কতক লোহার মত শক্ত ও অস্বচ্ছ। প্রকৃতিগত এই পার্থক্যটি প্রমাণের দিক থেকে যেখানে সুস্পষ্ট ও সুবিদিত, সেখানে তা ঐশ্বী ব্যবস্থার সাথেও সামঞ্জস্য রাখে; আর এটি নিয়ম বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। এটি এমন কোন বিষয় নয়, যা বিশ্ব ব্যবস্থায় বিরাজমান নিয়মের পরিপন্থী, বরং বিশ্বের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি এর ওপরই নির্ভরশীল। এটি জানা কথা যে, সকল প্রকৃতি যদি যোগ্যতার ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের হতো, তাহলে বিভিন্ন প্রকার কাজ (যা বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল) স্থগিত হয়ে যেতো, যার ওপর পৃথিবীর উন্নতি নির্ভরশীল। কেননা স্তুল বা অস্বচ্ছ কাজের জন্য স্তুল বা অস্বচ্ছ প্রকৃতি প্রয়োজন আর সূক্ষ্ম কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো সূক্ষ্ম স্বভাব। গৌক হেকীম বা চিকিৎসকরাও এ মতই প্রকাশ করেছেন যে, যেভাবে কোন কোন মানুষ অনেকটা পশ্চতুল্য হয়ে থাকে, একইভাবে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু

মানুষের এমনও হওয়া উচিত, যাদের প্রকৃতিগত যোগ্যতা হবে পরম পবিত্র ও বিশুদ্ধ। মানবপ্রকৃতি যেভাবে ক্রম-অধঃপতনের এক পর্যায়ে গিয়ে পশুর সারিতে উপনীত হয়, অনুরূপভাবে উন্নতির ক্ষেত্রেও তার এতটা ওপরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন উর্ধ্বলোকে গিয়ে পৌছুতে পারে।

এখন যেভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, নেতিক বৃত্তি ও হৃদয়ের জ্যোতির ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদা রাখে, তাই এ ভিন্নিতেই প্রমাণিত হলো যে, ঐশ্বী ওহীও কেবল কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই, অর্থাৎ এমন মানুষ থাকা চাই, যারা সব দৃষ্টিকোণ থেকে থাকবে পরমমার্গে উপনীত। কেননা সব বুদ্ধিমানের কাছে এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে ঐশ্বী জ্যোতি গ্রহণ করে, এর অধিক নয়।

একথা বোার জন্য সূর্য এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেননা সূর্য যদিও সর্বত্র স্বীয় আলোর ক্রিয় বিচ্ছুরিত করে চলেছে, কিন্তু এর আলো গ্রহণের ক্ষেত্রে সব ঘরবাড়ী সমান নয়। যে ঘরের দরজা বন্ধ, তাতে আলো প্রবেশ করতে পারে না। আর যে ঘরে সূর্যের মুখোমুখি একটি ছিদ্র বা ছেট জানালা থাকে, তাতে আলো পড়ে ঠিকই কিন্তু তা স্বল্প, যা অন্ধকারকে পুরোপুরি দূর করতে পারে না। কিন্তু যে ঘরের সূর্যমুখী সব দরজা খোলা আর প্রাচীরও কোন অস্বচ্ছ পদার্থে নির্মিত নয়, বরং অতি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল কাঁচের তৈরী, এর সৌন্দর্য কেবল এটিই নয় যে, তা পূর্ণ মাত্রায় আলো গ্রহণ করবে, বরং স্বীয় আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করবে এবং অন্যদের কাছেও পৌঁছাবে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি নবীদের স্বচ্ছ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, খোলা স্বীয় রিসালতের দায়িত্ব ন্যস্ত করার জন্য যেসব পবিত্র ব্যক্তিকে মনোনীত করেন, তারাও পর্দা অপস্তু হওয়া ও উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সেই শীষমহলের মত হয়ে থাকেন, যাতে কোন অস্বচ্ছতা বা কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই এটি স্পষ্ট যে, মানুষের ভিতর যাদের মাঝে সেই পূর্ণতা নেই, এমন মানুষ কোনভাবে আল্লাহর রসূলের মর্যাদা পেতে পারে না। বরং অনাদি ও অনন্ত বশ্টনকারী খোদার পক্ষ থেকে এই মর্যাদা তারা লাভ করেছে, যাদের পবিত্র প্রকৃতি অমানিশার পর্দা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আর যারা সম্পূর্ণরূপে জাগতিক অন্ধকাররাজির উর্ধ্বে, পবিত্রতা ও সকল ক্রুতি থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি যাদের এমন পর্যায়ে উণ্মীত, যার অধিক কিছু ধারণা করার কোন সুযোগই নেই। সেসব পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট প্রকৃতির মানবই পুরো সৃষ্টির পথের দিশারী। জীবন বা প্রাণের আশিসধারা যেভাবে হৃদয়ের মাধ্যমে সকল

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হয়, অনুরূপভাবে নিরক্ষুশ প্রজ্ঞা (খোদা) তাদের মাধ্যমেই হিন্দায়াতের কল্যাণধারা প্রবাহিত করেছেন। কেননা সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য, যা কল্যাণ বট্টনকারী ও গ্রহণকারীর মাঝে থাকা উচিত, তা কেবল তাদেরকেই দেয়া হয়েছে। এটি কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, খোদা তাঁলা, যিনি অনন্য এবং সব ক্রটিবিচ্যুতির উর্ধ্বে, স্বীয় পবিত্র জ্যোতির্মণিত ওহীর কল্যাণধারা এমন লোকদের ওপর বর্ষণ করবেন যাদের প্রকৃতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলুষিত, অধিকস্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ ও পক্ষিল এবং যাদের ইতর-প্রকৃতি হীন পক্ষিলতায় তমসাচ্ছন্ন ও কলুষিত। আমরা যদি আত্মপ্রতারণায় লিঙ্গ না হই, তাহলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আদি বা চিরস্থায়ী উৎসের সাথে পূর্ণ একাত্মা এবং সবচেয়ে পবিত্র সন্তার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভের জন্য এমন এক যোগ্যতা ও জ্যোতির্ময়তা লাভ করা হলো শর্ত, যা সেই মহান পদমর্যাদার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এমন মানুষ, যে চরম ক্রটিবিচ্যুতি, ক্ষয়-ক্ষতি, নীচতা, হীনতা ও কলুষতার মাঝে জীবন নষ্ট করছে আর শত শত অমানিশার পর্দায় আচ্ছন্ন, সে নিজের ঘৃণ্য প্রকৃতি ও হীন মনোবল সন্ত্রেও সেই মর্যাদা লাভ করতে পারবে— এটি আদৌ সম্ভব নয়। আহলে কিতাব খ্রিষ্টানদের এ ধারণায় কেউ যেন প্রতারিত না হয় যে, নবীগণ, যারা কিনা আল্লাহর ওহীর অবতরণস্থল, তারা পবিত্র নন, ক্রটিবিচ্যুতি মুক্ত নন, নিষ্পাপ নন এবং খোদার ভালোবাসার পরম মার্গও তাদের অর্জিত হয় নি। কেননা খ্রিষ্টানরা সত্যনীতি বিসর্জন দিয়েছে। হ্যরত দুসা যাতে কোনভাবে খোদা হয়ে যান আর প্রায়শিক্তিবাদের বিশ্বাস যেন দৃঢ়তা লাভ করে— এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সকল সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। অতএব, নবীদের নিষ্পাপ জীবন ও পবিত্রতা তাদের (খ্রিষ্টানদের) নির্মিতব্য অলীক ভবনকে যেহেতু ভূপাতিত করে, তাই এক মিথ্যার খাতিরে তাদেরকে আরেকটি মিথ্যাও গড়তে হয়েছে আর এক চোখ হারানোর কারণে দ্বিতীয় চোখেও ছিদ্র করতে হয়েছে। অতএব, উপায়ান্তর না দেখে মিথ্যার মোহে তারা সত্যকে বিসর্জন দিয়েছে, নবীদেরকে অবমাননা করা অব্যাহত রেখেছে, পবিত্রদেরকে অপবিত্র গণ্য করেছে আর ওহীর অবতরণস্থল সেসব হৃদয়কে তারা এ জন্যে অশ্বচ্ছ ও কলুষিত আখ্যা দিয়েছে যে, পাছে তাদের কৃত্রিম খোদার সম্মানের হানি না হয় বা প্রায়শিক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় কোথাও ফাটল দেখা না দেয়। এই স্বার্থপরতার আতিশয়ে তারা এটিও ভেবে দেখলো না যে, এতে কেবল নবীদের অসম্মানই হয় না, বরং খোদার পবিত্রতাও

প্রশ়্ণবাণে জর্জরিত হয়। কেননা (নাউবিল্লাহ) অপবিত্রদের সাথে যার সম্পর্ক, যোগাযোগ ও মেলামেশা ছিল, সে কীভাবে পবিত্র হতে পারে? সারকথা হলো, মিথ্যাপূজার ঘৃণ্য বেশাতি হিসেবে খ্রিষ্টানদের উক্তি সত্যকে লজ্জন করেছে আর এখন তারা অনর্থক সেই মিথ্যা বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দিতে চায়, যার ওপর তাদের সৃষ্টিপূজারি প্রবীণরা পদচারণা করেছে। সব সত্যও যদি এর ফলে বিকৃত হয় হোক আর সত্য ও সততার যতই বিরক্তাচরণ করতে হয়, কোন অসুবিধে নেই! কিন্তু সত্যাখ্যেরকে বুঝতে হবে যে, এমন মিথ্যাপূজারিদের কথায় প্রকৃত সত্যের কোন ক্ষতি নেই আর সত্য প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে যা অত্যন্ত স্পষ্ট, তা তাদের অপলাপে পরিবর্তিত হতে পারে না। বরং সত্যের পথ পরিহার করে মিথ্যা বলায় বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে তারাই লাঞ্ছিত হয় আর মর্যাদা হারিয়ে বসে। আল্লাহ তাঁ'লার ওহী লাভের জন্য পূর্ণ পবিত্রতার শর্ত এমন কোন বিষয় নয় যার সত্যতা প্রমাণের নিমিত্তে প্রদত্ত প্রমাণাদি দুর্বল হবে বা যা অনুধাবন করা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কঠিন হবে। বরং এটি সে বিষয়, যার সাক্ষ্য সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান, বিশ্বজগতের প্রতিটি অণুপরমাণু যার সত্যায়ন করে আর যার ওপর গোটা বিশ্বব্যবস্থা নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআনে একটি মহান উপমা দিয়ে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নে একটি সূক্ষ্ম-সুন্দর গবেষণাকর্মসহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে আর এই আলোচনার পূর্ণতার জন্য যা হলো আবশ্যক-

أَلَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَكْنُونٌ نُورٌ كَيْشُكُورٌ فِيهَا مُصْبَاحٌ أَلْيُصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ أَلْرُجَاجَةُ كَأَنَّهَا  
كَوْكِبٌ دُرْسِيٌّ يُوقِنُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبِرَّكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرَقَيَّةٌ وَلَا غَرَبَيَّةٌ يَكَادُ زَيْنَهَا يُبْلِغُهُ وَلَوْلَمْ  
تَمْسِسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي إِلَهُ الْيُورَهُ مَنْ يَشَاءُ طَوِيلٌ وَيَصْرِفُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ طَوِيلٌ  
شَيْءٌ عَلَيْهِمْ

(সূরা আন নূর: ৩৬)

খোদা আকাশ ও পৃথিবীর আলো, অর্থাৎ প্রত্যেক আলো, যা সকল উঁচু ও নিচুস্থানে পরিদৃষ্ট হয়, তা সে আত্মসমূহের মধ্যেই হোক বা দেহসমূহে, ব্যক্তিগত হোক আর অর্জিত, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, অঙ্গের জ্যোতি হোক বা বাইরের- সব তাঁরাই দান। এটি একথার ইঙ্গিত বহন করে যে, মহাসম্মানিত বিশ্ব প্রতিপালকের সার্বজনীন কল্যাণধারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কেউ তাঁর কল্যাণরাজির গভীরহিন্দুত নয়। তিনিই সব

কৃপাকল্যাণের প্রস্তবণস্তুল, সকল আলোর আদি উৎস এবং সকল দয়া ও করণার উৎসমুখ। তাঁর চিরসত্য সত্ত্বাই সমগ্র বিশ্বজগতের অবলম্বন এবং সকল তুচ্ছ ও উচ্চের আশ্রয়স্তুল। তিনি সব কিছুকে নাস্তির অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি ব্যতীত এমন কোন সত্ত্বা নেই, যে নিজের অধিকারবলে অস্তিত্বান এবং চিরস্তন বা তাঁর দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত নয়, বরং স্র্ব-মর্ত্য, মানুষ ও (অপরাপর) জীবজন্ম, পাথর ও বৃক্ষরাজি, আত্মা ও দেহাবয়ব, সবকিছু তাঁরই কৃপাগুণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ হলো সাধারণ কল্যাণরাজি, যার কথা আয়াত *اللَّهُ نُورٌ لِّلنَّاسِ وَالْأَنْضُرُ* এ প্রকাশ করা হয়েছে। এটিই হলো সেই কল্যাণরাজি, যা গোলকের ন্যায় সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যে কৃপা-কল্যাণ লাভের নিমিত্তে কোন বিশেষ যোগ্যতার শর্ত নেই। পক্ষান্তরে, একটি বিশেষ কৃপা ও কল্যাণধারা রয়েছে, যা শর্তসাপেক্ষ। সে সকল বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ওপর তা বর্ষিত হয়, যাদের মাঝে তা গ্রহণ করার ঘোগ্যতা ও সামর্থ্য রয়েছে, অর্থাৎ নবীদের উৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ সত্ত্বা, যাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মহান এবং সকল কল্যাণরাজির সমাহার হলেন হ্যরত মুহাম্মদ মুস্ফিফ (সা.), অন্যদের ওপর তা আদৌ অবর্তীণ হয় না। যেহেতু সেই কৃপাকল্যাণধারা অতি সূক্ষ্ম একটি সত্য, আর সুগভীর ও সূক্ষ্মপ্রজ্ঞাসমৃদ্ধ বিষয়াদির অস্তর্গত, তাই খোদা তাঁলা প্রথমে সাধারণ বা সার্বজনীন কৃপা-কল্যাণধারার (যা একেবারেই সুস্পষ্ট) উল্লেখ করে হ্যরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর জ্যোতির স্বরূপ প্রকাশের জন্য সেই বিশেষ কল্যাণধারার কথা একটি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যা আয়াত *مَثَلُ نُورٍ كَيْشَلُوْقَةٍ فِيْ كَعْصَلِّ*... এর মাধ্যমে আরও হয়। সেই সূক্ষ্ম ও নাজুক বিষয়টি যাতে উপলব্ধি করতে কোন অস্পষ্টতা বা সমস্যা রয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সাদৃশ্য বা উপমার সাহায্যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যুক্তিগোহৃত রূপক বিষয়াদি বাহ্যিক ও বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণনা করলে স্বল্পবুদ্ধির সকল মানুষ এবং মৃচ্চরাও অনায়াসেই বুঝতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতের অবশিষ্টাংশের অনুবাদ হলো: সেই আলোর উপর্যা হলো, (পূর্ণ মানবের মাঝে যিনি পয়গম্বর) যেন তা একটি তাক, [অর্থাৎ হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যোতির্মভিত্তি হন্দয়] যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ (অর্থাৎ ওহী বা ঐশ্বীবাণী)। সে প্রদীপটি সুরক্ষিত রয়েছে অত্যন্ত স্বচ্ছ একটি কাঁচের চিমনিতে। [অর্থাৎ অত্যন্ত পবিত্র ও পৃত হন্দয়, যা মহানবী (সা.)-এর হন্দয়

আর যা আপন মূলপ্রকৃতিতে শুভ্র ও স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় সকল অস্বচ্ছতা ও পক্ষিলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব সম্পর্কের উর্ধ্বে]। সেই কাঁচ এমন পরিক্ষার, যেন তা সেসব নক্ষত্রের মাঝে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা আকাশে প্রবল উজ্জ্বল্যের সাথে সঙ্গীরবে দীপ্তিমান, যাদেরকে বলা হয় দুর্বী নক্ষত্র [ (অর্থাৎ হ্যরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)- এর হৃদয় এমন পরিক্ষার ও স্বচ্ছ যে, দুর্বী নক্ষত্রের ন্যায় অত্যন্ত আলোকিত ও অতীব উজ্জ্বল, যার অভ্যন্তরীণ আলোকধারা বাইরের স্তরে পানির ন্যায় প্রবহমান দেখা যায়)]। সেই প্রদীপটি পবিত্র জয়তুন বৃক্ষ দ্বারা (অর্থাৎ জলপাইয়ের তেল দ্বারা) প্রজ্বলিত করা হয়েছে। [পবিত্র জয়তুন বৃক্ষ বলতে বুরানো হয়েছে মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণময় সত্তাকে, পরম শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্পূর্ণতার সুবাদে যা যাবতীয় কল্যাণের সমাহার। যার আশিস স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সার্বজনীন, চিরস্থায়ী, চিরপ্রবহমান ও নিরবচ্ছিন্ন]। সেই কল্যাণময় বৃক্ষ পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয় (অর্থাৎ মুহাম্মদী পবিত্র প্রকৃতিতে না রয়েছে বাড়তি, না আছে ঘাটতি, বরং তা সর্বোত্তমভাবে পরিমিত ও পরম ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি। সেই পবিত্র বৃক্ষের তেল দ্বারা ওহীর প্রদীপ প্রজ্বলিত করার কথা যে বলা হয়েছে- তাতে তেল বলতে প্রকৃতিগত সকল অনুপম নৈতিক গুণাবলীতে সজিত, সূক্ষ্ম ও জ্যোতির্মণিত মুহাম্মদী বিবেকবুদ্ধিকে বুরানো হয়েছে, যা সেই পরমোৎকর্ষ বিবেকের স্বচ্ছ বার্ণাধারা থেকে পান করে প্রতিপালিত হয়। ওহীর প্রদীপ মুহাম্মদীয় উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে যে অর্থে প্রজ্বলিত হয়েছে, তা হলো সেই যোগ্য ও বিরল চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর ওহীর বারিধারা বর্ষিত হয়েছে আর সেই গুণাবলীই ওহী অবতরণের কারণ সাব্যস্ত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, ওহীর কল্যাণধারা বর্ষিত হয়েছে সেই উন্নত, সূক্ষ্ম ও আলোকিত মুহাম্মদী বৈশিষ্ট্যবলী অনুসারে। আর মুহাম্মদী প্রকৃতিতে যেসব সুষম গুণাবলী ছিল, সে অনুসারে তা প্রকাশিত হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, নবীর প্রতি যেসব ওহী অবতীর্ণ হয়, তা তাঁর প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখেই নাযিল হয়ে থাকে। যেমন, হ্যরত মূসা (আ.)-এর প্রকৃতিতে ছিল তেজস্বীতা ও ক্ষুরুতা। মূসায়ী প্রকৃতি অনুসারে তওরাতও প্রতাপপূর্ণ শরীয়ত রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। হ্যরত দৈসা (আ.)-এর প্রকৃতিতে ছিল নমনীয়তা ও কোমলতা, আর ইঞ্জিলের শিক্ষাও তদানুসারে নমনীয় ও কোমলতানির্ভর। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর স্বভাব বা প্রকৃতি ছিল ভারসাম্যের পরম মার্গে। সর্বত্র নশ্তাপ্রিয়ও ছিল না আর সকল

ক্ষেত্রে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশও তাঁর কাছে পছন্দনীয় বিষয় ছিল না, বরং প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে তাঁর কল্যাণময় প্রকৃতি ক্ষেত্রে ও পরিস্থিতিকে দৃষ্টিতে রাখত। অতএব, পবিত্র কুরআনও সেই ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা বজায় রেখে অবর্তীণ হয়েছে, যা একাধারে কঠোরতা, কোমলতা, ত্রাস, অনুকম্পা, নমনীয়তা ও দৃঢ়তার সমাহার।

অতএব, এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা প্রকাশ করেছেন যে, কুরআনের ওহীর প্রদীপ সেই কল্যাণময় বৃক্ষের তেল দ্বারা প্রজ্ঞালিত, যা পূর্বেরও নয় আর পশ্চিমেরও নয়, অর্থাৎ তা ভারসাম্যপূর্ণ মুহাম্মদী প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে অবর্তীণ হয়েছে, যাতে না মুসায়ী প্রকৃতির কঠোরতা আছে, না খ্রিস্টীয় স্বভাবের কোমলতা, বরং রয়েছে কঠোরতা ও কোমলতা এবং ক্রোধ ও অনুকম্পার এক অপূর্ব সমষ্টয়। এছাড়া তা পরম ভারসাম্যের বহিঃপ্রকাশ এবং ‘জালাল’ ও ‘জামাল’ অর্থাৎ প্রতাপ ও সৌন্দর্যের সমাহার। অধিকন্তে তা মহানবী (সা.)-এর পরম ভারসাম্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ, যা সুক্ষ্মবুদ্ধি ও মেধার সমভিব্যহারে ওহীর জ্যোতি প্রকাশের জন্য তেল আখ্যা পেয়েছে (অর্থাৎ ওহী নাফিল হওয়ার কারণ হয়েছে)। এসব বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে সম্মোধন করে আল্লাহ তা'লা অন্যত্রও বলেছেন، ﴿لَعْنَكَ عَظِيمٌ﴾ (সুরা আল কলম: ৫)। অর্থাৎ হে নবী! তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর সমষ্টিয়ে সৃষ্টি ও গঠিত অর্থাৎ স্বীয় সন্তান্য সকল সম্মানজনক চারিত্রিক ও নেতৃত্বিক গুণাবলীতে এতটা সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ যে, এর অধিক আর কিছু কল্পনাই করা যায় না। কেননা আরবী বাগধারায় ‘আয়ীম’ শব্দ সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা শ্রেণিগত পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন বলা হয়, এ বৃক্ষটি ‘আয়ীম’ বৃক্ষ, তখন এর অর্থ হবে একটা বৃক্ষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যতটা সম্প্রসারিত হওয়া সম্ভব, তার সবই এ বৃক্ষে রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ‘আয়ীম’ সেই বস্তুকে বলা হয়, যার মাহাত্ম্য কল্পনা, ধারণা বা আয়ত্তের বাইরে। ‘খুল্ক’ বলতে কুরআন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যান্য গ্রন্থে শুধুমাত্র (সাধারণ মানুষের ধারণা অনুসারে) প্রসন্নতা, সুন্দর সংসর্গ, কোমলতা আর দয়ামায়া ও ভদ্রতা বোঝায় না। ‘খে’-তে যবর ও পেশ যুক্ত অবস্থায় খাল্ক ও খুল্ক যথাক্রমে দু’টো পৃথক পৃথক শব্দ, যার একটি অপরাটির বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘খাল্ক’ অর্থাৎ ‘খে’ এর ওপর যখন যবর যুক্ত করে লেখা হয়, তখন মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা অবয়ব বুঝায়, যা আকৃতিদাতা খোদার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া হয়েছে আর

যার কল্যাণে সে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। আর পেশযুক্ত করে যখন লেখা হয় (অর্থাৎ খুল্ক), তখন মানুষের অভ্যন্তরীণ চেহারা অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যাবলীকে বুঝায়, যার সুবাদে মানবের স্বরূপ পশুর রূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। অতএব, মানুষের মাঝে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে যত অভ্যন্তরীণ গুণাবলী দেখা যায় আর মানবতারকাপী বৃক্ষ নিংড়ে যে নির্যাস বা বৈশিষ্ট্যাবলী বের করা সম্ভব, যা মানুষ ও পশুর মাঝে অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য নিরূপণ করে— সে সবের নাম হলো খুল্ক। মানব প্রকৃতিরূপী বৃক্ষ যেহেতু সত্যিকার অর্থে মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর সকল পশুর পঙ্গসুলভ শক্তিবৃত্তিতে যে বাড়তি বা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, তা থেকে সে মুক্ত। এ দিকেই আল্লাহ তা'লা ইঙ্গিত করছেন যে، **لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا حَسِينًا تَوْبُوهُ** (সূরা আত্‌তীন: ৫)। তাই খুল্ক শব্দ যদি নিন্দাসূচক অর্থের বাইরে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এর অর্থ সর্বদা উন্নত নৈতিক গুণাবলী হয়ে থাকে। আর সেই সকল শ্রেষ্ঠ নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী বলতে মানুষের মাঝে বিদ্যমান সব অভ্যন্তরীণ বিশেষত্বকে বুঝায়, যা মানবতার স্বরূপ বা নির্যাস, যেমন- প্রথর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ত্ব, স্বচ্ছ চিন্তাধারা, উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ, প্রথর স্মৃতিশক্তি, সতীত্ব বা পরিত্রাতা, লজ্জাবোধ, ধৈর্য, স্বল্পে তুষ্টি, ধর্মানুরাগ, খোদাভীরুতা, বীরত্ব, অবিচলতা, সুবিচার, বিশ্বস্ততা, সত্য ভাষণ, যথাস্থানে উদারতা, যথাস্থানে ত্যাগ স্বীকার, যথাস্থানে বদান্যতা, যথাস্থানে উপকার বা কল্যাণ সাধন, যথাস্থানে মহানুভবতা, যথাস্থানে দৃঢ়তা, যথাস্থানে ন্মতা, যথাস্থানে সহিষ্ণুতা, যথাস্থানে আত্মসম্মানবোধ, যথাস্থানে বিনয়, যথাস্থানে শিষ্টাচার, যথাস্থানে স্নেহ, যথাস্থানে দয়া-মায়া, যথাস্থানে কৃপা-করণা, খোদা-প্রেম, খোদানুরাগ ও সবার প্রতি বিমুখ হয়ে খোদামুখী হওয়া ইত্যাদি। আর সেই তেল এত পরিস্কার ও স্বচ্ছ যে, অগ্নিসংযোগ ছাড়াই যেন তা জ্বলে উঠবে। {অর্থাৎ সেই নিষ্পাপ নবী (সা.)-এর বিবেকবুদ্ধি ও সকল মহান চারিত্রিক গুণ ভারসাম্যতা, সূক্ষ্মতা ও জ্যোতির্ময়তার এমন পরম মার্গে উন্নীত ও উপনীত যে, এলহাম লাভের পূর্বেই নিজ গুণে জ্বলে উঠতে উদ্যত ছিল}। **فَرُّونِي** আলোর ওপর আলোর প্রবাহ। অর্থাৎ হ্যরত খাতামুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র ও মঙ্গলময় সন্তায় অনেক প্রকার আলোর সমাহার ঘটেছিল আর সেসব আলোর ওপরে আরও এক স্বর্গীয় আলো অবতীর্ণ হয়েছে, যা ছিল আল্লাহর ওহী। সেই আলো বর্ষিত হওয়ার ফলে খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর পবিত্র ও কল্যাণময় সন্তা আলোর মিলনমেলা বা মোহনায়

পরিণত হয়েছে। এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওহীর আলো অবতীর্ণ হওয়ার দর্শন হলো, তা আলোর ওপরই অবতরণ করে, অমানিশার ওপর নয়। কেননা কল্যাণবারি অবতরণের জন্য সামঞ্জস্য হলো শর্ত। আলোর সাথে অমানিশার কোন সামঞ্জস্য নেই, বরং আলোর সামঞ্জস্য হলো আলোর সাথে। প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক (আল্লাহ) সামঞ্জস্য বা মিল ছাড়া কোন কাজ করেন না। অনুরূপভাবে, আলোরপী কল্যাণ প্রবাহের ক্ষেত্রেও তাঁর নিয়ম এটিই যে, যার মাঝে কিছু আলো আছে, তাকে আরো দেয়া হয়। যার কাছে কিছুই নেই, তাকে কিছুই দেয়া হয় না। যার কাছে চোখের আলো আছে, সে-ই সূর্যের আলো পায় আর যার চোখে জ্যোতি নেই, সে সূর্যের আলো হতেও বঞ্চিত থাকে। আর প্রকৃতিগত জ্যোতি যে কম পেয়েছে, সে অপর জ্যোতিও স্বল্পই পায়। আর প্রকৃতিগত জ্যোতি যে বেশি পেয়েছে, সে দ্বিতীয় জ্যোতিও অধিক প্রাপ্ত হয়। অতএব, যানব প্রকৃতির পুরো বর্ণচট্টায় নবীরা সেসব মহান ব্যক্তিত্ব, যারা ব্যাস্তিতে ও উৎকর্ষতায় এত বেশি অভ্যন্তরীণ জ্যোতি প্রদন হয়েছেন যে, তাঁরা যেন জ্যোতির মূর্ত প্রতীক হয়ে গেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-এর নাম নূর ও ‘সিরাজে মূনীর’ (প্রদীপ্ত সূর্য) রাখা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাঁলা বলেন, ﴿مَنَّا اللّٰهُ بِنُورٍ وَكَيْفَ مُبِينٌ﴾ (সূরা আল মায়দা: ১৬)। (অর্থাৎ নিচয় আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এক নূর আর উজ্জ্বল কিতাবও।) (সূরা আল আহ্যাব: ৪৭)। (অর্থাৎ- এবং আল্লাহর দিকে তাঁর আদেশে এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্যরূপে।) এ প্রজ্ঞার অধীনেই ওহীর জ্যোতি কেবল নবীরা লাভ করেছেন আর এটি তাঁদেরই বিশেষত্ব, যা লাভের পূর্বশর্ত হলো সহজাত জ্যোতির সম্পূর্ণতা এবং মহান হওয়া। সুতরাং এই নিখুঁত তথা অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে, যা আল্লাহ তাঁলা উল্লিখিত উপমায় বর্ণনা করেছেন, তাদের কথার অসারতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যারা প্রকৃতিগত মর্যাদার পার্থক্যে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও নিছক নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার কারণে ধরে নিয়েছে যে, সেই জ্যোতি দুর্বল প্রকৃতির লোকদেরও লাভ হতে পারে, যা উৎকর্ষ মানবের লাভ হয়। সততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে এদের ভেবে দেখা উচিত যে, ওহীর কল্যাণধারা সম্পর্কে এরা কত ভয়াবহ আভিতে নিপত্তি। তারা স্পষ্টভাবে দেখছে যে, প্রকৃতিতে বিরাজমান খোদার নিয়ম যদিও তাদের মিথ্যা ধারণার সত্যায়ন করে না, তাসত্ত্বেও বিদ্বেষ এবং শক্তার বশবর্তী হয়ে তারা এই রূপ ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। অনুরূপভাবে, প্রিষ্ঠানরাও আলোর কল্যাণধারা লাভের জন্য আলোর প্রকৃতিগত

শর্ত যে আবশ্যিক, তা স্বীকার করে না আর বলে, যে হৃদয়ে ওহীর জ্যোতি অবতীর্ণ হয় তার জন্য অভ্যন্তরীণ কোন বৈশিষ্ট্যে জ্যোতির্মণিত হওয়া আবশ্যিক নয়; বরং কোন ব্যক্তি যদি সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারী না হয়ে চরম নির্বোধ ও বোকা হয়, বীরত্বের পরিবর্তে চরম ভীর হয়, দানশীল না হয়ে চরম কৃপণ হয় আর আত্মর্যাদাশীল হওয়ার পরিবর্তে আত্মসম্মানবোধহীন হয়, খোদাপ্রেমের পরিবর্তে চরমভাবে দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকে, তাক্ষণ্য সাধুতা, খোদাভীতি ও সততার বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত না হয়ে যদি জখন্য চোর ও ডাকাত হয়, পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতার পরিবর্তে যদি চরম নির্লজ্জ ও রিপুপূজারি হয়, স্বল্পে তুষ্টির পরিবর্তে যদি চরম লালসাগ্রস্ত হয়, এক কথায় অবস্থা এত শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের মতে এমন ব্যক্তিও খোদার নবী এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হতে পারে! বরং হয়রত ঈসা ছাড়া অন্য সব নবী, যাদের নবুয়তেও তারা বিশ্বাস করে আর যাদের ঐশ্বি গ্রস্তাবলীকে পবিত্র বলতে বলতে তাদের মুখে ফেনা উঠে যায়, নাউয়ুবিল্লাহ্, তাদের দৃষ্টিতে তাঁরা এমনই ছিলেন আর পবিত্র সব শ্রেষ্ঠত্ব হতে বিপ্রিত ছিলেন, যা নিষ্পাপ ও পবিত্র হৃদয় হওয়ার জন্য আবশ্যিক অনুষঙ্গ। খ্রিস্টানদের বুদ্ধি ও খোদা-সংক্রান্ত তাদের এহেন তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সহস্র বাহবা! ওহীর জ্যোতি অবতরণের কতই না চমকপ্রদ দর্শন তারা উপস্থাপন করেছেন! কিন্তু এমন দর্শনের অনুসারী এবং একে যারা ভালোবাসে তারা সেসব মানুষ, যারা ঘোর অমানিশা ও অভ্যন্তরীণ অন্ধক্রে মাঝে নিপত্তি। নতুবা আলো থেকে কল্যাণ লাভের জন্য যে আলো আবশ্যিক, তা এমন একটি বাস্তব-সত্য, যা কোন দুর্বল বুদ্ধির মানুষও অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু বিবেকবুদ্ধির সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, যারা আলোর প্রতি বিদ্যে রাখে আর অন্ধকারকে বাদুড়ের মত ভালোবাসে, যাদের চোখ রাতকালে ভালোভাবে খোলে আর আলোকোজ্জ্বল দিনে অন্ধ হয়ে যায়, তাদের কি-ই বা চিকিৎসা করা যেতে পারে? খোদা যাকে পছন্দ করেন, স্বীয় আলোর পানে (অর্থাৎ কুরআনের দিকে) পরিচালিত করেন আর মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন আর তিনি সব বিষয়ে সম্যক অবগত। (অর্থাৎ সঠিক পথের দিশা আল্লাহর পক্ষ থেকে লক্ষ একটি বিষয় আর তা সে-ই লাভ করে, যার অনাদি ও অনন্ত দানের উৎস (অর্থাৎ খোদা) হতে সামর্থ্য লাভ হয়, অন্যদের নয়। উপমার আদলে খোদা তাঁলা সূক্ষ্ম বিষয়াদি বর্ণনা করেন, যেন গভীর রহস্যাবলী বোধগম্য হয়। কিন্তু তিনি স্বীয় আদি জ্ঞানের ভিত্তিতে খুব ভালোভাবে জানেন যে, কে সেসব উপমা বুঝবে এবং সত্য গ্রহণ করবে আর

কে বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হবে)। অতএব, এ উপমায়, এখন পর্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় যার অনুবাদ করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর হৃদয়কে খোদা তাঁলা স্বচ্ছ আয়নার সাথে তুলনা করেছেন, যাতে কোন প্রকার পক্ষিলতা নেই। এটি হৃদয়ের জ্যোতি। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর বোধবুদ্ধি ও চেতনা, সুস্থ বিবেক এবং প্রকৃতিগত ও সহজাত সকল উন্নত নৈতিক চরিত্রকে এক অতি উন্নত মানের তেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাতে রয়েছে প্রভৃত ঔজ্জ্বল্য এবং যা প্রদীপের আলোর উৎস। এ হলো বিবেকের আলো। কেননা অভ্যন্তরীণ সব সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের উৎসস্থল হলো যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি।

এসব আলোর ওপর একটি স্বর্গীয় আলো অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তাহলো ওহীর আলো। তিনি প্রকারের আলো সম্মিলিতভাবে মানুষের হিদায়াতের কারণ হয়েছে। এটিই শ্রেণী নীতি ও রীতি, যা চিরপিবিত্র সন্তার পক্ষ থেকে চিরস্তন রীতি আর তাঁর পবিত্র সন্তার জন্য এটিই মানানসই। অতএব, পুরো এই গবেষণা থেকে প্রমাণিত হলো যে, যতক্ষণ কোন মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও হৃদয়ের আলো পরম পর্যায়ের না হবে, ততক্ষণ ওহীর আলো সে আদৌ প্রাণ্ত হয় না। ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিবেকবুদ্ধি ও হৃদয়ের জ্যোতির ক্ষেত্রে পরম উৎকর্ষতা কেবল সীমিত সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সবার ক্ষেত্রে নয়। এখন এই উভয় প্রমাণকে একীভূত করার ফলে এ বিষয়টি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলো যে, ওহী ও রিসালাত কেবল কিছু অনুপম বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত মানুষই লাভ করে থাকে, সবাই নয়। সুতরাং সুনিশ্চিত এই প্রমাণের মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজীদের এই ভাস্ত ধারণা সম্পূর্ণভাবে অপনোদন করা হলো এবং আমাদের উদ্দেশ্যও ছিল এটিই।

**পঞ্চম সন্দেহ:** কোন কোন ব্রাহ্ম সমাজী এ সন্দেহ ব্যক্ত করে থাকে যে, পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান কুরআনের ওপরই যদি নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তাহলে সকল দেশে, সকল প্রাচীন ও আধুনিক জনবসতিতে খোদা কেন তা প্রচার করলেন না? কেন কোটি কোটি মানুষকে স্বীয় পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও সঠিক ধর্মবিশ্বাস থেকে বঞ্চিত রাখলেন?

**উত্তর:** এই কুমন্ত্রণা বা ভাস্ত ধারণাও অদূরদর্শীতার কারণে দেখা দেয়। কেননা যেখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, পূর্ণবিশ্বাস ও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান আদৌ নিছক বুদ্ধির জোরে অর্জিত হতে পারে না, বরং সেই উন্নত বিশ্বাস ও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান কেবল এমন এলহামের মাধ্যমে লাভ হয়, যা স্বীয়

সন্তায় ও উৎকর্ষতায় হবে অনন্য ও অতুলনীয়। এটি যে খোদার পক্ষ থেকে, তা এর অনন্যতার কল্যাণে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যিক। অধিকন্ত, এ গ্রন্থে আমরা এটিও প্রমাণ করেছি যে, কুরআনই পৃথিবীর একমাত্র অনন্য গ্রন্থ, অন্য কোনটি নয়। এমন পরিস্থিতিতে সত্যাপ্নেয়ীর জন্য সহজ ও সঠিক পথ হবে, আমাদের যুক্তি খণ্ডন করে এটি প্রমাণ করা যে, পারলৌকিক বিষয়ে নিছক যুক্তিবুদ্ধিই দৃঢ় বিশ্বাস ও সঠিক এবং সুনিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞানের মর্যাদায় উপনীত করতে সক্ষম। এটি প্রমাণ করতে না পারলে কুরআনের সত্যতা গ্রহণ করা উচিত, যার মাধ্যমে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এরপরও এটি গ্রহণ করা পছন্দ না হলে কুরআনের কোন দৃষ্টিত্ব উপস্থাপন করা হোক আর এর (অর্থাৎ কুরআনের) যে সকল অনন্য সৌন্দর্যবলী রয়েছে, তা অন্য কোন গ্রন্থ থেকেও বের করে দেখানো হোক, যেন এটি প্রমাণ হতে পারে যে, বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে পরম মার্গে উপনীত হওয়ার জন্য ঐশ্বী গ্রন্থের যদিও একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ধরাপঢ়ে বাস্তবে এমন কোন গ্রন্থ নেই। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী যদি এসকল কথার কোনটির উত্তর না দেয়, বরং মুখ খোলারই সাহস না হয়, তাহলে স্বয়ং তারই সুবিচার করা উচিত যে, একটি সত্য বিষয় যেখানে দৃঢ় প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, যা খণ্ডন করার কোন উপাত্ত তার কাছে নেই, আর সে এর প্রমাণাদি খণ্ডন করারও সামর্থ্য রাখে না, তাহলে সুনিশ্চিত প্রমাণের বিপরীতে বিকৃত ধ্যানধারণা উপস্থাপন করা কতটা সততা ও বিশ্বাস বিবর্জিত! গোটা বিশ্ব জানে, যে বিষয় সঠিক ও সত্য হওয়া অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, যতদিন সেসকল প্রমাণ খণ্ডন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত সে বিষয়টি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত একটি সত্যই থাকবে, যা নিছক হীন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভাস্ত বলে গণ্য হতে পারে না। যে ঘরের ভিত, দেয়াল ও ছাদ অত্যন্ত দৃঢ়, তা কি কেবল মুখের ফুৎকারে উড়ে যেতে পারে? খোদা কেন স্মীয় গ্রন্থ সকল দেশে প্রচার করেন নি আর বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ কেন এটি থেকে লাভবান হলো না?— এটি উন্ন্যাদের চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ধারণা। আলো বিকীরণকারী সূর্যের আলো যদি পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কিছু স্থান পর্যন্ত না পৌঁছে থাকে বা কিছু মানুষ পেঁচার ন্যায় সূর্য দেখেও চোখ বন্ধ করে রাখে, তাহলে এর ফলাফল কী এটি দাঁড়াবে যে, সূর্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়? বিরান কোন ভূমিতে যদি বৃষ্টি বর্ষিত না হয় বা লবণাক্ত কোন ভূমি এর কল্যাণে সিঙ্গ না হয়, তাহলে সেই রহমতবারি বর্ষণের বিষয়কে কী মানুষের কর্ম মনে করা হবে? এমন সদেহ বা কুম্ভনগার নিরসনকলে স্বয়ং আল্লাহ্

তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ঐশী এলহামের মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পাওয়া সব মানুষের ভাগ্যে জোটে না, বরং সেই হিদায়াত সেসব স্বচ্ছ-প্রকৃতির মানুষের জন্য, যারা তাক্তওয়া ও পুণ্যকর্মের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এলহামের উৎকৃষ্ট দিকনির্দেশনা থেকে তারাই লাভবান হয় এবং কল্যাণলাভ করে আর তাদের কাছে খোদার এলহাম অবশ্যই পৌঁছে যায়। এর মধ্য হতে কিছু আয়াত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

الْمَذِلُّكُ لَرَبِّهِ هُدَىٰ لِلْمُتَقْبِلِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْنِ وَقُبْصِيْوْنَ الصَّلَاةَ وَمِنَ رَّزْقِنَاهُمْ  
يُنْفِقُوْنَ○ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ○ أُولَئِكَ  
عَلَىٰ هُدَىٰ مِنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعْلَمُ رَبُّهُمْ أَمْ لَهُ  
تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ○ خَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُوَّيْهِمْ وَعَلَىٰ سَعِيْهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غَشَّاً وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ○

(সূরা আল বাকারা: ২-৮)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوُ عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ  
الْعِكْرَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ ضَلَالٍ مُبَيِّنٍ○ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَهَا يَأْتِحُوا بِهِمْ○ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ○ ذِلِّكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتَبِرُهُ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُوْلُ الفَضْلِ الْعَظِيمِ○

(সূরা আল জুমআ: ৩-৫)

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মাঝে প্রথমে এই আয়াত সম্পর্কে, অর্থাৎ-  
الْمَذِلُّكُ لَرَبِّهِ هُدَىٰ  
সম্পর্কে প্রণিধান আবশ্যক যে, কত সূক্ষ্ম-  
সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে অথচ সংক্ষেপে খোদা তা'লা উল্লিখিত সন্দেহের  
নিরসন করেছেন। প্রথমতঃ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ইল্লতে ফায়েলী বা  
'নিমিত্ত কারণ' (efficient cause) বর্ণনা করেছেন আর এর মাহাত্ম্য ও  
মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন ঝুঁ আমিই খোদা, আমিই সবচেয়ে বেশি  
জানি। অর্থাৎ আমিই এই ঘট্টের নাযিলকারী, যিনি সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান, যাঁর  
সমতুল্য জ্ঞান কারও নেই। এরপর কুরআনের 'ইল্লতে যাদি' (material cause)  
বা 'উপাদান কারণ অর্থাৎ নিয়ামক' বর্ণনা করেছেন আর এর  
মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, অর্থাৎ সেই গৃহ এত মহান ও  
উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে, এর 'উপাদান কারণ' হলো খোদার জ্ঞান, অর্থাৎ- এর  
সম্পর্কে এটি প্রমাণিত যে, এর উৎস ও প্রস্তুবণস্থল হলো প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক  
আদি সত্তা খোদা তা'লা। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বা 'সেই' শব্দ ব্যবহার

করেছেন, যা দূরের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এ গ্রন্থ সেই মহান গুণাবলীর আধার, একক সত্ত্বার জ্ঞান হতে উৎসারিত, যিনি নিজ সত্ত্বায় অনন্য ও অতুলনীয়, যার অতুলনীয় জ্ঞান ও সূক্ষ্ম রহস্যাবলী মানুষের দৃষ্টিসীমার বহু উর্ধ্বে। এরপর এর ‘ইঁল্লতে সূরী’ (formal cause) বা ‘আকারগত কারণ’ যে প্রশংসাযোগ্য, তা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, ﴿رِبِّ الْعَالَمِينَ﴾ অর্থাৎ কুরআন আপন গুণে এমন প্রমাণসমূহ ও যুক্তিযুক্ত অবস্থা ও অবস্থানে রয়েছে যে, এ সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। অর্থাৎ এটি অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় গাঁথা ও কাহিনীসর্বস্ব নয়, বরং তা সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক, অধিকন্তে স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অনুকূলে অতি স্পষ্ট যুক্তি ও পর্যাপ্ত প্রমাণাদি তুলে ধরে, যা নিজ গুণেই একটি নির্দর্শন এবং সন্দেহ ও সংশয় নিরসনের ক্ষেত্রে ধারালো তরবারির মর্যাদা রাখে। খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে তা কেবল এই সন্দেহ বা অনুমানের স্তরে ছেড়ে দেয় না যে, খোদা থাকা উচিত, বরং এই নিশ্চিত ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত করে দেয় যে, ‘তিনি আছেন’। তিনটি কারণের এই মাহাত্মাই তিনি বর্ণনা করেছেন। এ তিনটি কারণের প্রত্যেকটির অসাধারণ হওয়া এবং প্রভাব বিস্তার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত ও সুমহান ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও চতুর্থ কারণ অর্থাৎ কুরআন অবতরণের ‘উদ্দেশ্য কারণ’কে (final cause or ultimate cause), যা কিনা পথ প্রদর্শন ও হিদায়াত দেয়া, তা কেবল মুস্তাকীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ﴿لِمَنِ يُلْتَقِي هُنَّ أَرْبَعَةٌ﴾ অর্থাৎ- এ গ্রন্থ কেবল সেসব যোগ্য প্রকৃতির লোকদের হিদায়াতের জন্য অবর্তীণ করা হয়েছে, যারা অভ্যন্তরীণ পরিত্রাতা, সুস্থবুদ্ধি, সঠিক চিন্তাধারা, সত্য সন্ধানের প্রতি গভীর অনুরাগ ও সঠিক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য রাখার সুবাদে অবশেষে ঈমান, খোদা সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান ও পূর্ণ তাকওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ স্বীয় চিরান্তন জ্ঞানের ভিত্তিতে খোদা যাদের সম্পর্কে জানেন যে তাদের প্রকৃতি এই হিদায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তারা ঐশ্বী সত্য তত্ত্বে উন্নতি করতে পারে, তারা অবশেষে এ গ্রন্থের মাধ্যমে হিদায়াত পাবে আর এই গ্রন্থ তাদের কাছে অবশ্যই পৌছুবে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে আসার সামর্থ্য প্রদান করবেন। দেখ! এখানে খোদা তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন, খোদার পরিত্র জ্ঞানে যারা হিদায়াত পাওয়ার যোগ্য আর প্রকৃতিগতভাবে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত, তারা অবশ্যই সঠিক পথের দিশা লাভ করবে। আর এ আয়াতের পর যেসব

আয়াত লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে এরই বিশদ বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেন, (খোদা জানেন) ঈমান আনয়নকারী যতজনই রয়েছে, তারা যদিও এখনও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, কিন্তু পর্যায়ক্রমে সবাই অবশ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে আর বাইরে থেকে যাবে কেবল তারা, যাদের সম্পর্কে খোদা ভালোভাবেই জানেন যে, তারা ইসলামের সত্য ও সঠিক পথ গ্রহণ করবে না। তাদেরকে হিতোপদেশ দেয়া হোক বা না হোক, তারা ঈমান আনবে না বা তাক্তওয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গে তারা পৌঁছুবে না। এক কথায়, এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, কুরআনে বিধৃত পথ নির্দেশনা থেকে কেবল মুন্তাকীগণই লাভবান হতে পারে, যাদের অবিকৃত প্রকৃতির ওপর অবাধ্য প্রবৃত্তির অমানিশা জয়যুক্ত হতে পারে না। সঠিক এই পথের দিশা তারা অবশ্যই লাভ করবে। কিন্তু যারা খোদাভীরু নয়, তারা কুরআনের দিক-নির্দেশনা থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণও লাভবান হয় না আর এর হিদায়াত এমনিতেই তাদের কাছে পৌঁছে যাবে- এটিও বাস্তিত নয়। উভয়ের সারসংক্ষেপ হলো, পৃথিবীতে যেমন দু'ধরনের মানুষ দেখা যায়- কিছু হলেন মুন্তাকী ও সত্তাষেষী যারা সত্য গ্রহণ করে। অপরদিকে কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যারা স্বভাবগতভাবে বিশৃঙ্খলাপরায়ণ। তাদেরকে উপদেশ দেয়া বা না দেয়া সমান। এখনই আমরা একথাও বর্ণনা করে এসেছি যে, যাদের কাছে মৃত্যু পর্যন্ত কুরআনের সঠিক পথনির্দেশনা পৌঁছে নি বা যাদের কাছে ভবিষ্যতেও পৌঁছুবে না, কুরআন তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত করে। সুতরাং যাদের কাছে কুরআনের হিদায়াত বা সঠিক পথ নির্দেশনা পৌঁছে নি, তারা প্রথম প্রকার, অর্থাৎ হিদায়াতপ্রাপ্তদের শ্রেণিভুক্ত হবে! কুরআন শরীফের বিরোধিতায় এমন দাবি করা আহমাকের কাজ হবে। কেননা ‘হতে পারে’ খণ্ড বাক্যটি কোন নিশ্চিত প্রমাণ নয়, কিন্তু পবিত্র কুরআনে কোন বিষয়ে সংবাদ প্রদান করা নিরক্ষুশ বা অকাট্য প্রমাণের মর্যাদা রাখে। এর কারণ হলো, সেটি উৎকৃষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বা সত্য সংবাদদাতার পক্ষ থেকে। সুতরাং যে এর সংবাদকে নিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে করে না, তার জন্য আবশ্যিক হবে, এর খোদার পক্ষ থেকে হওয়া সংক্রান্ত যেসব প্রমাণ রয়েছে তা খণ্ডন করে দেখানো, যার কিছু আমরা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। যতক্ষণ সে তা খণ্ডন করতে অক্ষম ও ব্যর্থ থাকবে, ততক্ষণ ন্যায়নির্ণয় ও ঈমানের প্রমাণ দেয়ার রীতি হবে সে বিষয়কে সঠিক ও সিদ্ধ মনে করা, যার সঠিক হওয়া সম্পর্কে এমন গ্রন্থে সংবাদ রয়েছে এবং যা

নিজেই আপন সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কেননা অন্তর্নিহিত বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ বহনকারী এক গ্রন্থের, ‘ঘটা সম্ভব’ মর্মে কোন সম্ভাব্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়া সে বিষয়ের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহাতীত প্রমাণ হয়ে থাকে। আর এটি জানা কথা যে, একটি চূড়ান্ত সাক্ষ্য ও নিশ্চিত প্রমাণকে অবজ্ঞা করে এর বিপরীতে ভিত্তিহীন সন্দেহের অবতারণা করা এবং অমূলক ধ্যানধারণাকে হৃদয়ে স্থান দেয়া অবিবেচক ও অতি সরল হওয়ার প্রমাণ। যদি একথা বল যে, যাদের কাছে ঐশী গ্রন্থ পৌছে নি, তাদের মুক্তির কি হবে? এর উত্তর হলো, এমন মানুষ সম্পূর্ণরূপে বন্য ও মানবীয় বোধবুদ্ধি বিবর্জিত হলে তারা সব ধরণের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মুক্ত, পাগল, উন্মাদ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে গণ্য হবে। কিন্তু যাদের মাঝে কিছুটা বিবেকবুদ্ধি ও চৈতন্যবোধ রয়েছে, তাদেরকে তাদের বোধবুদ্ধি অনুপাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হৃদয়ে যদি এ সন্দেহ জাগে যে, বিভিন্ন প্রকার স্বভাব প্রকৃতি খোদা তা'লা কেন সৃষ্টি করলেন? কেন সবাইকে এমন শক্তি-বৃত্তি দান করলেন না, যার কল্যাণে তারা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও খোদা-প্রেমের পরাকার্ষা লাভ করতে পারতো? অতএব, স্মরণ রাখা উচিত যে, এ প্রশ্নাও খোদার কাজে অনর্থক নাক গলানো, যা কোনভাবেই বৈধ নয়। সব বিবেকবান বুঝবে যে, সকল সৃষ্টিকে একই পর্যায়ে রাখা আর সবাইকে পরমোৎকর্ষ শক্তি-বৃত্তি প্রদান করা খোদার জন্য আবশ্যক নয়। এটি তাঁর একান্ত কৃপা। তাঁর ইচ্ছা, যার প্রতি পছন্দ হয় কৃপা করবেন, যার জন্য পছন্দ নয় করবেন না। যেমন তোমাদেরকে খোদা তা'লা মানুষ বানিয়েছেন কিন্তু গাধাকে মানুষ বানান নি। তোমাদের বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন, তাকে দেন নি বা তোমাদেরকে জ্ঞানের অলংকারে সজ্জিত করা হয়েছে, তাকে নয়। এসব কিছু মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কোন অধিকার এমন নেই যা কেবল তোমাদের প্রাপ্য, গাধার নয়। বস্তুত যেখানে খোদার সৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে র্যাদার তারতম্য বিদ্যমান, কোন বুদ্ধিমান যা স্বীকার না করে পারবে না; সেখানে প্রশ্ন হলো, ক্ষমতাধর সর্বাধিপতির সামনে এমন সৃষ্টি, যাদের বড় হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না, বরং অস্তিত্বেরও কোন অধিকার যাদের নেই, তারা কিছু বলার অধিকার রাখে কি? বানাদের অস্তিত্বের পোশাক পরিধান করানো তাদের ওপর খোদার একটি অপার দান ও অনুকম্পা বৈ আর কী? আর এটি জানা কথা যে, দাতা ও অনুগ্রহশীল সন্তা স্তীয় দান ও অনুগ্রহ বৃদ্ধি বাহাসের অধিকার রাখেন। যদি কম দেয়ার স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে

বেশি দেয়ার স্বাধীনতাও তাঁর থাকবে না। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি মালিকানাস্ত্র বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়বেন। এটি স্পষ্ট যে, অনর্থক যদি সৃষ্টির ওপর সৃষ্টির কোন অধিকার আছে বলে মনে করা হয়, তাহলে এমন এক ধারার সূচনা হবে যেখানে দাবি-দাওয়ার কোন শেষ নেই। কেননা সৃষ্টি কোন সৃষ্টিকে যে মানেই সৃষ্টি করুন না কেন, সে পর্যায়ে সেই সৃষ্টি হয়ত বলতে পারে যে, আমার অধিকার এর চেয়েও বেশি! আর খোদা তাঁলা যেহেতু অন্ত মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাঁর সীমাহীন কুদরত বা শক্তির বিদ্যমানতায় শুধু মানুষ বানিয়েই সৃজনী শ্রেষ্ঠত্বের সমাপ্তি ঘটে না এমন পরিস্থিতিতে সৃষ্টির দাবি-দাওয়া কোনদিন সমাপ্ত হবে না আর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নিজের প্রাপ্য দাবি করার এক সীমাহীন অধিকার সেই সৃষ্টির অর্জন হবে আর অন্ত দাবি-দাওয়া বলতে এটিই বুবায়।

অবশ্য যদি এটি জানার আগ্রহ থাকে যে, পদমর্যাদার ভিন্নতার পেছনে প্রজ্ঞা কী? তাহলে জেনে রাখা উচিত, পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে তিনটি প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছে, যা যুক্তি ও বিবেকের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও দেবীপ্যমান, কোন বিবেকবান তা অস্বীকার করতে পারে না। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

**প্রধানত:** ইহজাগতিক বিষয়াদি, অর্থাৎ সামাজিক বিষয়াদি যেন সর্বোত্তমভাবে সম্পাদিত হয়। যেমনটি তিনি বলেন,

وَقَالُواْ لَوْلَا هُنَّا الْقُرْبَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَلَيْهِمْ أَهُمْ يَقْسِنُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُمْ نَحْنُ قَسَنَّا بِيَنْهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْجَيْوَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِهِمْ دَرَجَاتٍ لِّيُتَعَذَّزَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمِعُونَ

(সূরা আয় যুখরফ: ৩২-৩৩)

অর্থাৎ কাফিররা বলে, এই কুরআন মক্কা ও তায়েফের বড় বড় সম্পদশালী ও সর্দারদের মধ্য হতে কোন বড় মাতৰর ও ধনাত্য ব্যক্তির প্রতি কেন অবর্তীর্ণ হলো না? এমনটি হলে তা তার নেতাসুলভ মর্যাদার প্রতি সুবিচার হতো এবং একইসাথে তার প্রতাপ-প্রভাব, উত্তম ব্যবস্থাপনা ও অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই ধর্মের প্রসার ঘটতো। এক দরিদ্র মানুষকে কেন এই স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হলো, যার কাছে জাগতিক সম্পদ বলতে কিছুই নেই? (এরপর উভর স্বরূপ বলেছেন), **أَهُمْ يَقْسِنُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ** (সূরা আয় যুখরফ: ৩৩) অনাদি অন্ত বট্টনকারী খোদার রহমত বা করুণা বট্টনের কোন অধিকার

তাদের আছে কি? অর্থাৎ এটি প্রজ্ঞার মূর্ত্তি প্রতীক খোদা তাঁলার কাজ যে, তিনি কিছু মানুষকে যোগ্যতা ও সামর্থ্যও দিয়েছেন নিম্ন মানের, জাগতিক চাকচিক্যের জালে যারা আবদ্ধ থাকে, সর্দার ও সম্পদশালী আখ্যায়িত হওয়া নিয়ে অহংকারে মন্ত থাকে কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যায়। আবার কিছু মানুষকে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার পরাকার্তায় ভূষিত করেছেন। তারা সেই প্রকৃত প্রেমসম্পদের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাঁর নৈকট্যপ্রাণ্শ হয়েছেন আর এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রিয়ভাজনদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। (এরপর সামর্থ্যের তারতম্য ও চিন্তাধারার পার্থক্যের মাঝে যে প্রজ্ঞা নিহিত আছে, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন) ۱... ﴿سُرَا آيَةِ ﺟُنْ ﻖَسْمَةً مُّعِيشَةً بِيَنْ هُنْ﴾ (সুরা আয় জুন্ন: ৩৩) অর্থাৎ আমরা তাদের মাঝে কিছু মানুষকে সম্পদশালী করেছি আর কিছু মানুষকে করেছি দীনহীন, কতককে সূক্ষ্ম ও সুন্দর প্রকৃতি সম্পন্ন আর কতককে স্তুল স্বভাবের, কিছু মানুষকে আকৃষ্ট রেখেছি কোন পেশার প্রতি আর অন্যদেরকে ভিন্ন পেশার প্রতি, যেন তাদের কতক অন্যদের জন্য সহযোগী ও সেবকের ভূমিকা পালন করতে পারে। কেবল একজনের ওপর যেন বোঝা না চাপে, আর এভাবে মানবজাতির গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে থাকে। আবার বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে জাগতিক ধনসম্পদের চেয়ে খোদার কিতাব বা ঐশীগৃহ অধিক উপকারী। তিনি এলহামের প্রয়োজনীয়তার প্রতি এটি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মানুষ সামাজিক জীব। পরম্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত তার কোন কাজ সমাধা হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ রূটির কথাই ভাবুন- যাকে কেন্দ্র করে জীবন। এটি বানানোর জন্য কতটা পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়! চাষবাসের জন্য কষ্টসাধ্য শ্রম থেকে আরম্ভ করে রূটি প্রস্তুত হয়ে খাওয়ার যোগ্য হওয়া পর্যন্ত বহু পেশাজীবির সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অতএব, এটি থেকে বুঝা যায় যে, দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কতটা প্রয়োজন! এই চাহিদা পূরণের জন্য মূর্তিমান প্রজ্ঞা খোদা তাঁলা আদম সন্তানদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও যোগ্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় যোগ্যতা ও প্রকৃতিগত আকর্ষণ অনুসারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজে আত্মনিরোগ করে। যেমন- কেউ ক্ষেত্রখামার করবে, কেউ কৃষি যন্ত্রপাতি বানাবে, কেউ আটা পিঘবে, কেউ পানি আনবে, কেউ রূটি পাকাবে, কেউ সূতা বুনবে, কেউ কাপড় বানাবে, কেউ দোকান খুলবে, কেউ ব্যাবসাবাণিজ্যের উপকরণ সৃষ্টি করবে, কেউবা চাকরি করবে

আর এভাবে একে অন্যের সহযোগী হিসেবে পরম্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে যাবে। অতএব, যেখানে পরম্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা আবশ্যিক, সেখানে পরম্পরের মাঝে লেনদেনও আবশ্যিক হয়ে গেল। আর যখন লেনদেন ও আদান-প্রদানের কাজে জড়িয়ে গেল, তখন উদাসীন্যও ঘাড়ে ভর করল, যা বৈষয়িক কাজকর্মে আকর্ষণ নিমজ্জিত হওয়ার সহজাত ফলাফল। এমতাবস্থায় তাদের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত এমন একটি আইনের প্রয়োজন পড়ল, যা তাদেরকে অন্যায় অবিচার, বিরোধ, নেরাজ্য ও খোদা সম্পর্কে উদাসীন্য হতে বিরত রাখবে, যেন বিশ্বব্যবস্থায় কোন বিপত্তি বা বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়। কেননা জীবন-জীবিকা ও পারলোকিক বিষয়াদি সম্পূর্ণভাবে ন্যায়বিচার ও খোদাপ্রেমের ওপর নির্ভর করে আর ন্যায়বিচার ও খোদাভীতি বিধিবিধান বা আইনের ওপর নির্ভর করে, যাতে ন্যায়বিচারের সূক্ষ্মতা ও খোদাকে চেনা-সংক্রান্ত নিগৃত রহস্যাবলী নিখুঁত ভাবে উল্লিখিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ভুলবশত বা জ্ঞাতসারে কোন প্রকার অন্যায় বা ভাস্তি যেন তাতে না থাকে। আর এমন আইন কেবল তার পক্ষ থেকেই উৎসারিত হতে পারে, যার সত্ত্বে ভুলভাস্তি ও অন্যায় অবিচার হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং একইসাথে পদমর্যাদার দিক থেকে সে আনুগত্য ও সম্মান প্রাপ্তির অধিকারও রাখে। কেননা কোন আইন উত্তম হলেও আইন প্রয়োগকারী যদি নিজের মর্যাদার নিরিখে অন্য সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজত্ব করার অধিকার না রাখে বা যদি মানুষের দৃষ্টিতে সে সর্বপ্রকার অন্যায়, নোংরামি ও ভুলভাস্তি থেকে পরিত্রে না হয়, তাহলে এমন আইন প্রধানত চলতেই পারে না আর কিছুদিন চললেও স্বল্প সময়ের ভেতরই বিভিন্ন প্রকার নেরাজ্য ও অনিয়ম দেখা দেয় এবং কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণিত এসব কারণে ঐশ্বী গঢ়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেননা সকল পৃত পরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং সকল প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য কেবল খোদার গ্রন্থেই পাওয়া যায়, এর বাইরে নয়।

**দ্বিতীয়ত:** পদমর্যাদায় তারতম্য সৃষ্টির অপর একটি কারণ হলো, পুণ্যবান ও পবিত্রদের গুণাবলী বা সৌন্দর্য প্রকাশ করা। কেননা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠত্ব তুলনার নিরিখেই প্রকাশ পায়। যেমন তিনি বলেছেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَاعِنَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيُبَلُوْهُمْ أَيْمَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

(সূরা আল-কাহাফः৮)

অর্থাৎ ধরাপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সে সবকে আমরা পৃথিবীর ভূগণের মর্যাদা

দিয়েছি যেন পাপীদের সাথে তুলনার নিরিখে যারা পুণ্যবান, তাদের পুণ্য ও যোগ্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর স্তুলকে দেখে সূক্ষ্ম-এর সূক্ষ্মতা উজ্জাসিত হয়ে প্রকাশ পেয়ে যায়। বস্তুর প্রকৃত রূপ বিপরীত বস্তুর সাথে তুলনার নিরিখেই শনাক্ত করা যায়, পুণ্যবানদের মূল্য ও মর্যাদা পাপীদের সাথে তুলনা করলেই জানা যায়।

তৃতীয়তঃ পদমর্যাদায় তারতম্য সৃষ্টির একটি কারণ হলো, বিভিন্ন প্রকার শক্তি বা ক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো আর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা। যেমন তিনি বলেছেন, ﴿لَتَرْجُونَ رَبِّكُمْ وَقَارَأَوْ قَدْ خَلَقْتُمْ إِنَّمَا مَنْ يُنْهَىٰ عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَكُفَّارٌ﴾ (সূরা নৃহ: ১৪-১৫) অর্থাৎ তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা খোদার মাহাত্ম্য স্বীকার কর না? অথচ স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক খোদা বিভিন্ন যোগ্যতা ও বিভিন্ন প্রকৃতির (মানুষের) মাঝে যে পার্থক্য রেখেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রজ্ঞা যেন স্বীকৃত হয়। যেমন, অন্যত্র তিনি বলেছেন-

وَاللَّهُ حَقٌّ كُلُّ دُّجَانٍ مَّا فِي هُنْهُمْ مَنْ يَيْشِعُ عَلَى بَطْنِهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يَيْشِعُ عَلَى رِجْلَيْنِ  
وَمَنْهُمْ مَنْ يَيْشِعُ عَلَى أَرْجُعٍ يَخْفِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ

(সূরা আন নূর: ৪৬)

অর্থাৎ সব জীবকে খোদা তাঁলা পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কিছু প্রাণী পেটে ভর করে চলে আর কিছু দু'পায়ে ভর করে, কিছু আবার চার পায়ের ওপর ভর করেও চলে। খোদা যা চান সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বশক্তিমান। এটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, খোদা এই প্রাণীকুল সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিভিন্ন কুদরত বা শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য। এক কথায়, সৃষ্টির মাঝে প্রকৃতিগত যে ভিন্নতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে ঐশ্বি প্রজ্ঞা সেই তিনটি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ, যা আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করেছেন। অতএব, মাথা খাটোও আর প্রণিধান কর।

**ষষ্ঠ সন্দেহ:** পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের মাধ্যম তা হতে পারে, যা সর্বদা সব যুগে সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। অতএব, প্রকৃতিরূপী গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য, যা সদা উন্মুক্ত তা কখনও বন্ধ হয় না, আর এটিই পথপ্রদর্শক হওয়ার যোগ্য। এর কারণ হলো, এমন কোন কিছু পথপ্রদর্শক হতে পারে না, যার দরজা অধিকাংশ সময় বন্ধই থাকে, কেবল কোন বিশেষ যুগে খুলে!

**উত্তর:** প্রকৃতিরূপী গ্রন্থকে ঐশীবাণী বা ঐশীগ্রন্থের সাথে একই মানদণ্ডে উন্মুক্ত মনে করাই চোখ বন্ধ হওয়ার প্রমাণ। যাদের হন্দয়-চক্ষু ও বাহ্যিক চক্ষুতে কোন ক্রটি নেই, তারা খুব ভালোভাবে জানে যে, কেবল সে গ্রন্থকেই উন্মুক্ত আখ্যা দেয়া হয়, যার লেখা পরিক্ষারভাবে চোখে পড়ে আর যা পাঠ করলে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু কে প্রমাণ করতে পারবে যে, নিচৰ প্রকৃতিরূপী গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমেই কোনকালে কারো সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে? কে বলতে পারে যে, প্রকৃতিপূজার লেখনী কাউকে কখনও কোন গন্তব্যে পৌছিয়েছে? কে দাবি করতে পারে যে, আমি প্রকৃতিরূপী গ্রন্থের সব যুক্তিপ্রমাণ পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেলেছি। এটি যদি খোলা গ্রন্থ হতো তাহলে যারা এর ওপর নির্ভর করতো, তারা কেন সহস্র সহস্র ভাস্তিতে নিমজ্জিত হলো? আর একই গ্রন্থ পাঠ করে এরা কেন পরম্পর এত ভিন্ন ভিন্ন মতে উপনীত হতো যে, একজন খোদার অস্তিত্বে কিছুটা বিশ্বাস করলেও অপরজন পুরোপুরি অস্বীকারকারী? কথার কথা হিসেবে যদি আমরা এটি ধরেও নেই যে, এই গ্রন্থ পাঠ করে যে ব্যক্তি খোদার সন্তাকে আবশ্যিক মনে করে নি, সে এতটা আয়ুক্ষাল অবশ্যই লাভ করবে যে, একদিন হ্যাত নিজের ভুল বুবতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি এটি উন্মুক্ত গ্রন্থ হয়ে থাকে, তাহলে এটি দেখেও এত বড় বড় ভুল কেন হলো? আপনার মতে কি একেই খোলা গ্রন্থ বলা হয়, যার পাঠক খোদার সন্তা সম্পর্কেই মতভেদ রাখবে আর বিসমিল্লাহতেই গলদ? এটি কি সত্য নয় যে, প্রকৃতিরূপী এই গ্রন্থ পাঠ করে সহস্র সহস্র জ্ঞানী ও দার্শনিক, নাস্তিক ও প্রকৃতি পূজারী হিসেবে ইহধাম ত্যাগ করেছে বা প্রতিমার সামনে করজোড়ে কাকুতিমিনতির মাঝেই জীবন কাটিয়েছে। তাদের মধ্য হতে কেবল সে ব্যক্তিই সঠিক পথে ফিরে এসেছে, যে ঐশী বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। একথায় মিথ্যার কোন মিশ্রণ আদৌ আছে কি যে, নিচৰ এই গ্রন্থের পাঠক, যারা বড় বড় দার্শনিক আখ্যায়িত হয়েও সচেতন পরিকল্পনাকারী, সুপরিকল্পনাকারী স্রষ্টা ও অণুপরমাণু সম্পর্কে জ্ঞাত হিসেবে খোদাকে অস্বীকার করে আসছে আর অস্বীকারকারীরপেই ইহধাম ত্যাগ করেছে? খোদা কি তোমাদের এতটা বোধবুদ্ধিও দেন নি যে, যে পত্রের বিষয়বস্তুকে যদু কিছু মনে করে আর মধু ভাবে অন্য কিছু, অথচ খালেদ তাদের উভয়ের বিপরীতে ভিন্ন কোন ধারণা পোষণ করলে সে পত্রের লেখা বা বিষয়বস্তু খোলা ও স্পষ্ট আখ্যায়িত হয় না বরং সন্দেহযুক্ত, ঘোলাটে ও অস্পষ্ট আখ্যা পায়। এটি এমন কোন সূক্ষ্ম রহস্যপূর্ণ কথা নয় যা বুবার জন্য সূক্ষ্ম

বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, বরং এ এক অতি প্রাঞ্চল সত্য। কিন্তু তাদের কী চিকিৎসা করা যাবে, যারা একতরফাভাবে অঙ্ককারকে আলো আর আলোকে অঙ্ককার আখ্য দেয় আর দিনকে রাত এবং রাতকে দিন আখ্যায়িত করে? একটি শিশুও বুঝতে পারে যে, মনের কথা পুরোপুরি বলার জন্য খোদার পক্ষ থেকে যে সঠিক রাস্তা নির্ধারিত আছে, তাহলো কথার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা। কেননা মনের ইচ্ছা প্রকাশের জন্য বাকশক্তি হলো মাধ্যম। এই মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েই এক ব্যক্তি অন্যের হস্তের কথা জানতে পারে। প্রত্যেক এমন বিষয়, যা এর মাধ্যমে বোঝানো হয় না, তা পূর্ণ বোধগম্যতার স্তর হতে নীচের স্তরেই থেকে যায়। সহস্র সহস্র এমন বিষয় আছে যে, প্রকৃতি-সংক্রান্ত যুক্তির নিরিখে যদি আমরা সেসব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই, তা অসম্ভব ঠেকে আর চিন্তাভাবনার জোরে সিদ্ধান্ত করতে গেলেও ভুল করে বসি। দ্রষ্টান্তস্বরূপ জানা কথা যে, খোদা চোখ সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য আর কান শোনার জন্য, জিহ্বা কথা বলার জন্য। এসব অঙ্গের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপর দৃষ্টিপাতে এতটুকু আমরা উদঘাটন করলাম, কিন্তু প্রকৃতিগত এই যুক্তিকেই যদি আমরা সবকিছু মনে করি আর ঐশ্বী বাণীর ব্যাখ্যার প্রতি ভক্ষণে না করি, তাহলে প্রকৃতিগত যুক্তিপ্রমাণের নিরিখে আমাদের নীতি হওয়া উচিত, হালাল-হারামের পার্থক্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা, মন যা চায় তা শুনা, বা যা মুখে আসে তাই বলা। কেননা প্রকৃতির নিয়ম আমাদেরকে এতটুকু বুঝায় যে, চোখ দেখার জন্য, কান শোনার জন্য আর জিহ্বা কথা বলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তা আমাদেরকে এ প্রকাশ্য প্রতারণায় নিমগ্ন করে যে, দ্রষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি বা বাকশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন আর সকল বিধিবিধানের উদ্ধৰে। এখন ভেবে দেখা উচিত, ঐশ্বীবাণী যদি প্রকৃতির নিয়মের রহস্যাবলী উন্মোচন না করে; আর এর অস্পষ্টতাকে স্বীয় সুস্পষ্ট কথা ও পরিক্ষার বক্তব্যের মাধ্যমে দূরীভূত না করে, তাহলে নিচেক প্রকৃতির নিয়মের দাসত্ব করে এসব ভুলভান্তিতে নিপত্তি হওয়ার কতইনা আশংকা থেকে যায়। এটি খোদারই বাণী বা গ্রন্থ, যা প্রকাশ্য ও অতি স্পষ্ট শিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের সব কথা ও কর্মে গতি ও স্থিতিতে নির্দিষ্ট ও সুবিদিত সীমাবেষ্টনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে আর মানবিক শিষ্টাচার ও পবিত্র আলো লাভের উপায় শিখিয়েছে। চোখ, কান, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গের সুরক্ষার জন্য গভীর তাগাদা দিয়ে তিনিই বলেছেন।

قُلْ لِلّٰهِ مُمْنِيْنَ يَعْصُوْمِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْفُرْجَهُمْ ۝ ذٰلِكَ اَذْكَرِ لَهُمْ (সূরা আন্নূর:৩১) অর্থাৎ,

মু'মিনদের উচিত না-মহরামদের ক্ষেত্রে স্বীয় চোখ, কান ও লজ্জাস্থান সুরক্ষিত রাখা আর সকল অদর্শনীয়, অশ্রবণীয় আর অকরণীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা। কারণ এ পক্ষ তাদের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার নিশ্চয়তা দেবে অর্থাৎ তাদের হৃদয় প্রবৃত্তির হরেক প্রকার তাড়না হতে যুক্ত থাকবে। কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব অঙ্গই প্রবৃত্তির কামনা বাসনায় সুড়সুড়ি দেয় আর পাশবিক শক্তি-বৃত্তিকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেয়। দেখুন! না-মহরামদের কবল হতে বেঁচে চলার বিষয়ে পবিত্র কুরআন কত গভীর তাগাদা দিয়েছে আর কত স্পষ্টভাবে বলেছে যে, বিশ্বাসীরা নিজেদের চোখ, কান ও লজ্জাস্থানকে যেন নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর অপবিত্রতার আশংকা থাকে- এমন স্থানকাল বা পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে। অনুরূপভাবে জিহ্বাকে সত্য ও সঠিক পথে রাখার জন্য তাগাদা দিয়েছে আর বলেছে, **فُوْلُوْقُرَّا سَبِيْبِيْ**। (সূরা আল আহযাব: ৭১) অর্থাৎ, সেকথা বল, যা পুরোপুরি সত্য ও একান্ত যুক্তিযুক্ত; বাজে, বৃথা ও মিথ্যা কথার মেন এতে লেশমাত্র না থাকে। এছাড়া সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অবিলতার সাথে সঠিক ও নির্ধারিত কাজে নিয়োজিত রাখার জন্য এমন এক সম্পূর্ণ ও ভূমকীসূচক কথা সাবধানবাণী ও সতর্কবাণীস্বরূপ উল্লেখ করেছেন, যা উদাসীনদেরকে সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, **إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كُنُّ عَنْهُ مَسْوُلُونَ**। (সূরা বৰী ইস্টাইল: ৩৭) অর্থাৎ, কান, চোখ ও হৃদয়, অনুরূপভাবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শক্তি-নিয় যা মানুষের রয়েছে, এ সবের অথবা ব্যবহার করলে জবাবদিহি করতে হবে আর সকল ন্যূনাধিক্য ও কমতি-বাড়তির জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। এখন দেখ! অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সকল শক্তি-বৃত্তিকে সঠিক ও কল্যাণকর স্থানে কাজে লাগানোর জন্য কত বিশদ ব্যাখ্যা ও তাগিদ খোদার কালাম বা গ্রন্থে বিদ্যমান! আর সব অঙ্গকে পরম ভারসাম্যের ওপর ও সঠিকভাবে কার্যকর রাখার জন্য বিশদ ব্যাখ্যার সাথে কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা (অপ্রয়োজনীয়) সংক্ষিপ্ততা অবশিষ্ট নেই। প্রশ্ন হলো, এমন সবিস্তার বিবরণ ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রকৃতিকূপী (তথাকথিত) গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠা পাঠে জানা যায় কি? মোটেই নয়। সুতরাং এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর যে, খোলা ও স্পষ্ট গ্রন্থ এটি না সেটি? প্রকৃতিগত নির্দর্শনের প্রজ্ঞা ও সীমাপরিসীমা এটি বর্ণনা করেছে নাকি সেটি? সম্মানিত পাঠকগণ! ইঙ্গিতেই যদি কাজ চলতো, তাহলে মানুষকে ভাষা কেন দেয়া হয়? তোমাদেরকে যিনি ভাষা দিয়েছেন, তিনি কি কথা বলার ক্ষমতা রাখেন না? যিনি তোমাদের কথা বলা শিখিয়েছেন, তিনি নিজে কি কথা বলতে পারেন না? স্বীয় কর্মের মাধ্যমে যিনি এই ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন যে,

এত বড় বিশ্ব আকৃতিযুক্ত কোন বঙ্গের সাহায্য ছাড়া এবং কোন রাজমিস্তি, শ্রমিক ও কাঠমিস্তির সাহায্য না নিয়ে কেবল ইচ্ছার বলে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলা বৈধ হতে পারে কি যে, তাঁর কথা বলার শক্তি নেই বা শক্তি আছে ঠিকই তবে কার্পণ্যের কারণে স্বীয় উক্তির কল্যাণ হতে মানুষকে বাধিত রেখেছেন? সর্বশক্তিমান সম্পর্কে এমন ধারণা রাখা বৈধ হতে পারে কি যে, তিনি আপন শক্তিমান (প্রকাশের) ক্ষেত্রে পঙ্গের চেয়েও অধিম। কেননা একটি নিম্ন প্রজাতির প্রাণীও নিজের ধৰনি বা কর্তৃস্বরের মাধ্যমে অন্য প্রাণীদের নিজ অঙ্গিতের জানান দিয়ে থাকে, একটি মাছিও নিজের ভনভনানির মাধ্যমে অন্য মাছিকে নিজের আগমন সম্পর্কে অবহিত করতে পারে, কিন্তু নাউয়ুবিল্লাহ্! তোমাদের কথা অনুসারে এই সর্বশক্তিমান খোদার মাঝে একটি মাছি পরিমাণ শক্তিও নেই। যেখানে তাঁর সম্পর্কে তোমাদের স্পষ্ট উক্তি রয়েছে যে, তার মুখ কখনও খোলে নি আর তার কখনও কথা বলার শক্তি হয় নি। এমন ক্ষেত্রে তোমাদের বলা উচিত, সে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ, যার অন্যান্য শক্তির কথা তো জানা আছে, কিন্তু তাঁর বাকশক্তি আছে বলে কোনদিন প্রমাণ পাওয়া যায় নি! তার সম্পর্কে তোমরা কীভাবে বলতে পার যে, তিনি কোন খোলা গ্রহ তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তিনি সবিস্তারে আপন মনের ভাব প্রকাশ করে থাকবেন। বরং তোমাদের মতামতের সার কথা হলো, খোদা যে পথের দিশা দিয়েছেন, তাতে কোন কাজ হয় নি। সত্যিকার অর্থে তোমরা স্বীয় যোগ্যতা ও সামর্থের গুণে তাঁকে চিনেছে।

অধিকন্তে ঐশ্বী শিক্ষা এ অর্থে উন্মুক্ত বা খোলা হয়ে থাকে যে, সচরাচর সবার হৃদয়ে এর প্রভাব পড়ে আর সকল প্রকার প্রকৃতি এর দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হয়, বিভিন্ন ধরনের ফিতরত বা স্বভাব তা হতে উপকৃত হয় আর সকল প্রকার সন্ধানীর এর মাধ্যমে সাহায্য লাভ হয়। এ কারণেই ঐশ্বী বাণীর মাধ্যমে অনেকেই সঠিক পথের দিশা পেয়েছে এবং পায়। আর নিছক যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে অতি অল্পই পথের দিশা পায়, বরং তা না হওয়ারই মত। আর কিয়াস বা ধারণাও চায় যে, এমনই হোক। কেননা এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মানুষের সামনে যে ব্যক্তি সত্য সংবাদদাতা প্রমাণিত হয়ে পরকাল সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষানিরীক্ষা এবং দেখা বিষয়াদি বর্ণনা করে আর এর পাশাপাশি যৌক্তিক প্রমাণাদিও বোঝায়, সে সত্যিকার অর্থে দ্বিগুণ শক্তি নিজের মাঝে রাখে। কেননা তার সম্পর্কে প্রধানত এই দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় যে,

সে প্রকৃত বিষয় নিজেই প্রত্যক্ষকারী আর সত্যের চাকচুস সাক্ষী। দ্বিতীয়ত, সত্যের আলো যৌক্তিকভাবেও স্পষ্ট প্রমাণাদিতে সজ্জিত করে সে প্রকাশ করে। সুতরাং এ দু'টো প্রমাণের সমষ্টিয়ে তার বক্তৃতা ও উপদেশে এক দুর্বার আকর্ষণ-শক্তি সৃষ্টি হয়, যা বড় বড় পাষাণ হন্দয়কেও আকর্ষণ করে এবং সকল প্রকার হন্দয়ে দাগ কাটে। কেননা তার উক্তি বিভিন্ন প্রকার কথাকে বিভিন্নভাবে বুঝানোর যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে থাকে, যা বুঝার জন্য কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতা বা মেধার শর্ত নেই, বরং সম্পূর্ণরূপে কাঞ্জান বিবর্জিত ব্যক্তি ছাড়া সকল তুচ্ছ, উচ্চ, বিচক্ষণ ও অর্থব্ব ব্যক্তিও তার বক্তব্য বুঝতে পারে।

আর সে তাৎক্ষণিকভাবে সকল শ্রেণির মানুষকে অবিকল সেভাবে আশ্রিত করতে পারে, যেমনটি কিনা তাদের প্রকৃতি বা যেমনটি তাদের শক্তিসামর্থ্যের দাবি হয়ে থাকে। তাই চিন্তাধারাকে খোদামুখী করা, জাগতিকতার মোহ হতে মুক্ত করা আর হন্দয়ে পারলোকিক জীবনসংক্রান্ত বিষয়াদি প্রেরিত ও গ্রহিত করার ক্ষেত্রে তাঁর উক্তি বা বাণী ব্যাপক শক্তি রাখে। (তাঁর কথা) সেসকল সংকীর্ণ ও তমসাচ্ছন্ন ধ্যানধারণায় সীমাবদ্ধ থাকে না, যাতে নিছক বুদ্ধিপূজারীদের কথাবার্তা সীমাবদ্ধ থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এর কার্যকারিতা বা প্রভাব সার্বজনীন আর এর কল্যাণ বা উপকারিতা হয়ে থাকে পরম মার্গের। আর সকল প্রকার মানুষের হন্দয়-পেয়ালা স্বীয় সামর্থ্য বা পরিমাপ অনুসারে এতে পরিপূর্ণ হয়। স্বীয় পবিত্র গ্রন্থে আল্লাহ তা'লা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন—  
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَمْ يُكَفِّرُوا بِقَوْرَهَ (সুরা আর রাঁদ: ১৮) অর্থাৎ, খোদা আকাশ থেকে পানি অর্থাৎ স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করেছেন আর সকল উপত্যকা স্ব-স্ব যোগ্যতা অনুসারে অর্থাৎ প্রত্যেকেই তা হতে স্বীয় প্রকৃতি, ধ্যানধারণা ও যোগ্যতা অনুসারে অংশ পেয়েছে। সুমহান প্রকৃতির মানুষ প্রজ্ঞাপূর্ণ রহস্যাবলী হতে লাভবান হয়েছে আর যেসব প্রকৃতি আরও উন্নত মানের ছিল, তারা বিস্ময়কর এক জ্যোতি লাভ করেছে, যা রচনা ও বক্তৃতায় আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আর যেসব প্রকৃতি নিম্ন মানের ছিল, তারা সত্য সংবাদদাতার মাহাত্ম্য ও ব্যক্তিগত পরাকার্ষা দেখে আন্তরিক ভালোবাসার সাথে তাঁর সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এভাবে তারাও বিশ্বাসের নৌকায় আরোহন করে মুক্তির তীরে পৌঁছে গেছেন। কেবল তারাই বাইরে রয়ে গেছে, খোদা সম্পর্কে যাদের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না, যারা ছিল নিছক দুনিয়ার কীট। এছাড়া প্রভাব বিস্তারের শক্তির ওপর দৃষ্টিপাতেও এলহাম অনুসরণের রাস্তা অতি প্রশংসন্ত ও

ব্যাপক মনে হয়। কেননা যাদের জ্ঞান আছে তারা খুব ভালোভাবে জানে যে, বক্তৃতায় আশিস, আবেগ, উচ্ছ্঵াস, শক্তি, মাহাত্ম্য ও আবেদন সে অনুপাতে সৃষ্টি হয়, যতটা বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার উন্নত মানে বঙ্গ উপনীত থাকে। সুতরাং এই পরাকার্ষাও সে ব্যক্তির বক্তব্যে প্রকৃত অর্থেই বিদ্যমান থাকতে পারে, খোদা সম্পর্কে যার দ্বিগুণ তত্ত্বজ্ঞান থেকে থাকে। আর সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট যে, জোরালো বক্তৃতা যার ওপর বক্তৃতার কার্যকারিতা নির্ভর করে তা কেবল তখনই মানুষের মুখ থেকে নিঃস্ত হয়, যখন দৃঢ় বিশ্বাসের প্রেরণা ও উচ্ছ্বাসে তার হৃদয় পূর্ণ থাকে আর সে সকল কথাই কেবল হৃদয়ে আসন পাতে, যা দৃঢ় বিশ্বাসে সমন্ব্য হৃদয় থেকে আবেগ-উচ্ছ্বাসের সাথে নির্গত। সুতরাং এখানেও এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, গভীর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও এলহামের মাধ্যমে লক্ষ শিক্ষা বা তরবীয়তই দ্বার উন্মোচন করে। এক কথায়, সর্বজনীন কার্যকারিতার ও প্রভাব বিস্তারের গভীরতার দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুমাত্র ওহীর গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ও খোলা থাকা প্রমাণিত-সত্য, এ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। এ কথা প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত সত্যের চেয়ে কোনভাবেই কম নয় যে, খোদার বান্দাদের সবচেয়ে বড় হিতসাধনকারী ব্যক্তি সে-ই হয়ে থাকে, যার মাঝে এলহাম ও বুদ্ধির সমাহার ঘটে আর তার মাঝে এমন যোগ্যতা থাকে যদ্বারা সকল স্বভাব ও সব প্রকৃতির মানুষ উপকৃত হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির বলে সঠিক পথের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়, তার মাথা খাটানোর ফলশ্রুতিতে কোন ফলাফল প্রকাশ পেলেও তা কেবল সেসব বিশেষ প্রকৃতির লোকদের ক্ষেত্রেই পেতে পারে, যারা সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য সামর্থ্যবান হওয়ার সুবাদে তার সূক্ষ্ম ও সুগভীর কথাগুলো বুঝবে। অন্যরা তার দর্শনভিত্তিক কথাবার্তা বোঝার মত হৃদয় বা মনমস্তিক্ষার রাখে না। তাই তাঁর জ্ঞানের কল্যাণধারা সেই স্বল্পসংখ্যক লোকদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য, যারা তাঁর যুক্তি সম্পর্কে অবহিত, আর তদ্বারা কেবল তাদেরই লাভ হয়, যারা তাঁর মত যৌক্তিক কথাবার্তা বা বিতর্কে সিদ্ধহস্ত। যুক্তি ও সত্য এলহামের কার্যক্রমকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা হলে এ বিষয়ের প্রমাণ অতি স্পষ্টভাবে পাওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যারা প্রাচীন বিজ্ঞদের জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত, তারা ভালোভাবে জানে যে, স্বীয় শিক্ষা সর্বস্তরে প্রচারে এরা কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে আর কীভাবে তাদের অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ কথাবার্তা বা বক্তৃতা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে প্রভাব

বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের এই অধঃপতিত অবস্থার সাথে কুরআনের উন্নত পর্যায়ের প্রভাব বা কার্যকারিতাকে লক্ষ্য করলে যে, তা কীভাবে আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীয় প্রকৃত অনুসারীদের হন্দয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছে আর কত বিস্ময়করভাবে এর সুমহান শিক্ষা শত শত বছরের বদ্ধমূল অভ্যাস ও নোংরা প্রবণতাকে নির্মূল করেছে এবং এমন সব প্রাচীন কৃপথা, যা দ্বিতীয় প্রকৃতি বা মজাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, তা তাদের শিরা-ধর্মনী থেকে বের করে আল্লাহর একত্ববাদের অমৃতসুধা কোটি কোটি মানুষকে পান করিয়েছে।

সেটিই স্বীয় অসাধারণ সাফল্য এবং অতি উন্নত ও টেকসই ফলাফল প্রকাশ করে আপন অনন্য কার্যকারিতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের মাধ্যমে বড় বড় শক্তির কাছ থেকে নিজের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করেছে। এমনকি ঘোরতর অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের মনেও এর এত গভীর প্রভাব পড়েছে যে, এটিকে তারাও কুরআনের মাহাত্ম্যের প্রমাণ বলে স্বীকার করেছে। আর অবিশ্বাসে অনড় ও অটল থাকা সত্ত্বেও অবশ্যে তাদেরকেও বলতে হয়েছে যে,  
 ﴿سَمِّعُوا مِنْ حَسْرَةٍ لِّلَّهِ أَعْلَمُ﴾ (সূরা আস সাফকাত: ১৬) অর্থাৎ এটাতো কেবল এক সুস্পষ্ট যাদু। হ্যাঁ, এটি তা-ই যার সুগভীর আবেদন বা আকর্ষণ খোদার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে যা সাধারণ নিয়মের সহস্র সহস্র গুণ বেশি। এর কল্যাণে খোদার লক্ষ লক্ষ বান্দা নিজেদের রক্ত দিয়ে তাঁর একত্ববাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে চিরকাল ধরে এলহামই এই কাজের গোড়া পত্তনকারী ও পথের দিশারীর ভূমিকা পালন করে আসছে, যার মাধ্যমে মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও মেধা উন্নতি করেছে। নতুবা বড় বড় দার্শনিক ও জ্ঞানীদের জন্যও অতি কঠিন বরং অসম্ভব বিষয় যা ছিল, তা হলো অতীন্দ্রিয় বিষয়াদির সকল খুঁটিনাটি উদ্ঘাটনের এমন সুযোগ সব সময় লাভ করা, যার মাধ্যমে সেই অনুষঙ্গগুলোর অবস্থা, ব্যবস্থা ও বিশেষত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হতে পারে। মানুষের মাঝে যারা স্বল্প বোধবুদ্ধি রাখে বা চেষ্টা-সাধনার জন্য যাদের কোন উপায় উপকরণ হস্তগত হয় নি তারা তো এদের (দার্শনিক ও জ্ঞানীদের) চেয়েও বেশি অজ্ঞ ও অধম। সুতরাং এ সম্পর্কে খোদার সত্য এলহাম অর্থাৎ পরিত্র কুরআন শরীফ, বিবেক বা বুদ্ধিকে যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে আর যেসব অনিশ্চয়তার অমানিশা থেকে দৃষ্টি ও চিন্তাকে রক্ষা করেছে তা এমন একটি বিষয়, যার জন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অতএব,

সূচনাতে এলহামের মাধ্যমেই খোদার পরিচয় লাভ হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা এ কারণেই হোক যে, খোদা সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান সদা এলহামের হাতেই নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে আসছে অথবা এ ধারণার নিরিখেই হোক না কেন যে, পথের সমস্যা হতে মুক্তি পাওয়া এলহামের ওপরই নির্ভরশীল সকল বিবেকবানকে স্বীকার করতে হয় যে, যে পথ অতি স্বচ্ছ ও সোজা আর চিরউন্মুক্ত এবং নিশ্চিত গন্তব্যে পৌঁছিয়ে থাকে, তা হলো খোদার ওহী। তাই একথা মনে করা যে, এটি উন্মুক্ত বা খোলা গ্রন্থ নয় সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন ও আহাম্মকের কাজ। এ ছাড়া, ইতিপূর্বে আমরা ব্রাহ্ম সমাজীদের খোদাকে চেনা বা শনাক্ত করা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত লিখে এসেছি যে, তাদের নিচক যৌক্তিক প্রমাণাদির ওপর নির্ভরশীল ঈমান কেবল ‘হওয়া উচিত বা থাকা উচিত’ এর গভিতেই সীমাবদ্ধ। ‘আছে’ মর্মে নিশ্চিত সুমহান বিশ্বাসের মর্যাদা তাদের ভাগ্যে জোটে নি। সুতরাং এসব গবেষণার মাধ্যমেও এটিই প্রমাণিত যে, ঐশী তত্ত্ব লাভের খোলা ও স্পষ্ট পথ কেবল ঐশীবাণী বা খোদার গ্রন্থের মাধ্যমেই লাভ হয়। এ পর্যন্ত পৌঁছা এবং এটি অর্জনের অন্য কোন উপায় নেই। সদ্যজাত এক শিশুকে শিক্ষা বঞ্চিত রেখে কেবল সহজাত প্রকৃতিকূপী গ্রন্থের হাতে ছেড়ে দাও, এরপর দেখ, ব্রাহ্ম সমাজীরা যে গ্রন্থকে উন্মুক্ত মনে করে তার কল্যাণে সে কোন্ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে আর খোদাকে চেনার কোন্ পর্যায়ের মানে সে উপনীত হয়? বহু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, যদি কেউ শ্রতি-মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের সংবাদ না পায়, যার ভিত্তি হলো এলহাম। তাহলে সে বুবেই উঠতে পারবে না যে, এ বিশ্বের কোন স্রষ্টা আছেন কিনা! স্রষ্টার সন্ধানের প্রতি কেউ মনোযোগ নিবন্ধ করলেও কেবল কতক সৃষ্টি যেমন- পানি, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদিকে স্বীয় ধারণা অনুসারে স্রষ্টা ও পূজনীয় আখ্যা দিয়ে বসে, যা আদিম বন্য-লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাতে সকল যুগে প্রমাণিত হয়ে আসছে। অতএব, এটি এলহামেরই আশিস ও কল্যাণ যার সুবাদে মানুষ সেই অনন্য ও অতুলনীয় খোদাকে সেভাবে শনাক্ত করেছে যেমনটি কিনা তাঁর সম্পূর্ণ ও ত্রাণমুক্ত সত্ত্বার জন্য মানানসই। যারা এলহাম সম্পর্কে অজ্ঞ, যাদের কাছে কোন এলহামী গ্রন্থও ছিল না আর এলহাম সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন মাধ্যমও যাদের নেই। চোখ ও হন্দয় থাকা সত্ত্বেও ঐশী তত্ত্বজ্ঞান তাদের আদৌ অর্জন হয় নি, বরং ধীরে ধীরে মানবতার গভি থেকেই বেরিয়ে গিয়ে তারা প্রায় কাঙ্গালানহীন পশুর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। প্রকৃতিকূপী

গ্রন্থ তাদের কোন উপকারে আসে নি। এটি স্পষ্ট যে, যদি সে গ্রন্থ উন্মুক্ত হতো, তাহলে তা কাজে লাগিয়ে আদিম ও অসভ্য মানুষও তত্ত্বজ্ঞান এবং খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে তাদের সমান হয়ে যেতো, যারা এলহামের মাধ্যমে খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে। কেবল এই প্রকৃতিরূপী গ্রন্থের ওপরই যে নির্ভর করে আর কোন সময় এলহামের নামও যে শোনে নি, খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণরূপে অঙ্ক বরং মানবিক সভ্যতা-ভব্যতা থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িতই থাকল। সুতরাং প্রকৃতিরূপী গ্রন্থ যে বন্ধ এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

অতএব, প্রকৃতিরূপী গ্রন্থ খোলা বা উন্মুক্ত হওয়ার অর্থ যদি এটি হয়ে থাকে যে, তা দৈহিকভাবে বা বাহ্যিক দৃশ্যমান তাহলে এটি অর্থহীন বা অলীক এক ধারণা, এ বিতর্কের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা যেখানে কোন ব্যক্তি কেবল এই প্রকৃতিরূপী গ্রন্থে প্রণিধান করে ধর্মীয় জ্ঞানের কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না, এলহাম যতক্ষণ পথ প্রদর্শন না করবে ততক্ষণ খোদাকে পেতে পারে না। সেখানে কোন বস্তু সর্বদা দৃশ্যমান কিনা তা ভেবে আমাদের কী লাভ!

ঐশ্বী এলহামের দ্বার কোন যুগে বন্ধ ছিল বলে যে ধারণা রয়েছে, এর দ্বারা যদি কিছু প্রমাণ হয় তবে তা কেবল এতটুকুই যে, পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজীদের কিছুই জানা নেই আর তাদের অবস্থা কেবল সেই অঙ্গের ন্যায় যে রাস্তা ছেড়ে কোন গর্তে পড়ে গেছে, অথচ এই বলে হইচাইও করে যে, কোন দুরাচারী রাস্তায় গর্ত খুঁড়ে রেখেছে? অধিকস্তু এমন বিদ্বেষভাবাপন্ন ধ্যানধারণার মাধ্যমে এটি বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজীরা জেনেশনে সত্য গোপন করছে আর জেনেশনে একটি দৃশ্যমান ও বর্তমান বিষয়কে অস্বীকার করছে। নতুবা কী করে ভাবা যেতে পারে যে, তারা এক ছোট বালকের ন্যায় এতটা অঙ্গ হবে, যে আজ পর্যন্ত এই প্রকাশ্য সত্য সম্পর্কে কিছুই জানে না যে, সকল যুগে খোদার একত্ববাদ তাঁর এলহামের মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করেছে? অধিকস্তু ঐশ্বী তত্ত্বসন্ধানীদের জন্য আদি থেকে এ পথই উন্মুক্ত হিসেবে চলে আসছে। হে ভদ্র লোকগণ! খোদাকে কিছুটা হলেও ভয় করুন, মিথ্যায় এতটা সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না।

মানলাম, আপনাদের হৃদয়-চক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত! তবু প্রশংস্য হলো, আপনাদের বাহ্যিক চোখ গেল কোথায়? আপনারা কি দেখেন না যে, কোটি কোটি একত্ববাদী

অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী, যাদের হৃদয় একত্ববাদের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্তির সাথে পান করছে আর যাদের খাঁটি একত্ববাদের মোকাবিলায় আপনাদের বিশ্বাসে বেশ কয়েকভাবে পৌত্রলিকতার দূষণ এবং শত প্রকার জ্ঞানিচ্যুতি বিদ্যমান। তারা সেসব মানুষ, যারা ঐশ্বীবাণী বা গ্রন্থ থেকে কল্যাণরাজি লাভ করেছেন। খোদার বাণীর সেই প্রস্তবণই প্রবল বেগে প্রস্ফুটিত হয়ে দূরদূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে। এটিই ভারতের শুক্র প্রাণহীন উদ্যানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে সজীব ও সতেজ করে তুলেছে আর যারা অবশিষ্ট আছে, তাদের মাঝেও অনেকের হৃদয়ে এই পবিত্র প্রস্তবণের প্রভাব পড়েছে এবং কিছুটা হলেও তাদেরকে একত্ববাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কুরআনের শুভাগমনের পূর্বে হিন্দুদের ভ্রষ্টতা যে ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, তা সে সকল পুরাণ ও গ্রন্থাবলী পড়ে উদঘাটন করা উচিত যা লিপিবদ্ধ করার কাজ শেষ হয়েছিল কুরআন আসার মাত্র কিছুদিন পূর্বে, আর যার পৌত্রলিকতায় কল্যাণিত শিক্ষা পুরো ভারতবর্ষকে একটি বৃত্তের ন্যায় পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। (এসব পাঠ কর) যেন তোমরা জানতে পার যে, সে যুগে তোমাদের পুণ্যবান মুনি-খ্যাদীনের ধ্যানধারণা কেমন ছিল আর তোমাদের প্রিয় মুনি-খ্যাদীন কোন্ কোন্ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল আর কীভাবে তারা নিষ্প্রাণ প্রতিমার সামনে করজোড়ে বিভিন্ন প্রকার মিনতি করতো আর কীভাবে বিভিন্ন মন্ত্র পড়ে দেবতাদেরকে আহ্বান করতো। অথচ সে যুগে তারা যৌক্তিক জ্ঞানের একটি ব্যাপক অংশ করায়ত্ত করেছিল আর প্রণিধান এবং মননশীলতার ক্ষেত্রে বেদের যুগের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। বরং যুক্তি ও দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রীকদের চেয়ে কোনভাবে পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস এমনভাবে কল্যাণিত ও অপবিত্র ছিল যে, ভেতরে-বাইরে সম্পূর্ণভাবে শিরকের নোংরামিতে ছিল জর্জরিত, যাতে ঐশ্বী সত্যের লেশমাত্রও ছিল না। আপাদমস্তক তা ছিল মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অকেজো ও পরিত্যাজ্য- যে ভাবধারায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে সারা বিশ্বকে আপনাদের সম্মানিত প্রবীণরা নিজেদের উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করে রেখেছিল! দ্রষ্টান্তস্বরূপ, সতেজ-সবুজ-সুন্দর কোন বৃক্ষ দেখলে একে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করেছে, ভূমি থেকে আগুনের কোন স্ফূলিঙ্গ বের হতে দেখলে তারই ইবাদত করা আরভ করে দিয়েছে। যে বস্তুকে এর নিজ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে বিস্ময়কর বা ভীতিকর মনে করেছে তাকেই নিজের পরমেশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছে; আগুন, পানি, পাথর, চন্দ-সূর্য ও পঙ্গপাথি, কিছুই বাদ রাখে নি। সত্য কথা হলো, বেদে সৃষ্টিপূজার শিক্ষা

তখনও কিছুটা করই ছিল আর প্রতিমাপূজার কোন উল্লেখই ছিল না। কিন্তু যারা পরবর্তীতে বড় বড় যুক্তিবাদী সেজে এতে ক্রমাগতভাবে টীকা-পাদটীকা যোগ করতে থাকে, তারা শত শত কৃত্রিম পরমেশ্বর বানানোর বা নিজেরাই পরমেশ্বর সেজে বসার ক্ষেত্রে এমনই পারদর্শিতা দেখিয়েছে যে, তাদের চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণার চূড়ান্ত পরিণাম দেখুন! বিভিন্ন প্রকার উন্মাদনামূলক সন্দেহে জড়িয়ে তারা বিশ্ব পরিকল্পনাকারী খোদার প্রকৃত সত্তা ও তাঁর সব পরমোক্তর গুণাবলীকে অস্মীকার করে বসেছে। তাদের উপনিষদ, পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী হিন্দুদের হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছে আর যে সকল কুসংস্কারে তাদেরকে লিপ্ত করেছে আর যে সকল পথে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর যে বস্ত্রনিচয়ের পূজায় তাদেরকে মন্ত করেছে, তা এমন বিষয় নয় যা কারও অজানা থাকবে বা কেউ গোপন করলে গোপন থাকতে পারে বা কারও অস্মীকারে এ সত্য ঘোলাটে হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রীকদের অবস্থাও একই ছিল। তারাও বিচক্ষণ আখ্যা পেয়ে কাকের মত শিরুক বা বহুনেশ্বর পূজার আবর্জনাই ভক্ষণ করেছে। নিছক বুদ্ধি কোন যুগে খাঁটি একত্রবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন জামাত গঠন করে নি। আমি খুব ভালোভাবে গবেষণা করে দেখেছি যে, ব্রাহ্মসমাজীদের একত্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলো, তাদের প্রবীণদের মধ্য থেকে যে এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিল, সে কুরআন থেকেই কিছুটা তৌহীদের ভাগ পেয়েছিলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পুরো তৌহীদ লাভ করতে পারে নি। খোদার বাণী থেকে নেয়া সেই একত্রবাদ ব্রাহ্মসমাজীদের মাঝে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ব্রাহ্মদের কারও যদি আমাদের এই গবেষণা সম্পর্কে আপত্তি থাকে, তাহলে তার জন্য আমাদের এ প্রশ্নের প্রমাণসাপেক্ষ উত্তর প্রদান করা আবশ্যিক হবে যে, তৌহীদ বা একত্রবাদের বিষয়টি তারা কোথায় পেল? এটি কি পরম্পরাগতভাবে শৃঙ্খলার বিষয় হিসেবে এসেছে, নাকি তাদের কোন প্রতিষ্ঠাতা নিরেট বুদ্ধির জোরে আবিষ্কার করেছে? যদি শৃঙ্খলার মাধ্যমে পৌঁছে, তাহলে স্পষ্টভাবে বলা উচিত যে, পবিত্র কুরআন শরীফ ছাড়া অন্য কোন্ গ্রন্থ সে যুগে ভারতের সর্বত্র একথা প্রচার করেছিল যে, খোদা এক-অদ্বিতীয়, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির উর্ধ্বে এবং কোন দেহে অবরোহন করা ও কোন রূপ ধারণ করা হতে পবিত্র, স্বীয় সত্তা ও সকল গুণাবলীতে সর্বোৎকৃষ্ট ও অনন্য, যার কল্যাণে একত্রবাদের বিষয়টি তারা শিখেছে; সে গ্রন্থের নামও তাদের উল্লেখ করা উচিত। আর যদি এ দাবি থাকে যে, সেই প্রতিষ্ঠাতার কাছে একত্রবাদের

সংবাদ শ্রতিনির্ভর মাধ্যমে পৌছে নি বরং সে কেবল নিজের বুদ্ধির জোরে তা আবিষ্কার করেছে, এমন ক্ষেত্রে তাকে প্রমাণ করে দেখানো উচিত যে, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠাতার যুগে অর্থাৎ যে যুগে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা একটি ধর্ম প্রবর্তন করতে যাচ্ছিলেন, তখনও ভারতে কুরআনের মাধ্যমে তৌহীদ বা একত্রবাদের বিস্তার ঘটে নি। কেননা যদি পূর্বে বিস্তার ঘটে থাকে, তাহলে তৌহীদ বা একত্রবাদ খুঁজে বের করা কোন আবিষ্কার বলে গণ্য হবে না। বরং নিশ্চিতভাবে এটিই মনে করা হবে যে, এই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পরিত্র কুরআন থেকেই তৌহীদের বিষয়টি হস্তগত করেছেন।

যাহোক আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত জোরালো যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন না করবেন ততক্ষণ এটিই প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে গণ্য হবে যে, আপনারা কুরআন শরীফ হতেই আল্লাহর তৌহীদ বা একত্রবাদের বিষয়টি অবগত হয়েছেন, কিন্তু নিমকহারাম মানুষের ন্যায় অকৃতজ্ঞই রয়ে গেলেন। স্বীয় অনুগ্রহকারী ও তত্ত্বাবধায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি, বরং যাদের প্রকৃতিতে নোংরামি ও উশ্জ্বলতা বিদ্যমান, তাদের ন্যায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে অপলাপের পছ্ন বেছে নিয়েছেন। এছাড়া সকল ইতিহাসবিদ ভালোভাবে জানেন, অতীতেও যখনই কেউ খোদার নাম ও তাঁর অনুপম গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছে তা এলহামের মাধ্যমেই করেছে; কেবল যুক্তি ও বুদ্ধির জোরে কখনও তৌহীদ বা একত্রবাদের প্রসার ঘটে নি। সে কারণেই যেখানে এলহাম পৌছে নি, সেখানকার মানুষ খোদা সম্পর্কে অনবহিত এবং পশুর ন্যায় বাছ-বিচারহীন তথা আদিম ও অসভ্যই রয়ে গেছে। আমাদের সামনে এমন কোন গ্রন্থ কে উপস্থাপন করতে পারবে, যা অতীতের কোন যুগে খোদার জ্ঞানের বিবরণ-মূলে ও বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে, যাতে লেখক এই দাবি করে থাকবে যে, সে খোদাকে চেনার সঠিক পথ এলহামের মাধ্যমে অর্জন করে নি, এক-অদ্বিতীয় খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে শ্রতিনির্ভর পদ্ধতিতেও সংবাদ পায় নি, বরং খোদাকে খুঁজে বের করা ও ঐশ্বী গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও (সে সম্পর্কে) অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল নিজের বুদ্ধি, চিন্তাচেতনা, চেষ্টাসাধনা এবং ঘর্মপাতের মাধ্যমেই কার্যসম্ভব করেছে; অন্য কারণও শিক্ষা ছাড়া নিজেই একত্রবাদের বিষয়টি উদঘাটন করেছে আর মানবমস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোদা সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছে এবং খোদাকে পুরোপুরি চিনতে পেরেছে!

প্রমাণের ভিত্তিতে কে আমাদেরকে দেখাতে পারে যে, এমন কোন যুগও ছিল যখন পৃথিবীতে খোদার এলহামের নামগন্ধও ছিল না আর খোদার পরিভ্র  
গ্রস্থাবলীর দ্বার রংধ ছিল, আর সে যুগের মানুষ কেবল প্রকৃতিরগী গ্রস্থের  
সাহায্যে একত্রিত ও আল্লাহকে চেনার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে? এমন কোন  
দেশের সংবাদ আমাদের কে দিতে পারে, যে দেশের বাসিন্দারা এলহাম  
সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত থেকেও শুধু বুদ্ধির জোরে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে  
গেছে আর কেবল স্বীয় বোধবুদ্ধির বলে স্বষ্টির একত্রিতে বিশ্বাস স্থাপন  
করেছে? আপনারা অভিদের প্রতারিত করেন কেন? কেন আপনারা খোদা-  
ভীতিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে প্রহসন ও প্রতারণামূলক কথা মুখে আমেন  
আর যা অবারিত তাকে বক্ষ আর যা বক্ষ তাকে অবারিত আখ্যা দেন? প্রশ্ন  
হলো, আপনাদের সেই সর্বশক্তিমান সন্তায় বিশ্বাস আছে কিনা, যিনি  
মানবহৃদয়ের প্রকৃত চিত্ত সম্পর্কে অবহিত, বিশ্বাসযাতক শ্রেণী যার সুগভীর  
দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না? সমস্যা হলো আপনাদের ঈমানই সংকীর্ণ ও  
অঙ্ককারাচ্ছন্ন জায়গার ন্যায় যেখানে স্বচ্ছ ও নির্মল আলোর নামগন্ধও নেই।  
সে কারণেই আপনাদের ধর্মও সহস্র সহস্র প্রকার সংকীর্ণতা ও অমানিশার  
সমাহার আর এমনতর সংকুচিত ও সংকীর্ণ যে, এর কোন অংশই অবারিত  
দেখায় না। এর কোন জটিল প্রত্ব যথাযথ রূপে ও পরিষ্কারভাবে খুলেছে বলে  
মনে হয় না। আল্লাহর সন্তা সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাস কেমন ও কতটা, তা  
ইতোমধ্যে আপনাদের শ্রতিগোচর হয়েছে। বাকি থাকলো, শান্তি-পুরক্ষার  
সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাসের স্বরূপ আর প্রকৃতির আইন আপনাদের সামনে এ  
সম্পর্কে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেছে। অতএব, এক্ষেত্রেও  
হীন ধ্যানধারণা ও উন্মাদনা প্রসূত অলীক সন্দেহ ছাড়া অন্য কিছুই আপনাদের  
হাতে নেই, শান্তি-পুরক্ষারের আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি জানা তো দূরের কথা।  
প্রধানত এ কথাই আপনাদের নিশ্চিতভাবে জানা নেই যে, শান্তি-পুরক্ষার  
সত্যিই এক অবশ্যিক্তাবী বিষয় আর খোদা অবশ্যই মানুষকে তাদের কর্মের  
প্রতিফল দেবেন। যদি তা আপনাদের জানা থাকে, তাহলে যৌক্তিকভাবে  
প্রমাণ করে দেখান যে, খোদার জন্য আদম সন্তানদেরকে তাদের পরহেয়গারী  
বা সাধুতার প্রতিদান দেয়া এবং পাপীদের দুর্কর্ম ও পাপাচারিতার শান্তি দেয়া  
কেন আবশ্যক? খোদার জন্য যেখানে সমগ্র পশ্চকুলের আত্মার মোকাবেলায়  
তথা সব জীবের আত্মাকে নিশ্চিহ্ন করে মানবাত্মাকে স্থায়ীত্ব দেয়া আবশ্যক  
নয়, সেখানে বিশেষ মানুষকে শান্তি-পুরক্ষার প্রদান আর অন্যদেরকে তা হতে

বঞ্চিত রাখা তাঁর জন্য কেন আবশ্যক হবে? তোমাদের পুণ্যে খোদার কোন লাভ হয় কি আর তোমাদের পাপে তাঁর কোন কষ্ট হয় কি? যে কারণে তিনি পুণ্যে প্রশান্তি পেয়ে তাদেরকে প্রতিদান দেবেন আর পাপীদের হাতে কষ্ট পেয়ে তাদের প্রতি প্রতিহিংসাপ্রায়ণ হবেন? আর যদি তোমাদের পাপ ও পুণ্যে তাঁর ব্যক্তিগত কোন লাভ-লোকসান না হয় সেক্ষেত্রে তোমাদের অনুগত্য করা ও না করা তাঁর জন্য সমান। যদি সমানই হয়ে থাকে তাহলে এমন পরিস্থিতিতে অনর্থক কর্মফল হিসেবে শান্তি ও পুরুষার প্রদানের বিধান কী করে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে পারে? এটি কি ন্যায়সঙ্গত হবে যে, অন্যের নির্দেশ ছাড়াই কেউ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করবে, তবুও অন্যের ওপর অনর্থক তার কোন অধিকার বর্তাবে? এটি কখনও হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মধুর নির্দেশ ছাড়াই যদু কোন গর্ত খোঁড়ে বা কোন অট্টালিকা নির্মাণ করে আর যদি আমরা যুক্তির খাতিরে একথা মেনেও নিই যে, এতে মধুর প্রভূত কল্যাণ নিহিত তবুও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে মধুর জন্য যদুকে পারিশ্রমিক প্রদান করা আবশ্যিক নয়; কেননা যদুর সেই পরিশ্রম ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, মধুর অনুরোধ বা নির্দেশে নয়। তাই যেখানে আমাদের পুণ্যে খোদার কোন লাভ হয় না বরং সমগ্র বিশ্বও যদি পরহেজগার এবং পুণ্যবান হয়ে যায় তবুও খোদার রাজত্বে এতটুকুও সংযোজিত হতে পারে না; পক্ষান্তরে তাদের সবাই যদি অপকর্মশীল ও পাপাচারী হয়ে যায় তবুও তাঁর রাজত্বে অগু পরিমাণ বিপত্তিও দেখা দিতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে যদি খোদার পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি না থাকে, তাহলে নিশ্চিত করে কীভাবে বোৰো যাবে যে, তিনি আমাদের পাপ ও পুণ্যের প্রতিদান অবশ্যই দেবেন? অবশ্য খোদার পক্ষ থেকে যদি কোন প্রতিশ্রুতি থাকে তাহলে সুস্থ চিন্তাধারার সকল মানুষ নিশ্চিতভাবে জানে যে, তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবেন। নির্বোধ না হয়ে থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তি খুব ভালোভাবে জানবে যে, প্রতিশ্রুতি দেয়া ও না দেয়া কোনভাবে সমান হতে পারে না। প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যে প্রবোধ ও প্রশান্তি লাভ হয় তা স্ব-প্রস্তাবিত অলীক ধারণার মাধ্যমে লাভ হওয়া সম্ভব নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে খোদা তাঁলা বিশ্বাসীদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে-

وَالَّذِينَ امْنَأُوا وَعِبْلُوا الصِّلَاةَ سَنْدُخُلُهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدَأَ  
وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيَّاً

(সূরা আন্ন নিসা: ১২৩)

অর্থাৎ- খোদাপুণ্যবান মু'মিনদেরকে চিরস্থায়ী জাগ্নাতে প্রবেশ করাবেন, খোদার পক্ষ থেকে এটি সত্য প্রতিশ্রূতি আর কথায় খোদার চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কে হতে পারে? ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এখন নিজেই বল, নিছক ধারণা এই সত্য প্রতিশ্রূতির সমান হতে পারে কি? এ দু'টি পরিস্থিতি কখনও একরকম হতে পারে কি? একজনকে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি স্বয়ং কিছু সম্পদ দেয়ার প্রতিশ্রূতি দেন আর অপরজনকে সেই সরলপ্রাণ ব্যক্তি কোন প্রতিশ্রূতি দেন না; তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সুসংবাদপ্রাপ্ত এবং যে সুসংবাদ পায় না, তাদের উভয়ে সমান হতে পারে কি? এখন নিজেই চিন্তা কর, বেশি স্বচ্ছ, পরিক্ষার ও প্রশাস্তিকর কাজ কি সেটি যাতে খোদার পক্ষ থেকে উভয় প্রতিদানের প্রতিশ্রূতি থাকে, নাকি সেটি, যা নিছক নিজেরই পরিকল্পনার ফসল; আর খোদার পক্ষ থেকে বিরাজ করে নীরবতা? এমন বুদ্ধিমান কে হবে, যে প্রতিশ্রূতিকে প্রতিশ্রূতিশূন্যতা থেকে উভয় ঘনে করে না? এমন হৃদয়ও আছে কী, যা প্রতিশ্রূতি আদায়ের জন্য ছটফট করে না? খোদার পক্ষ থেকে যদি সর্বদা নীরবতাই বিরাজ করে তাহলে কিসের ভরসায় কেউ পরিশ্রম করবে? সে কি নিজের কল্পনারাজিকে খোদার প্রতিশ্রূতি আখ্যায়িত করতে পারে? মোটেই নয়? যার ইচ্ছা সম্পর্কে জানা নেই যে, তিনি কখন আর কীভাবে কী প্রতিদান দেবেন, নিজ থেকে কে তার কাজে দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস পোষণ করতে পারে? আর নৈরাশ্যকর পরিস্থিতিতে কী করে কেউ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে? খোদার প্রতিশ্রূতিই মানুষের প্রচেষ্টাকে বেগবান করে আর মানুষের হৃদয়ে পূর্ণ উদ্যম সঞ্চার করে থাকে। সেসবের আশায় বুক বেঁধেই বিবেকবান মানুষ এ পৃথিবীর মোহ পরিত্যাগ করে, সহস্র সহস্র সম্পর্ক, বন্ধন ও শৃঙ্খলের সাথে যোগসূত্র ছিল করে কেবল খোদার খাতিরেই। সেসকল প্রতিশ্রূতিই লোভ-লালসায় নিমজ্জিত কোন মানুষকে চিরতরে খোদার পানে টেনে আনে। আর যে মুহূর্তে এক ব্যক্তির সামনে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খোদার কথা সত্য আর তাঁর সকল প্রতিশ্রূতি একদিন অবশ্যই পূর্ণ হতে যাচ্ছে, তখনই জগতের প্রতি তার মোহ শিথিল হয়ে যায়। হঠাৎ করে সে ভিল্ল মানুষে পরিণত হয় আর ভিল্ল কোন স্থানে সে পৌঁছে যায়। সারকথা হলো, ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা কর্মের নিরিখেই হোক বা পুরক্ষারের আশায় হোক অথবা শাস্তির ভয়েই হোক না কেন, সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই একমাত্র উন্নত ও অবারিত দ্বার হলো খোদার সত্য এলহাম ও পবিত্র বাণীর দ্বার, অন্য কিছু নয়।

کلام پاک آں بیچوں دہ صد جام عِ فال را      کے کو بنیہ زال می چ داند ذوقِ ایماں را  
سےই অনন্য সন্তার পবিত্র কালাম বা বাণী তত্ত্বজ্ঞানের শত পেয়ালা উপহার  
দেয়  
যে এই সুরার স্বাদ কখনও গ্রহণ করে নি, সে কীভাবে ঈমানের স্বাদ পেতে  
পারে?

نَّجْمٌ أَسْتَ آنْكَهْ رَكُورِيْ هِمْعَمْرَ بُسْكَرْ دَسْتَ      نَّغْشِ أَسْتَ آنْكَهْ شَنِيدِسْتَ گَاهِ قُولِ جَانَالِ  
সেই চোখ, চোখ নয় যা সারাটি জীবন অন্ধত্বের মাঝে অতিবাহিত করেছে  
সেই কান, কান নয় যা কখনও প্রেমাস্পদের কথা শোনে নি।

**সপ্তম সন্দেহ:** কোন একটি ঐশ্বীগ্রহ ঐশ্বী জ্ঞানের পুরো সত্য ভাণ্ডারকে  
আয়ত্ত করতে পারে না, তাই কী করে আশা করা যেতে পারে যে, অসম্পূর্ণ  
গ্রন্থাবলী পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায়ে পৌছে দেবে?

**উত্তর:** এই সন্দেহ বা কুমন্ত্রণা কেবল তবেই মনোযোগের যোগ্য গণ্য হতো,  
যদি ব্রাহ্ম সমাজীদের কেউ স্বীয় বুদ্ধির জোরে খোদাপ্রাপ্তি বা পারলোকিক  
অন্য কোন বিষয়ে এমন কোন আধুনিক সত্য উদঘাটন করতো, যা পবিত্র  
কুরআনে উল্লেখ নেই। এমন পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে ব্রাহ্ম বন্ধুরা বড় গর্বের  
সাথে বলতে পারতেন যে, পরলোক সংক্রান্ত জ্ঞান এবং খোদা সংক্রান্ত পুরো  
সত্যের উল্লেখ এলহামী গ্রহে নেই বরং অমুক অমুক সত্য বাদ পড়েছে যা  
আমরা আবিষ্কার করেছি। যদি এমনটি করে দেখাতো, তাহলে হয়ত কোন  
নির্বাখকে প্রতারিত করতে পারতো। কিন্তু যেখানে পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে  
দাবি করছে **مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** (সূরা আল্ আনআম: ৩৯) অর্থাৎ খোদার জ্ঞান-  
সংক্রান্ত কোন সত্য এ গ্রন্থের বাইরে নয়, যা মানুষের জন্য আবশ্যিক।  
**يَتَوَاصْحَّفُ مَطْهَرَةً فِيهَا كُتُبٌ كُبِّرَةٌ** (সূরা আল্ বাইয়েনাহ: ৩-৪) অর্থাৎ খোদার রসূল  
পবিত্র গ্রন্থাদি পাঠ করেন, যাতে সকল প্রকৃষ্ট সত্য এবং পূর্ববর্তী-পরবর্তীদের  
সকল জ্ঞান বিধৃত রয়েছে। আবার বলেন, **لَذُنْ حَلَيلِ حَبِّيْرِ** (সূরা হুদ:২)  
অর্থাৎ- এ গ্রন্থের দু'টো বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য রয়েছে, প্রথমত মূর্তিমান  
প্রজ্ঞা। সুদৃঢ় যুক্তিতে সুসজ্জিত করে অর্থাৎ প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জ্ঞানের আদলে আল্লাহ  
তা'লা এটি বর্ণনা করেছেন, কাহিনী বা গল্প-গাঁথা হিসেবে নয়। দ্বিতীয় সৌন্দর্য  
বা বৈশিষ্ট্য হলো, এতে পরলোক সংক্রান্ত জ্ঞানের সকল প্রয়োজনীয় দিক

বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পুনরায় তিনি বলেন ﴿إِنَّكَ قَوْلُ فَصْلٍ وَّمَا هُوَ بِالْهُدْلِ﴾ (সূরা তারেক: ১৪-১৫) অর্থাৎ পরলোক সংক্রান্ত বিষয়ে যত বিতর্ক দেখা দিতে পারে এ গ্রন্থ তার প্রত্যেকটির মীমাংসা দিয়ে থাকে। এটি অলাভজনক বা অর্থহীন কিছু নয়। আবার তিনি বলেন ﴿لَهُمُ الْأَلْيَ اخْتَفَوْيِهِ وَمَّا تَنْذَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتْبَ إِلَّا تَنْبَئُنَ لَهُمُ الْأَلْيَ وَرَحْمَةً لَعَوْرَيْ يُؤْمِنُونَ﴾ (সূরা নহল: ৬৫) অর্থাৎ আমরা এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যেন অসম্পূর্ণ বা দুর্বল বুদ্ধির ফেরে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে বা ইচ্ছাকৃত বাড়াবাড়ি অথবা ওদাসীন্যের ফলশ্রুতিস্বরূপ যা দৃশ্যপটে এসেছে তা দূরীভূত করে বিশ্বাসীদেরকে সঠিক রাস্তা দেখানো সম্ভব হয়। এখানে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আদম সত্ত্বানের বিভিন্ন কথার মাধ্যমে যে বিশ্রংখলা ছড়িয়েছে, তার সংশোধনও ঐশী বাণীর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সেই বিকৃতি, যা বাজে ও ভ্রান্ত কথা এবং বাজে মন্তব্যের জের হিসেবে জন্ম নিয়েছে, তার সংশোধনের জন্য এমন বাণী বা ধর্মীয় সাহিত্যের প্রয়োজন, যা হবে সকল জ্ঞান-বিচুতি থেকে মুক্ত। কেননা এটি স্পষ্ট একটি বিষয় যে, কোন কথার মাধ্যমে যে পথ হারায়, সে কেবল কালাম বা সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা বা কথার মাধ্যমেই পথে ফিরে আসতে পারে। নিচেক প্রকৃতির অঙ্গুলি-নির্দেশ ধর্মীয় বিতঙ্গার অবসান ঘটাতে পারে না আর অষ্টকেও তার অষ্টতার জন্য সন্দেহাতীতভাবে দোষারোপ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারক যদি বাদীর সব কথা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ না করে আর বিবাদীর যুক্তিসমূহ সুনিশ্চিত যুক্তিপ্রমাণাদির মাধ্যমে খণ্ডন না করে, তাহলে এটি কী করে সম্ভব যে, কেবল তার ইঙ্গিতে উভয় পক্ষ তাদের স্ব স্ব প্রশংসন, আপত্তি ও অভিযোগের উভর পেয়ে যাবে? এমন অস্পষ্ট ইঙ্গিত, যার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে কোন পক্ষের আপত্তির নিরসন হয় না, তা কী করে চূড়ান্ত কথা হতে পারে? অনুরূপভাবে, খোদার যুক্তিপ্রমাণ বান্দাদের কাছে কেবল তখনই পূর্ণ প্রমাণ বলে গণ্য হবে, যদি ভ্রান্ত সব বক্তৃতার প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপত্তিত লোকদেরকে সঠিক ও উৎকৃষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয় আর যুক্তিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে তাদের ভ্রষ্টতা তাদের সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়, যেন জানার পরও যারা বিরত হয় না আর ভ্রান্তি পরিত্যাগ করে না, তারা শাস্তিযোগ্য আখ্যা পায়। কোন ব্যক্তিকে খোদা তালা অপরাধী চিহ্নিত করে ধৃত করবেন এবং শাস্তি দিতে উদ্যত হবেন কিন্তু স্পষ্ট যুক্তির মাধ্যমে সে ব্যক্তির নিরপরাধ হওয়ার যুক্তিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবেন না, আর তার মনের

সন্দেহ-সংশয়কে পরিষ্কার যুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করবেন না- এটি কী তাঁর ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত হতে পারে? আবার এই দিকে দ্বিতীয় আয়াতে ইঙ্গিতও করেছেন **هُدَىٰ لِلّٰئٰسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ** (সূরা আল বাকারা: ১৮৬) অর্থাৎ কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত যে ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তার প্রতি পথনির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত জ্ঞানের যেসব দিক প্রথমে কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপে চলে আসছিল, তা বিশদরূপে বর্ণনা করে। তৃতীয়ত যে সকল বিষয়ে মতভেদে ও বিভঙ্গ দেখা দিয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ করে। আর এই সম্পূর্ণতা সম্পর্কে বলেন, **وَكُلُّ شَيْءٍ يُعَصِّلُهُ تَقْصِيرًا** (সূরা বনী ইস্মাইল: ১৩) অর্থাৎ এ গ্রন্থে সকল প্রকার ধর্মীয় বিষয়াদি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের আংশিক নয় বরং পূর্ণসীন উন্নতি হয়। কেননা এটি সে সকল মাধ্যম বাতলে দেয় এবং এমন সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করে যার মাধ্যমে পুরোপুরি উন্নতি সাধন হয়। পুনরায় বলেন-

**وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًىٰ وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ**

(সূরা আন্নাহল: ৯০)

অর্থাৎ ধর্মীয় সকল সত্য কথা স্পষ্ট করার জন্য আমরা তোমার প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি আর যেন আমাদের এই স্পষ্ট বিবরণ খোদার আনুগত্যকারীদের জন্য পথনির্দেশনা ও আশীর্বাদের কারণ হয়। পুনরায় বলেন- **أَلَّا كَلِّيْبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى التَّوْرِ** (সূরা ইব্রাহীম: ২) অর্থাৎ তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে প্রবিষ্ট করাবে, এ উদ্দেশ্যেই আমরা তোমার প্রতি আমাদের এই মহা মর্যাদাশীল গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের মনে যেসব কুমন্ত্রণা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয় কুরআন এর প্রত্যেকটি দূরীভূত করে, সকল প্রকার রূপ ধ্যানধারণার অবসান ঘটায় এবং উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের আলো দান করে। অর্থাৎ খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর সন্তান দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান ও তত্ত্ব লাভ হওয়া প্রয়োজন, তার সবই দান করে। পুনরায় বলেন-

**مَا كَانَ حَلِيلًا يُفَتَّرِي وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي يَدْعُوهُ وَ تَقْصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًىٰ وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**

(সূরা ইউসুফ: ১১২)

অর্থাৎ- কুরআন এমন গ্রন্থ নয় যা মানুষ রচনা করতে পারে, বরং এর সত্যতার লক্ষণ স্পষ্ট। কেননা তা পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীকে সত্য প্রমাণ করে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর যে সকল সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সেসব কিতাবে স্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান ছিল না, কুরআন এর প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছে আর সেসবের শিক্ষাকে পরম মার্গে পৌঁছিয়েছে। সেই সাথে এসব গ্রন্থকে এমনভাবে সত্য প্রমাণ করেছে, যার মাধ্যমে এর নিজের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এর সত্যতার দ্বিতীয় নির্দর্শন হলো, এটি সকল ধর্মীয় সত্য বর্ণনা করে আর সে সকল বিষয় উপস্থাপন করে যা পূর্ণ হিদায়াত পাওয়ার জন্য আবশ্যিক। মানুষের জ্ঞান এতটা ব্যাপক ও সর্বব্যাপী হওয়া যে, কোন ধর্মীয় সত্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব এর বাইরে থাকবে না- এটি মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে আর এই নিরিখেই এটি কুরআনের সত্যতার নির্দর্শন সাব্যস্ত হলো। এক কথায়, এসব আয়াতে আল্লাহ তাঁলা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, কুরআন শরীফ পূর্ণ সত্যের সমাহার আর এর সত্যতার এটিই মহান প্রমাণ। এ দাবির পর শত শত বছর কেটে গেছে, আজ পর্যন্ত ব্রাহ্ম প্রমুখরা এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখ খুলতে পারে নি। উন্নাদ ও পাগলের ন্যায় অনর্থক ও অমূলক সন্দেহ প্রকাশ করা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, সরলপ্রাণ ও সৎ লোকদের মত এমন লোকদের সত্যের সন্ধান করা আদৌ পছন্দ নয়, বরং অবাধ্য প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা কোনভাবে খোদার পবিত্র শিক্ষা বরং খোদা হতেই অব্যাহতি লাভ করার ফলদ্রুলিকরে মগ্ন। এই স্বাধীনতা কুক্ষিগত করার জন্য খোদার সত্য কিতাব যার সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট, তা থেকে এরা এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যে, বঙ্গ হিসেবে ভদ্রতার সাথে কথাও বলে না আর শ্রোতা হিসেবে অন্য কারও কথাও শোনে না। কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে এমন কে আছে, যে কোন সময় কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন ধর্মীয় সত্য উপস্থাপন করেছে, যার কোন উত্তর কুরআন দেয় নি বরং খালি হাতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে? কুরআন যেখানে ১৩০০ বছর ধরে দ্ব্যুর্থহীন ভাষায় দাবি করে আসছে যে, এটি সকল ধর্মীয় শাশ্঵ত সত্যে সমৃদ্ধ, সেখানে যাচাই না করেই এমন সুমহান গ্রন্থকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা নেওঁরা প্রকৃতিরই পরিচায়ক। আর এটি কেমন অহংকার যে, কুরআন শরীফের বিবৃতি গ্রহণ করে না অথচ এর দাবিও খণ্ডন করে দেখায় না। সত্য কথা হলো, এদের মুখে কখনো কখনো খোদার উল্লেখ এসেই যায় কিন্তু তাদের হৃদয় জাগতিক নোংরামিতে কলুষিত। কোন ধর্মীয় বিতর্ক আরঙ্গ করলেও পুরোপুরি এর সমান্তি টানতে চায় না, বরং তড়িঘড়ি সকল অসমাঙ্গ আলোচনার অপমৃত্যু ঘটায়, পাছে

সত্য না আবার প্রকাশ পেয়ে যায়। এছাড়া লাজলজ্জার মাথা খেয়ে, ঘরে বসে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থকে দুর্বল আখ্যা দেয়, যা অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে বলেছে **الْيَوْمَ أَبْلَغْتُ لِمَنْ دِينَكُمْ وَأَنْهَى عَلَيْكُمْ بُعْدَى** (সূরা আল্-মায়েদা: ৪) অর্থাৎ আজ আমি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করে ধর্মীয় জ্ঞানকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়েছি আর বিশ্বসীদের জন্য স্বীয় সকল নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছি। হে লোক সকল! তোমরা কী খোদাকে আদৌ ভয় কর না? চিরকাল কি এভাবেই বেঁচে থাকবে? এই মিথ্যা চেহারার ওপর একদিন কী অভিশাপ নেমে আসবে না? আপনারা যদি কোন বড় মানের প্রমাণ নিয়ে বসে থাকেন, যা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হলো, আপনারা হাড়ভাঙ্গ পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সুগভীর গবেষণা করে তা সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের মিথ্যা ধারণা অনুসারে কুরআন শরীফ সেই সত্য উপস্থাপনে ব্যর্থ! তাহলে দোহাই! সকল ব্যাবসাবাণিজ্য পরিহার করে সেই সত্য আমাদের সামনে উপস্থাপন কর যেন আমরা কুরআন শরীফ থেকে তা বের করে তোমাদেরকে দেখাতে পারি। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে তোমাদের মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি এখনও আপনারা কুধারণা পোষণ ও বাগাড়স্বর পরিহার না করেন আর ধর্মীয় বিতর্কের সঠিক পছ্হা অনুসরণ না করেন, তাহলে এছাড়া আর কী বলব যে, লান্নাতুল্লাহে আলাল কামেবীন।

الا اے کمر بستہ بر افڑا مکش خویشن را به ترک جیا  
হে মিথ্যা অপবাদ আরোপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি, সাবধান! নির্জন আচরণের  
মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করো না

بِحَاسَانِ حَقٍّ كَيْنَهُ ات ۝ كُلُّ گے شِرْمَت آئِد ز گیهَل خدا  
খোদার মনোনীত বান্দাদের সাথে তুমি কতদিন শক্রতা প্রদর্শন করবে?  
বিশ্বপ্রতিপালকের সামনে তোমার কোন সময় তো অন্ততপক্ষে লজ্জা করা  
উচিত

چু চীزے بود روشن اندر ہی برو هچ بندی بود اہی  
যদি কোন জিনিস অনেক উন্নত প্রমাণিত হয় (উজ্জ্বল), তাহলে এর উপর  
তোমার অপবাদ আরোপ করা নির্বুদ্ধিতার শামিল।

چু بر نیک گوهر گمال بد برى بد انند مردم که بد گوهری  
যদি তুমি কোন নেক মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ কর, তাহলে মানুষ বুবাবে  
যে, তুমি নিজেই মূলত পাপিষ্ঠ।

چو گوئی در پاک را پُر غبار غبار دو چشمت شود آشکار  
پاک پَبِيرکے یہ دی تُومی ڈولی ملین آخِدیا دا او، تاہلنے اِر مادھیمے تو ماں اِر  
چو خِرِ الْ باپ سا ہو یا اِسی پر کاش پا بے ।

سخن ہائے پُر خبث و بے مغز و خام بود بر خیشان نشانے تمام  
نُورا، اسٹونس اِر شُنیج و ارٹھیں کथا بارتاً رِسِی سبھی نُورا دِر نُورا میرا هی  
پرماغ

ندانید گفتُن سخن جُز دروغ بِحق ندارد دروغ فروع  
تُومی میخُدیا کথا چاڑا آر کی ہوئے بَل تے جان نا، کیسے ساتھے رِسِی سامنے میخُدیا  
عُلّا تی کر راتے پارے نا ।

نیارید یاد از حق بیکپُول پندا او فقاد سُت دُنیا کے دُوں  
تُومی اننے خُودا کے سُمران کر نا، ارٹھیں پُر خیشانی تُوماں اِر پریَو بَسُوتے  
پاریگت ہو یے چے

بِ دُنیا کے دل بِ بند چرا کہ ناگاہ باید شدن زیں سرا  
اِسی پُر خیشانی کے مانو ی کِن بَالو یا سَبِی؟ کِن نا اِک دِنِ ہتھا اِسی  
سُنگھانکے ہوئے یہتھے یہتھے ہو یے ।

سرانجام ایں خانہ رُج سُت و درد بِ بیکپُش نیارید مردانِ مرد  
اِسی گھرِ پرِیگا م دُو خ و وِ بَدِن نا چاڑا آر کی ہوئے نا،  
سُپُور کھر را تار چلنا یا پا دِن نا ।

بدیں گل میالائے دل چوں خے کہ عہد بقاش نماند بے  
اِتھر دِر نیا یا اِسی کا دار مادھیمے ہو دیا کے کل عُذیت کر را نا । کِن نا اِر  
جیو بن انکے بَشی دیو ی نا ।

زمانِ مکافات آید فراز تو برعیشِ دنیا بدیں ساں مناز  
شاہنی-پُور کھر رِسِی سماں یو یو اسی یو، اِہ جاگتیک جیو بن نیو اِت اہنگ کار  
کر را نا

فریبے مخور از زر و سیم و مال کہ ہر مال را آخر آید زوال

স্বর্ণ, রৌপ্য ও সম্পদের চাকচিকে প্রতারিত হবে না কেননা সকল সম্পদ  
চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষয়মান-লয়শীল ।

ন আৰদে ইম দ নে বানুড ব্ৰিম তৰি আদিম দ তৰি ব্যন্দি  
আমৱা কিছু সাথে আনি নি আৱ সাথে নিয়েও যাবো না । আমৱা রিক্ত হস্তে  
এসেছি আৱ রিক্ত হস্তেই চলে যাৰ

আলাটা নে তাবি সৰ আৰ রুয়ে দোষট জৰানে নিৰ্যাদ বৰ্ক মুক দোষট  
সাবধান ! বন্ধুৰ প্ৰতি অবজ্ঞা প্ৰদৰ্শন কৰাৰে না সমগ্ৰ বিশ্বজগত বন্ধুৰ একটি  
চুলেৰ সমানও নয় ।

খন্দায়ে কে জাল বৰো দ ফৰা নে যাবি রেশ জৰু পৈ মস্তকী  
সেই খোদা, যাৱ জন্য আমাদেৱ প্ৰাণ নিৰেদিত তাঁৰ পথ তুমি মুস্তকীৱ  
অনুসৰণ ছাড়া পেতে পাৱ না ।

ابوالقاسم آل آفتاپ জহান কে রুশ শদ আزو জমিন দ জমান  
আবুল কাসেম বিশ্বেৰ সেই জ্যোতি যাৱ মাধ্যমে পৃথিবী ও সকল যুগ  
আলোকিত হয়ে গেছে ।

بِشَرٍ كَيْ بُدِيَ ازْ مَلَكْ نَيْكَ تَرْ نَهْ بُودِي أَغْرِ چَوْنْ مُحَمَّدْ بَشِرْ  
মুহাম্মদ (সা.) এৱ ঘত মানুষ যদি সৃষ্টি না হতেন তাহলে মানুষ যে ফিরিশতার  
চেয়ে উত্তম তা কোনভাৱে প্ৰমাণিত হতো না ।

نَيَّيِدْ تَرَا شَرَمْ ازْ كَرْدَگَارْ كَهْ إَلَيْ خَرْ باشِيْ دْ باوْقَارْ  
খোদার সামনে কি তোমাৱ লজ্জা হয় না ? কেননা তুমি বুদ্ধিমান ও সম্মানিত ।  
پس آنگه شوی منکر آل رسول که یا بد ازو نور چشم عقول  
তা সত্ত্বেও তুমি সেই রসূলকে অস্বীকাৰ কৰা যাৱ কল্যাণে বিবেক তত্ত্বজ্ঞানেৰ  
জ্যোতি লাভ কৰে ।

ز سه و زغفلت رهیده نه ز طور بشر پاکشیده نه  
তুমি ভাস্তি ও ঔদাসীন্য হতে মুক্ত হও নাই, মানবীয় অভ্যাস ও রীতিনীতি  
থেকে তুমি মুক্ত হও নাই ।

নিয়ে র তো কারি রবِّ العبادِ مکن داورِ یہا ز جبل و عناد  
খোদার কাজ করা তোমার জন্য সম্ভব নয়, অঙ্গতা ও শক্রতাবশত বাগড়া  
করো না।

مدانِ ناقص و ابکش چوں جمادِ کمالِ خدا را میغلن زیاد  
খোদাকে জড়বস্তুর ন্যায় দুর্বল ও বোৰা মনে করো না আৱ তাঁৰ পৱাকাষ্ঠাকে  
স্মৃতি থেকে মুছে ফেল না।

تو خودِ ناقصِ و دُنيِ الصفاتِ منه تهتِ نقشِ بر پاکِ ذاتِ  
তুমি স্বয়ং অসম্পূর্ণ, ইতৱ ও হীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুতৱাং পৰিত্ব সন্তাকে  
ক্রটিৰ দোষে দোষারোপ করো না।

خیالاتِ بیپوده کردم تباہ خود از پائے خود او فنادی بچاہ  
বাজে ধ্যানধারণা তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তুমি স্বয়ং হেঁটে গিয়ে কুঁয়ায়  
পড়েছ।

خيالات شے هست تاریک و تار فزووده برآں شب زکیں صد غبار  
তোমার ধ্যানধারণা অঙ্ককার রাতের ন্যায়, তমসাচ্ছন্ন সেই রাতের ওপর  
তোমার বিদ্বেশ আৱও ধূলোলেপন করেছে।

نه دل را چو و دُزاداں بشب شاد گُنْ بترس و زِ روزِ سزا یاد گُنْ  
হৃদয়কে চোরদের ন্যায় রাত নামার কারণে আনন্দিত করো না বৰং ভয় কর  
আৱ শান্তিৰ দিনকে স্মরণ কৰে।

اگر در ہوا ہچھو مرغائی پری و گر برسر آب ہا بلڈری  
যদি তুমি পাখিদের ন্যায় বাতাসে উড় এবং পানিতে সাঁতার কাট,  
و گر ز آتش آئی سلامت بروں و گر خاک را زر گُنی از فسون  
এবং আগুন হতে নিরাপদে বেরিয়ে আস আৱ যাদুৱ মাধ্যমে মাটিকে স্বর্ণও  
বানিয়ে দাও,

نیاری که حق را گُنی زیر و پست مکن ژاژ خائی چو مجnoon و مست  
সত্যকে তুমি আদৌ পৱাস্ত ও ব্যৰ্থ কৰতে পাৱবে না, সুতৱাং উন্নাদ ও  
নেশাঘাস্তদেৱ ন্যায় অপলাপ করো না।

خدا ہر کر را کرد مهر منیر نہ گردد ز دست تو خاکِ خیر  
خُودا یا کے عজّل سُر্যَ بانیِ چن سے تومارِ ہاتھِ تُو چھ ماتیتے پریشان  
ہتھے پارے نا ।

دلِ خود بہرزا مسوز اے دنی نہ کاہد ز کمر تو افزودنی  
ہے ایتھر! نیجزِ ہدایت کے انرثک جنالی و نا । بردھماں جینیس تومار  
دُرْتَارِ جو رہاس پتے پارے نا ।

بہارست و باد صبا در چن کند نازہا با گل و یاسمیں  
بمسنوت کال آر پرتاٹ سفیران گولپ و چاملی فُلے ر ساٹھے ہاگانے نُتی  
کرے چلنے چھ ।

زنسرین و گلہائے نصل بہار نسیم صبا مے وزد عطر بار  
نا ساریں و بمسنوت انیان ی فُلے ر سو را بند سُور بنت مُدُعِمَند ہاتھ پریشان  
ہتھے ।

تو اے الہ افتادہ اندر خزان ہم برگ افسانہ چوں مغلسائیں  
ہے نیراؤ! سکل پاتا ہاری رے تُو می نیر بال بندے ر نیا ر یکارا تے (ہمسنوت کال)  
نیز س پڈے ر یکارا تے ।

ب قرآن چرا بر سر کیں دوی نہ دیدی ز قرآن مگر نیکوی  
شکر تابش ت کو ر آنے ر و پر کن هاملا کر را تے تُو می کی کو ر آنے کو ان  
تال کथا دیکھ نی?

اگر نامے در جہاں ایں کلام نمانے ب دنیا ز توحید نام  
یادی پُرثیبیاتے کو ر آنے ر آساتو تا ہلے پُرثیبیاتے اک تھبادے ر نام و  
ٹاکت نا ।

جہاں بُود افتادہ تاریک و تار از و شد مُنور رُخ ہر دیار  
پُرثیبی اونکارے نیمیجیت ہیل، ار ما دھیمے سکل دشی آلوکیت ہیکھے ।  
ب توحید رائی ازو شد عیاں ترا ہم خبر شد کہ ہست آں یگاں  
اڑ ما دھیمے اک تھبادے ر پٹھ پر کاشیت ہیکھے । تُو می و ابگات ہیکھے مے،  
تینی انیان ی خُودا ।

و گرنه بہ میں حال آبائے خویش بہ انصاف بنگر درآں دین و کیش  
ناتুবা তোমার পূর্বপুরুষদের অবস্থা দেখ, ইনসাফের সাথে তাদের ধর্ম ও  
মাযহাবের প্রতি লক্ষ্য কর।

بود آں فرومایه بدگوہرے کہ از منعم خود بتا بد سرے  
سے ب্যক্তি ইতর ও পাপিষ্ঠ হয়ে থাকে যে স্বীয় অনুগ্রহকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ  
করে।

ز اندازه خویش برتر پر پڑ্ছے گُل چوں ندانی هنر  
সাধ্যের বাইরে উড়ার চেষ্টা করো না। যদি দক্ষতা না থাকে তাহলে ডাক্তার  
সাজার চেষ্টা করো না।

یقین داں کہ ایں کار یزدانی است نہ از دخل و تدبیر انسانی است  
নিশ্চিত جেনো এটি খোদার কাজ মানবীয় প্রচেষ্টার এতে কোন ভূমিকা নেই।

شد ایں دیں بفضل خدا ارجمند نہ کار فریب است و سالوس و بند  
আল্লাহর কৃপায় এ ধর্ম বড় মহিমাপূর্ণ, প্রতারণা, ধোঁকা ও জোর  
জবরদস্তিমূলক কোন কাজ নয়।

درخشد درو نور چوں آنفاب تو کوری نبی بین اش زیں حباب  
এর আলো সূর্যের ন্যায় দিস্তিমান কিন্তু চোখের পর্দার কারণে তুমি দেখতে পাও  
না।

بہ ناپاکی دل مشو بدگماں و گر مجھت است بنا عیاں  
হৃদয়ের নোংরামির বশে তুমি সন্দেহ পোষণ করো না, যদি তোমার কোন  
পরিকার যুক্তি থাকে তবে তা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন কর।

بہ شوق دل آویختن را باز پس آنگہ بہ میں قدرت کارساز  
আন্তরিক আঞ্চল নিয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, এরপর সর্বশক্তিমান  
খোদার শক্তি দেখ।

گزیں گুন ز قومت یکے انجمن کے بایک تن از ماں دن یک سخن  
তুমি তোমার জাতি থেকে একটি দল নির্বাচিত কর যেন আমরা এক-অভিন্ন  
কথায় এক দেহ-তুল্য হয়ে যেতে পারি।

بما هست نصلِ خداوند پاک ز باطل پرستان نداریم باک  
خُودا را مهانَ انوغّاه آماده را ساخته آছে。آمّارا مিথ্যا پূজারিদেরকে ভয়  
করি না।

بجوش است فیضِ احمد در دلم که تا بندِ ہر طالبے کلسلم  
آمّارا هدایہ اک-اُدیتیّی خُودا را کلّیاندھارا را اکٹی عُظُّوّس بیراجمّان،  
آمّی سکل سانکناری پاوار را شیکل لِّقّن کرتے عُدیّت।

خدا را در لطفها هست باز نسیم عنایات در اهتزاز  
خُودا را انوغّاهه را در عُلُوّک و بِرْ تَّار انوغّاهه را مُدُومند سُورَّتیت باتاس  
بَهْیَهه!

کے کو بتا بد سر از عدل و داد کُجا دم زند پیش صدق و سداد  
اینساک و نیاپیوچا را کے یے لجّان کر رے سے کیا بآبے سতّی و ساتّاتا را  
مُعْوَّذِی هওয়ার سাহস دেখাতে پারে؟

کلام خدا ہر دم از عزّ و جاه کند روئے ناشر مسارش سیا  
خُودا را باپی سدّا سُبیّ سমান و پ्रتاقپেر ساخته تار نیلّجج مُعْوَّذِی کالیما  
لِپِن کر رهے!

چسائ رائے شخصے بگردد بلند که طغیانِ نفسش بگردن گفند  
سےই ب্যক্তির মতামতের কী-বা মূল্য থাকতে পারে যাকে তার প্রবৃত্তির তুফান  
পরাভূত করে রেখেছে?

دلِ پاک و جولانِ فکر و نظر دو جو هر بود لازم یک دگر  
هدایہর پবিত্ৰতা এবং চিন্তাধারার প্রথৰতা, দুটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য যা একসাথে  
কাজ করে বা যার একটি অন্যটির সাথে অঙ্গসীভাবে জড়িত।

چو صوفِ صفا در دل آمینتند مدّاد از سوادِ عیون ریختند  
যখন آمّارا آماده را هدایہ پবিত্ৰতাৰ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করি তখন এটিকে সেই  
কালিৱ সাথে মিশ্রিত করি যা চোখ থেকে উৎসারিত হয়।

خدا آفریدت زیک مُشت خاک خودت داد نان تا گردي ہلاک

খোদা তোমাকে একমুর্ছি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তিনি স্বয়ং তোমাকে  
খাবার দিয়েছেন, যেন তুমি কোথাও ধ্বংস না হয়ে যাও ।

بہر حاجت گشت حاجت روا کشود از ترجم دو دست عطا  
تومار سکل چاہیدا پورণেر دا یاڑتی نینی نیয়েছেন آر انوخته بشত تاں  
উদারতার উভয় হাত তোমার জন্য খুলে দিয়েছেন

چ پاداشِ جُوش چنیں میدهی که در علم خود را نظریش نہی  
তুমি কি তাঁর দানের প্রতিদান এভাবে দিচ্ছ যে, নিজের ধারণা অনুসারে তুমি  
তাঁর সমকক্ষ সেজে বসে আছ?

چ خود را برابر گئی باخدائے تفو بر چنیں عقل و ادارک و رائے  
তুমি নিজেকে কীভাবে খোদার সমকক্ষ মনে করতে পার? এমন বুদ্ধি, বিবেক  
ও মতামতের জন্য পরিতাপ ।

خدا چوں دلے را به پستی گند بکوشش نیاریم کردن بلند  
খোদা যখন কোন হৃদয়কে লাঞ্ছনার গহবরে নিক্ষেপ করেন, আমরা তাকে  
নিজেদের চেষ্টায় তা হতে বের করতে পারি না ।

بکوشیم و انجام کار آں بود که آں خواهش و رائے یزداں بود  
আমরা চেষ্টা করি কিন্তু ফলাফল তাই হয় যা খোদার মতামত ও ইচ্ছা হয় ।

**অষ্টম সন্দেহ:** মানুষ খোদার সাথে কথা বলতে পারে বলে মনে করা ভদ্রতা ও  
শিষ্টাচার বহির্ভূত ধারণা । নশ্বর সৃষ্টির চিরস্থায়ী সন্তার সাথে কীইবা সামঝস্য!  
চিরস্থায়ী জ্যোতির সাথে মাটির চেলার কী সাদৃশ থাকতে পারে?

**উত্তর:** এটিও সম্পূর্ণভাবে অমূলক ও অর্থহীন একটি সন্দেহ । এর  
মূলোৎপাটনের জন্য এ কথা বোঝাই যথেষ্ট যে, যে দয়ালু ও করুণাময় সন্তা  
আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে তাঁকে চেনার অশেষ প্রেরণা  
জুগিয়েছেন আর তাঁর ভালোবাসা, তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট আর তাঁকে পাওয়ার  
এমন আকুল আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন যে, এমন কী তারা আপন সন্তা থেকে  
সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে খোদা তাদের সাথে বাক্যালাপ  
করতে চান না মনে করা একথার নামান্তর যে, তাদের সকল প্রেম ও

ভালোবাসাই ব্থা আর তাদের সকল আবেগ একতরফা কল্পনা বিলাস বৈ কিছু নয়! কিন্তু এমন কথা যে কতটা অসার, তা কিছুটা হলেও ভেবে দেখা উচিত। প্রশ্ন হলো, যিনি মানুষকে স্বীয় নৈকট্যলাভের সামর্থ্য দিয়েছেন আর আপন প্রেম ও ভালোবাসার প্রেরণায় ব্যাকুল করে রেখেছেন তাঁর সাথে কথোপকথনের কল্যাণধারা হতে তাঁর কোন সন্ধানী বঞ্চিত থাকতে পারে কি? একথা কি সঠিক যে, খোদার প্রেম ও ভালোবাসা আর খোদার জন্য আত্মবিস্মৃত হওয়া এবং তাঁর মাঝে বিলীন হওয়া এর সবই সম্ভব ও বৈধ আর খোদার মহিমায় এতে কোন আঁচ লাগে না; কিন্তু তাঁর সত্য প্রেমিকের হৃদয়ে তাঁর এলহাম অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব ও অবৈধ এবং তা খোদার সম্মানের জন্য হানিকর! খোদাপ্রেমের অকূল সাগরে মানুষের নিমজ্জিত হওয়া আর কোন স্থানে তা পরিত্যাগ না করা একথার নিশ্চিত সাক্ষ্য যে, তার বিস্ময়কর সৃষ্টি তথা আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে খোদাকে চেনা ও পাওয়ার জন্য। সুতরাং খোদাকে পাওয়া ও চেনার জন্য যে বন্ধ সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি সে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় অর্থাৎ এলহাম প্রদত্ত না হয়, তাহলে বলতে হবে, তিনি তাকে স্বীয় মারেফত লাভের জন্য সৃষ্টিই করেন নি। অথচ ব্রাহ্ম সমাজীরাও একথা অস্বীকার করে না যে, সুস্থ প্রকৃতির মানুষের আত্মা খোদার তত্ত্বজ্ঞান লাভের ক্ষুৎপিপাসা রাখে, তাই তাদের নিজেদেরই বুঝতে হবে যে, যেখানে সুস্থ প্রকৃতির মানুষ প্রকৃতিগত দিক থেকে স্বয়ং খোদার তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানী আর এটিও প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ঐশ্বী তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য উৎকৃষ্ট ঐশ্বী এলহামপ্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম নেই। এমতাবস্থায়, যদি সেই কামেল তত্ত্বজ্ঞান অর্জন অসম্ভব হয়, বরং তা সন্ধান করা অভিদ্রোচিত বা শিষ্টাচার বিবর্জিত কাজ হয়, তাহলে খোদার প্রজ্ঞা প্রশংসিত হবে যে, তিনি তাঁকে চেনার প্রেরণা জুগিয়েছেন কিন্তু তাঁকে চেনার কোন উপায় সৃষ্টি করেন নি। এক কথায়, যতটা ক্ষুধা সৃষ্টি করেছেন, সে পরিমাণ খাবার দিতে চান নি এবং যতটা পিপাসা দিয়েছেন সে পরিমাণ পানি দেওয়া পছন্দ করেন নি। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ একথা ভালোভাবে বুঝে যে, এমন ধারণা খোদার সুমহান করণারাজির মূল্য আদৌ না বুঝার শামিল। নিরক্ষুশ প্রজ্ঞা (খোদা) মানুষের সমূহ সৌভাগ্য নিহিত রেখেছেন পৃথিবীতে ঐশ্বী কিরণকে পূর্ণভাবে দেখার মাঝে, সেই দুর্বার আকর্ষণে যেন সে খোদার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তাই এমন দয়ালু ও কৃপাময় খোদা সম্পর্কে এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা যে,

তিনি কাঞ্চিত পুণ্য এবং সহজাত ও স্বাভাবিক মর্যাদায় পৌছাতে চান না, এটি ব্রাহ্মদের উদ্গুট বুদ্ধিমত্তাই বটে।

**নবম সন্দেহ:** আকাশ থেকে আল্লাহ স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করেন মর্মে যে বিশ্বাস রয়েছে, তা আদো সঠিক নয়। কেননা প্রকৃতির নিয়ম এই ধারণার সত্যায়ন ও সমর্থন করে না। উপর থেকে নীচে কোন শব্দ আসতে আমরা শুনি না, বরং এলহাম কেবল সেসব ধারণার নাম, যা চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগানোর ফলশ্রুতিতে বুদ্ধিমান লোকদের হৃদয়ে দানা বাঁধে, এর বেশি কিছু নয়!

**উত্তর:** যে সত্য নিজ স্থানে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, যা অগণিত তত্ত্বজ্ঞানী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন আর যার প্রমাণ সকল যুগের সত্যান্বেষীদের লাভ হতে পারে, তা যদি আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ কোন মানুষ অস্বীকার করে বা তমসাচ্ছুল হৃদয়ের অধিকারী কোন ব্যক্তির অক্ষম চিন্তাশক্তি ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান এর সত্যায়নে ব্যর্থ হয়, তবে এতে সত্যের কোন ক্ষতি নেই আর এমন লোকদের অপলাপে তা প্রকৃতির নিয়মের বাইরেও যেতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তোমরা চিন্তা কর, চুম্বকে যে আকর্ষণ শক্তি আছে, সে সম্পর্কে যদি কেউ অজ্ঞ হয়ে থাকে আর যদি সে চুম্বক কখনো দেখেই না থাকে, অথচ দাবি করে বসে যে, চুম্বক একটি পাথর। আমার যতটা প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান আছে আমি এ ধরনের আকর্ষণ কখনো কোন পাথরে পর্যবেক্ষণ করি নি। তাই আমার মতে চুম্বকের যে আকর্ষণ ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয়- তা ভুল। কেননা একথা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী! প্রশ্ন হলো, তার এই অর্থহীন কথার ফলে চুম্বকের প্রমাণিত বৈশিষ্ট্য কী অবিশ্বাস্য ও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে? মোটেই নয়। বরং এমন নির্বাধের এহেন বৃথা বাক্যব্যয়ের ফলে যদি কিছু প্রমাণিত হয়, তাহলে তা এটিই যে, সে চরম পর্যায়ের আহাম্মক ও অজ্ঞ, যে স্বীয় অজ্ঞতাকে কোন বস্তুর অনন্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে আখ্যা দেয় আর সহস্র সহস্র অভিজ্ঞ লোকের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে। এই শর্তও নির্ধারণ করা যে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী প্রত্যেক যদু-মধু দ্বারা পরামৰ্শিত হবে- এটি কী করে সম্ভব হতে পারে? মানবজাতিকে খোদা তাঁলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন কিছু মানুষের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর আর কিছু মানুষের ক্ষীণ। কিছু মানুষ অন্ধও হয়ে থাকে। প্রখর দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তিরা যখন দূর থেকে চন্দ্র বা কোন সূক্ষ্ম বস্তু দেখে, ক্ষীণ দৃষ্টির মানুষ তা অস্বীকার করে না, বরং না মানাকে নিজেদের লাঙ্গনা ও দুর্বলতা প্রকাশ

পাওয়ার কারণ মনে করে, আর অঙ্গ বেচারা এমন ক্ষেত্রে মুখই খোলে না। একইভাবে, যাদের স্বাগতিক লোপ পেয়েছে, শত শত বিশ্বস্ত ও সত্যভাষ্য মানুষের মুখে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের সংবাদ শুনে তারা তা মেনে নেয় আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে না। তারা ভালোভাবে জানে যে, এত মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না, বরং তারা অবশ্যই সত্যবাদী, আমাদেরই স্বাগতিক লোপ পেয়েছে, যে কারণে আমরা এই সুগন্ধ অনুভবে ব্যর্থ হয়েছি। একই মাপকাঠিতে অভ্যন্তরীণ বা অন্তর্নিহিত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও আদম সন্তানগণ ভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। কিছু মানুষ অত্যন্ত নিম্নমানের আর রিপুর পর্দায় আচ্ছন্ন। আর আদিকাল হতেই কিছু এমন উন্নত ও স্বচ্ছ (প্রকৃতির) মানুষ চলে আসছেন, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এলাহাম লাভ করতেন। নিম্ন মানের মানুষ, যাদের প্রকৃতি পর্দাচ্ছন্ন, তাদের মহান ও সূক্ষ্ম প্রকৃতির মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলীকে অস্বীকার করা এক অঙ্গ বা ক্ষীণদৃষ্টির মানুষের প্রথর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির দেখা বিষয়কে অস্বীকারের নামান্তর বা আজন্য স্বাগতিকহীন মানুষের স্বাগতিকিসম্পন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে অস্বীকারের শামিল।

এছাড়া অস্বীকারকারীর মুখ বন্ধ করার জন্য বাহ্যিক মাধ্যমের ন্যায় অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক মাধ্যমও রয়েছে। যেমন, জন্মগতভাবে যে স্বাগতিক থেকে বঞ্চিত, সে যদি সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের অস্তিত্বে অস্বীকার করে আর সকল স্বাগতিকিসম্পন্ন মানুষকে মিথ্যাবাদী বা সন্দেহবাদী আখ্যা দেয়, তাহলে তাকে এভাবে বুঝানো যেতে পারে যে, তুমি বিভিন্ন ধর্কার জিনিসের মধ্য থেকে, যেমন- কিছু কাপড়ে সুগন্ধি লাগিয়ে আর কিছুতে না লাগিয়ে স্বাগতিকিসম্পন্ন ব্যক্তির স্বাগেন্দ্রিয় পরীক্ষা করে নাও; যেন পৌনঃপুনিক পরীক্ষা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ কথায় তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, স্বাগতিকির অস্তিত্ব সত্যিকার অর্থে একটি পরীক্ষিত বিষয় আর এমন মানুষ সত্যই রয়েছে, যারা সুরভিত ও স্বাগহীন বস্ত্র মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। অনুরূপভাবে, পুনঃপুন পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যাবেষীদের সামনে এলাহামের অস্তিত্বও প্রমাণ হয়ে যায়। কেননা এলাহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে যখন সেসব অদৃশ্য বিষয়াদি ও সূক্ষ্ম-সুষ্পুণ্ড রহস্যাবলী উন্মোচিত হয়, যা কেবল বুদ্ধির জোরে প্রকাশ পেতে পারে না, আর এলাহামী গ্রন্থ সেসব বিস্ময়কর বিষয়সম্বলিত হয়ে থাকে, যা অন্য কোন পুস্তকে দেখা যায় না; এ প্রমাণের মাধ্যমে সত্যাবেষী তখন বুঝে যায় যে, ঐশ্বী এলাহামের অস্তিত্ব একটি প্রমাণিত সত্য। আর যদি কেউ স্বচ্ছ, সরল ও

সত্য প্রকৃতির অধিকারী ব্যক্তি হয়ে থাকে, তবে স্বয়ং সঠিক পথে জীবনচরণের কারণে স্বীয় হৃদয়ের জ্যোতি অনুসারে আল্লাহর ওলীদের ন্যায় কিছুটা এলহামও লাভ করে, যার কল্যাণে তার কাছে রসূলদের ওহী সম্পর্কে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান অর্জন হয়ে যায়। সুতরাং ইসলাম গ্রহণে যারা আন্তরিক সততা, আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ও খাঁটি আনুগত্যের সদিচ্ছা প্রকাশ করে, এমন সত্যান্বেষীদের এভাবে নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব আমরাই নিচ্ছি। আমাদের কথা সম্পর্কে যদি কারও সন্দেহে থাকে, তাহলে আমাদের কাছে নিষ্ঠার সাথে আসা উচিত। আমরা যা বলি খোদা তা করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন আর তিনি সকল বিষয়ে সাহায্যকারী।

এ ধারণা করা যে, চিন্তাভাবনা ও প্রণিধানে যে সূক্ষ্ম ও গুরু বিষয়াদি মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়, তা-ই এলহাম, এর বাইরে এলহাম বলতে আর কিছুই নেই- এটি এমন একটি সন্দেহ বা ভুল ধারণা, যার একমাত্র কারণ হলো অজ্ঞতা ও হৃদয়ের অন্ধকৃতি। মানুষের ধ্যানধারণার নামই যদি খোদার এলহাম হতো, তাহলে মানুষও খোদার মত স্বীয় চিন্তা ও ভাবনার বলে অদৃশ্য বিষয় অবগত হতে পারত! কিন্তু জানা কথা যে, মানুষ যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, চিন্তা করে সে কোন অদৃশ্য বিষয় দৃশ্যপটে আনতে পারে না এবং ঐশ্বী শক্তির কোন নির্দেশনও প্রকাশ করতে পারে না। খোদার বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতার কোন লক্ষণ তার কথায় সৃষ্টি হয় না। বরং চিন্তা করতে করতে সে যদি মারাও যায়, তবুও সে সেসব অপ্রকাশিত বিষয়াদি অবগত হতে পারবে না, যা তার বোধবুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও ইন্দ্রিয় শক্তির অস্তরালে রয়েছে। আর তার কথাও তত উন্নতমানের হয় না, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি অক্ষম থাকবে। তাই বিশ্বাস স্থাপনে বুদ্ধিমানের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, মানুষ চিন্তাভাবনা করে ভালো মন্দ যে সকল ধ্যানধারণায় উপনীত হয়, তা যদি খোদার বাণী হতো, তবে মানুষের জন্য অদৃশ্যের সকল দ্বার অবারিত হয়ে যেতো আর সে এমন সকল বিষয় বর্ণনা করতে পারত, যা বর্ণনা করা খোদার শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কেননা খোদার কাজ ও কথায় ঈশ্঵রত্বের বিকাশ ঘটা আবশ্যিক। কিন্তু কারও মনে যদি এ সন্দেহের উদয় হয় যে, ভাল ও মন্দ পরিকল্পনা, সকল কল্যাণ-অকল্যাণ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম প্রজ্ঞাসমূহ, বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও প্রতারণামূলক কথাবার্তা, যা চিন্তাভাবনার সময় মানুষের হৃদয়ে দানা বাঁধে, তা কার পক্ষ থেকে আর কোথেকে আসে আর কী করে ভাবতে ভাবতে

হঠাতে করে কাজের কথা মানুষের জানা হয়ে যায়? এর উত্তর হলো, এসব ধ্যানধারণা আল্লাহর সৃষ্টি (খালকুল্লাহ), এগুলো আল্লাহর নির্দেশ (আমরুল্লাহ) বা ইচ্ছা নয়। খালকুল্লাহ (আল্লাহর সৃষ্টি) ও আমরুল্লাহ বা আল্লাহর নির্দেশের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। খোদা তাঁলা যখন বিশ্বকে উপকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করে সকল কারণের আদি কারণ হওয়ার সুবাদে একে নিজের প্রতি আরোপ করেন, তখন এটি হলো খালকুল্লাহ বা আল্লাহর সৃষ্টি। আর ‘আমর’ হলো তা, যা কোন উপকরণের মাধ্যম ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে খোদার পক্ষ থেকে হয়; এতে উপকরণের কোন ভূমিকা থাকে না। সুতরাং খোদার বাণী, যা সেই সর্বশক্তিমানের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, তা ‘আমর’ বা খোদার আদেশের জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে, ‘খালক’ বা সৃষ্টিজগত থেকে তা উৎসারিত নয়। চিন্তাভাবনার সময় মানুষের মনে যেসব ধ্যানধারণার উন্নয় ঘটে, তার পুরোটাই ‘খালক’ বা সৃষ্টিজগতের সাথে সম্পর্ক রাখে, যেক্ষেত্রে ঐশী শক্তি বা ইচ্ছা, উপকরণ ও শক্তি-বৃত্তির অন্তরালে কর্মরত থাকে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, এই উপকরণের জগতে খোদা তাঁলা মানুষকে বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও বৃত্তি সহকারে সৃষ্টি করে তাদের প্রকৃতিকে এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করেছেন অর্থাৎ তাদের সৃষ্টিতে এমন কিছু বিশেষভুল অন্তর্নির্দিত রেখেছেন যে, যখন তারা কোন ভালো বা মন্দ কর্মের জন্য নিজেদের চিন্তাভাবনাকে সংক্রিয় করে, তখন সে অনুসারেই পরিকল্পনা মাথায় আসে। যেভাবে বাহ্যিক শক্তি-বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম হলো, যখন সে চোখ খোলে কিছু না কিছু দেখতে পায় আর যখন কোন শব্দের প্রতি কর্ণপাত করে কিছু না কিছু শুনতে পায়। অনুরূপভাবে যখন সে কোন ভাল বা মন্দ কাজে সাফল্য লাভের উপায় নিয়ে ভাবে, তখন কোন না কোন পরিকল্পনা তার মাথায় এসেই যায়। পুণ্যবান মানুষ পুণ্য সম্পর্কে চিন্তা করে মঙ্গলজনক বিষয়াদি উদ্ঘাটন করে আর চোর সিঁধ কাটা সম্পর্কে মনোসংযোগ করে সিঁধ কাটার সফল পথ আবিষ্কার করে। এক কথায়, অপকর্ম সম্পর্কে যেভাবে অনেক গভীর ও নাজুক ধ্যানধারণা মানুষের মাথায় জাগ্রত হয়, একইভাবে সে সময়কে মানুষ যদি সৎ কাজে ব্যবহার করে, তাহলে পুণ্যের উন্নত চিন্তাধারা মাথায় উদয় হয়। বাজে চিন্তাধারা যতই গভীর, সূক্ষ্ম ও জাদুকরী প্রভাব রাখুক না কেন, তা যেভাবে খোদার বাণী হতে পারে না, অনুরূপভাবে মানুষের নিজের বানানো চিন্তাধারাও, যাকে সে পুণ্য বলে

আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তা ঐশ্বী বাণী হতে পারে না। সার কথা হলো, চিন্তাভাবনা ও প্রণিধানের পর পুণ্যবানদের যেসব মহান প্রজ্ঞা বা চৌর-ডাকাত, খুনী, ব্যভিচারী ও প্রতারকদের যেসব নোংরা দুরভিসন্ধি মাথায় আসে, তা স্বভাবগত লক্ষণ ও প্রকৃতিগত বিশেষত্ব বৈ-কী। মহান খোদা যেহেতু সকল কারণের আদি কারণ, তাই এসবকে আল্লাহ তাঁ'লার সৃষ্টি আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে- তাঁর ‘আমর’ বা আদেশ নয়। তা মানুষের জন্য সেভাবেই স্বভাবজ বিষয়, যেভাবে দাস্ত, কোষ্ঠকাঠিন্য ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ করা উদ্দি-কুলের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এক কথায়, যেভাবে নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা (আল্লাহ তাঁ'লা) অন্যান্য বস্তুতে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, অনুরূপভাবে মানুষের চিন্তা ও প্রণিধান শক্তিতে এই বিশেষত্ব নিহিত রেখেছেন যে, সে পাপ বা পুণ্য তথা যে বিষয়েই এটিকে কাজে লাগাতে চায় বা যে ধরনের সাহায্য সে এটি থেকে পেতে চায়, অনুরূপ সাহায্য তার লাভ হয়। কোন কবি কাউকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে পঙ্কতি লেখে। মনোসংযোগের ফলে ব্যঙ্গাত্মক পঙ্কতি তার মানসপটে ভেসে ওঠে, দ্বিতীয় কবি একই ব্যঙ্গির প্রশংসা করতে চায় আর তার হৃদয়পটে তার প্রশংসাসূচক বিষয় ফুটে ওঠে। সুতরাং এমন ভাল বা মন্দ ধারণা খোদার বিশেষ ইচ্ছার বা পছন্দের পরিচায়ক হতে পারে না, আর না এটি তাঁর কর্ম ও কথা আখ্যায়িত পেতে পারে। খোদার পবিত্র বাণী সেটি, যা সম্পূর্ণরূপে মানবীয় শক্তির বাইরে ও উর্ধ্বে আর যা শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ, যার প্রকাশ ও আবির্ভাবের প্রথম শর্ত হলো, মানবীয় শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ও অকেজো হয়ে যাওয়া, নিজের কোন চিন্তাভাবনাও থাকবে না আর প্রণিধানও নয়, বরং মানুষ হবে মৃতবৎ আর বিচ্ছিন্ন থাকবে তার সকল উপায় উপকরণ। খোদা, যার অস্তিত্ব বাস্তব ও সত্য, তিনি যদি চান, তাঁর বিশেষ ইচ্ছার অধীনে কারও প্রতি স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করেন।

তাই বুঝতে হবে, যেভাবে সুর্যের আলো কেবল আকাশ থেকে আসে, চোখের ভেতর সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি এলহামের জ্যোতি ও বিশেষভাবে খোদার পক্ষ থেকে আর তাঁর ইচ্ছায় অবতীর্ণ হয়, মানুষের ভেতর থেকে সজোরে বা সবেগে নির্গত হয় না। খোদা তাঁ'লা যেখানে সত্যিকার অর্থে বিদ্যমান আর বাস্তবিকই তিনি দেখেন, শোনেন, জানেন ও কথা বলেন, সেখানে তাঁর কথা বা বাণীও সেই চিরঙ্গীব ও জীবনদাতা, চিরস্থায়ী ও স্থায়িত্বদাতার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, মানুষের নিজের

ধ্যানধারণাই খোদার কথা সেজে বসবে বা গণ্য হবে। আমাদের ভেতর থেকে সেসব ভাল বা মন্দ ধ্যানধারণাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়, যা আমাদের প্রকৃতির দাবি অনুসারে আমাদের ভেতর প্রচল্ল রয়েছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে খোদার সীমাহীন জ্ঞান ও অকূল প্রজ্ঞার স্থান সংকুলান কীভাবে হতে পারে? এমন ধারণা পোষণ করার চেয়ে বড় কুফরী মানুষের পক্ষে আর কী হবে যে, আল্লাহর কাছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অদৃশ্যের যত রহস্যভাণ্ডার রয়েছে, তার সবটাই আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান আর আমাদের হৃদয় থেকেই তা উৎসারিত হয়? অন্যভাবে যদি বলতে হয়, তাহলে সার কথা এটিই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতপক্ষে আমরাই খোদা, আমরা ব্যতীত নিজ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত আর নিজ গুণে গুণান্বিত এমন কেউ নেই যাকে খোদা বলা যেতে পারে! কেননা খোদা যদি সত্যিই থেকে থাকেন আর অনন্ত জ্ঞান যদি তারই বিশেষত্ব হয়ে থাকে আর আমাদের হৃদয়ের মাপকাঠিতে তা মাপা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে একথা কত ভ্রান্ত ও ঠুলকো যে, খোদার অনন্ত জ্ঞানের পুরোটা আমাদের বক্ষে বিদ্যমান আর খোদার প্রজ্ঞার পুরো ভাণ্ডার আমাদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে! খোদার জ্ঞান যেন কেবল ততটাই যতটা আমাদের বক্ষে বা হৃদয়ে বিরাজমান! সুতরাং চিন্তা কর! এটি যদি খোদা হওয়ার দাবি না হয় তাহলে আর কী? প্রশ্ন হলো, মানব-হৃদয় খোদার সকল গুণের উৎকর্ষতা নিজের মাঝে ধারণ ও সমবেতকরী হতে পারে কী? এটি কী বৈধ যে, একটি গুরুত্বহীন ও অর্থহীন কণার অঙ্গিত্ব সূর্য সেজে বসবে— যে সূর্যের অঙ্গিত্ব হলো সুনিশ্চিত সুবিদিত? মোটেই নয়, এটা অসম্ভব। এখনই আমরা লিখে এসেছি যে, অদৃশ্যের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং ঐশ্বী কুদুরত বা শক্তিমন্ত্রার ন্যায় অন্যান্য নির্দশনাবলী মানুষের হাতে মোটেই প্রকাশ পেতে পারে না। খোদার বাণী বা উক্তি সেটি, যাতে খোদার মাহাত্ম্য, খোদার ক্ষমতা, খোদার আশিস, খোদার প্রজ্ঞা বা হিকমত এবং খোদার অন্যতা বিরাজমান থাকে। সুতরাং কুরআন শরীফে এর সবকঁটি শর্তই পূর্ণ হতে দেখা যায়, এর প্রমাণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে উপস্থাপন করা হবে। অতএব, অদৃশ্য বিষয়াদি ও অন্যান্য ঐশ্বী ক্ষমতা-সংক্রান্ত এলহামের অঙ্গিত্বে এখনও যদি ব্রাহ্মসমাজীদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে তাদের দৃষ্টি উন্মোচন এবং পবিত্র এই গ্রন্থে কীভাবে অদৃশ্য সংবাদের এক অকূল সমুদ্র এবং মানবীয় শক্তির উর্ধ্বের বিষয়াদি প্রবহমান ও বিরাজমান রয়েছে, তা জানার জন্য পুরো মনোযোগ সহকারে কুরআন শরীফ পাঠ করা উচিত। যদি যথার্থ দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবে নিজ গুণে এসব

কুরআনী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তারা অবগত হতে না পারে তাহলে মনোযোগ দিয়ে আমাদের এ গ্রন্থ তাদের পাঠ করা উচিত, যেন নমুনাস্বরূপ তারা সেসব অদৃশ্য বিষয়ের ভাগুর ও প্রকৃতির রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারে যেসবে পরিব্রহ্ম কুরআন পরিপূর্ণ। ঐশী বাণী বা ‘এলহাম’-এর অঙ্গিতের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য খোদার পক্ষ থেকে যা বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর যা অদৃশ্য সংবাদভিত্তিক হয়ে থাকে, তা জানার আরও একটি রাস্তা আছে। তা হলো, উন্মত্তে মুহাম্মদীয়ায়- যারা সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, খোদা তাঁলা তাদের মাঝে প্রতিনিয়ত এমন ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করেন যারা খোদার পক্ষ থেকে এলহাম প্রাপ্ত হয়ে এমন অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন যা এক ও অদ্বিতীয় খোদা ছাড়া আর কারও পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর মহাসম্মানিত খোদা এই পরিব্রহ্ম এলহামে কেবল তাদের ধন্য করেন যারা সত্যিকার অর্থে কুরআনকে খোদার বাণী মনে করে আর নিষ্ঠা ও আস্তরিকতার সাথে এটি মেনে চলে এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-কে খোদার সত্য ও কামেল বার্তাবাহক, অধিকন্তু বার্তাবাহকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, মহান, শ্রেয় ও খাতামুর রসূল (শ্রেষ্ঠ রসূল) আর স্বীয় হিদায়াতদাতা ও পথপ্রদর্শক জ্ঞান করে। অন্যদের অর্থাৎ ইহুদী, খ্রিস্টান, আর্য ও ব্রাহ্মণ প্রায় দেবদের প্রতি এই এলহাম আদৌ অবতীর্ণ হয় না বরং সর্বদা কুরআন শরীফের সত্যিকার অনুসারীদের প্রতিই তা অবতীর্ণ হতো, বর্তমানেও হয় আর ভবিষ্যতেও হবে। রিসালতবাহী ওহীর ধারা প্রয়োজন না থাকার কারণে যদিও বন্ধ বা বিচ্ছিন্ন রয়েছে, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দাসদের প্রতি যে এলহাম হয় তা কোন যুগে বন্ধ হবে না। এই এলহাম, রিসালত বাহী ওহীর সত্যতার এক সুমহান প্রমাণ যার সামনে ইসলামের সকল অস্তীকারকারী ও বিরোধী লাঞ্ছিত ও লজিজ। আর এই কল্যাণময় এলহাম স্বীয় আশিসসমূহ, সম্মান, মাহাত্ম্য ও প্রতাপসহ কেবল সেই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মাঝে দেখা যায় যারা উন্মত্তে মুহাম্মদীয়াভুক্ত এবং সেই সম্মানিত রসূল (সা.)-এর দাসদের অঙ্গর্গত। অন্য কোন শ্রেণিতে এই পূর্ণ জ্যোতি আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না যা মহাসম্মানিত খোদার নৈকট্য, গ্রহণযোগ্যতা ও সম্প্রস্তুতির শুভ সংবাদ প্রদান করে। তাই কল্যাণময় এই এলহামের অঙ্গিতে কেবল এলহামের সত্যতার বিষয়টিই প্রমাণ করে না বরং এটিও প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সোজা সরল পথে যে জামা’ত বা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত তারা হলো মুসলমান, বাকি সকলেই মিথ্যার পূজারি, বক্র পথের অনুসারী এবং খোদার বিরাগভাজন। নির্বাধেরা আমার একথা শুনতেই

বিভিন্ন মন্তব্য করবে আর অস্থীকারের ছলে মাথা নাড়বে বা নির্বোধ ও দুক্ষতকারীদের ন্যায় হাসিস্টাট্টা করবে। কিন্তু তাদের বুঝতে হবে, অনর্থক অস্থীকার ও হাসিস্টাট্টা করা সত্যামৈষী ও সজ্জন ব্যক্তির কাজ নয় বরং সেসব নোংরা-প্রকৃতি ও দুক্ষতি পরায়ণ লোকের কাজ, খোদা ও সততার সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই। পৃথিবীতে সহস্র সহস্র বস্তুতে এমন বৈশিষ্ট্যবলী বিদ্যমান যা যৌক্তিকভাবে বোঝা যায় না, মানুষ কেবল অভিজ্ঞতার আলোকে তা বুঝতে পারে; এ কারণেই সচরাচর সকল বিবেকবান মানুষের গৌত্ম এটিই যে, পৌনঃপুনিক পরীক্ষার মাধ্যমে কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্য যখন প্রকাশ পেয়ে যায় তখন সেই বৈশিষ্ট্যের সত্যতায় তাদের কোন বিবেকবানের আর সন্দেহ থাকে না। পরীক্ষানিরীক্ষার পর সে ব্যক্তিই সন্দেহ করে, যে নিরেট গর্দভ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তুরবদ বা জামালগোটায় রেচন আর চুম্বকে আকর্ষণের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যদিও এ কথার কোন প্রমাণ নেই যে, এগুলোতে এসব বৈশিষ্ট্য কোথেকে এলো; কিন্তু অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে যে, এ বস্তুগুলোতে এ সকল বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্যমান। কেউ যদি কেবল এ কারণে এসবের অস্তিত্ব অস্থীকার করে যে, যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এর কোন প্রমাণ দেখি না, এমন ব্যক্তিকে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ পাগল ও উন্মাদ, মাথাখারাপ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনই আখ্যা দেবে।

সুতরাং এখন আমরা ব্রাহ্ম ও অন্যান্য বিরোধীদের কাছে নিবেদন করছি যে, এলহাম সম্পর্কে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে এলহামের যে দৃষ্টান্ত এখন দেখা যায় এটি তাদেরই একক বৈশিষ্ট্য, অন্যদের মাঝে আদৌ তা দেখা যায় না— আমাদের এই ব্রহ্মতি প্রমাণবিহীন কোন দাবি নয়। বরং অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে যেভাবে সহস্র সহস্র সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, অনুরূপভাবে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে এটিও সকল অনুসন্ধিসুর কাছে প্রকাশ পেতে পারে। কেউ যদি এর সত্যামৈষী হয়ে থাকে তাহলে এটি প্রমাণ করা আমাদেরই দায়িত্ব। কিন্তু শর্ত হলো, কোন ব্রাহ্মসমাজী এবং ইসলামের কোন অস্থীকারকারীকে সত্যামৈষী হিসেবে, আস্তরিকতার সাথে লিখিতভাবে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রচার করে স্বদিচ্ছা ও আনুগত্যের প্রেরণা নিয়ে আসতে হবে। *فَمَنْ تَوَلَّ فِيْنَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِالْمُفْسِدِ* (সূরা আলে ইমরান: ৬৪) অনেকেই এই সন্দেহের অবতারণা করে যে, অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয়াদি বর্ণনাকারী দল বা ফিরকা পৃথিবীতে অনেক দেখা যায়, যারা কোন কোন সময় কিছু না কিছু বলেই থাকে, আর কখনও কখনও তাদের কথা

কিছুটা হলেও সত্য প্রমাণিত হয়। যেমন জ্যোতিষী, চিকিৎসক, মুখাবয়ব বা চেহারা দেখে চরিত্র নির্ণয়কারী, গণক, ভাগ্য গণনাকারী, অক্ষর-সংখ্যা দেখে শুভাশুভ নির্ণয়কারী, শাকুনিক, কোন কোন উন্নাদ, এমনকি আধুনিক যুগে মেসমেরিজমের মাধ্যমেও কতক বিষয় প্রকাশ পেয়ে আসছে। তাই প্রশ্ন হলো, অদৃশ্য বিষয়াদি কী করে এলহামের সত্যতার নিশ্চিত প্রমাণ হতে পারে? এর উত্তরে বুঝতে হবে যে, উপরে যেসব শ্রেণির লোকের উল্লেখ করা হয়েছে তারা কেবল ধারণা, অনুমান বরং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কথা বলে, সুনিশ্চিত জ্ঞান তারা আদৌ রাখে না আর তাদের এমন কোন দাবিও দেখা যায় না। ঘটিতব্য কিছু বিষয় সম্পর্কে তারা যে সংবাদ দেয় সেক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর উৎস শুধু অনুমাননির্ভর লক্ষণাবলী ও উপকরণ হয়ে থাকে। নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথে তাদের দূরতম কোন সম্পর্ক থাকে না এবং অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও ভাস্তির আশঙ্কা আদৌ তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, বরং তাদের বেশিরভাগ সংবাদ সম্পূর্ণরূপে অমূলক, ভিত্তিহীন এবং শুধু মিথ্যাই প্রমাণিত হয়। ডাহা মিথ্যা ও বাস্তবতা পরিপন্থী হওয়ার কারণে এদের ভবিষ্যদ্বাণীতে সম্মান, গ্রহণযোগ্যতা, বিজয় ও সফলতার জ্যোতি দেখা যায় না, আর এমন সংবাদদাতারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রায় সময় দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, দুর্ভাগা, ভাগ্যহাত, মানসম্মানহীন, ভীরুৎ, হীন এবং ব্যর্থ ও নিষ্ফল প্রতিপন্থ হয়ে থাকে আর অদৃশ্য বিষয়াদি যেভাবে চায় আদৌ সেভাবে ঘটাতে পারে না বরং তাদের ব্যবহারিক জীবনে খোদার ক্রোধের লক্ষণাবলী স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। খোদার পক্ষ থেকে কোন কল্যাণ, সম্মান ও সাহায্য তারা লাভ করে না। কিন্তু নবী ও ওলীরা কেবল জ্যোতিষীদের ন্যায় অদৃশ্যের সংবাদই প্রকাশ করেন না বরং খোদার মহান কৃপা ও রহমতে, যা তাদের সার্বক্ষণিক সাথী হয়ে থাকে, তাঁরা এমন উন্নতমানের ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন যাতে গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান সূর্যের মত জ্বলজ্বল করতে দেখা যায় এবং তা হয়ে থাকে সম্মান ও সাহায্যের সুসংবাদ, দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-কষ্টের নয়।

কুরআন\*(পাদটীকা-১) শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহলে বুঝতে পারবে যে, তা আদৌ হতভাগা জ্যোতিষীদের কথার মতো নয় বরং সেগুলোতে স্পষ্ট এক অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রতাপ উপচে পড়তে দেখা যায়।

বি. দ্র.: পাদটীকা নম্বর এক (১) এই পুস্তকের ১৭১ পৃষ্ঠায় দেয়া আছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে পড়ে নিন। -অনুবাদক

এতে বিধৃত ভবিষ্যদ্বাণীর রীতি এবং ধরন হলো, তা নিজের সম্মান আর শক্র লাঞ্ছনা, নিজের উন্নতি আর শক্র অবনতি, নিজের সফলতা আর শক্র ব্যর্থতা, নিজের বিজয় আর শক্র পরাজয়, নিজের চির সতেজতা আর শক্র ধ্বংস প্রকাশ করেছে। এমন ভবিষ্যদ্বাণী কোন জ্যোতিষী করতে পারে কি? বা কোন ভাগ্য গণনা অথবা মিসমেরিজমের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে কি? মোটেই নয়। সর্বাবস্থায় নিজের মঙ্গল আর বিরোধীদের অমঙ্গল ও পতনের দাবি করা, বিরোধীর সকল কথাকে ব্যর্থ আখ্য দেয়া আর স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কথা পূর্ণ হওয়ার প্রতিক্রিয়া দেয়া— এটি স্পষ্টত খোদারই মাহাত্ম্য, মানুষের কাজ নয়। এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমরা অদৃশ্য সংবাদ-সম্বলিত কুরআনের কিছু আয়াত উদাহরণ স্বরূপ অনুবাদসহ লিপিবদ্ধ করছি; যেন ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরুল মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করে আর সেসব ভবিষ্যদ্বাণী একসঙ্গে একস্থানে দেখে নিজেই বিচার-বিবেচনা করতে পারে যে, এমন অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া সর্বশক্তিমান খোদা ছাড়া কোন মানুষের কাজ হতে পারে কি না? সংক্ষিপ্ত অনুবাদসহ সেই আয়াতগুলো নিম্নরূপ:

الرَّبُّلَكَأَيْتُكَالْحَكِيمُأَكَانَلِلَّئَسْعَجَّابًاأَنْأَكْنِيرَلَّئَسْوَ  
لَكِشْرِلَّذِينَأَمْنَوْأَنْلَهُمْقَدْمَصَدِيقٌعَنْدَرَبِّهِمْقَالَالْكُفَّارُإِنَّهُذَا السِّحْرُمُؤْمِنُونَ

এগুলো সেই গ্রন্থের আয়াত যা সকল প্রকার প্রজ্ঞাময় জ্ঞানের সমাহার। মানুষ কি একারণে আশ্চর্যান্বিত যে, আমরা তাদের এক ব্যক্তির প্রতি এই ওহী করেছি যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের শুভসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে প্রশংসনীয় মর্যাদা রয়েছে? কাফিররা এই রসূল সম্পর্কে বলে যে, ‘এ এক স্পষ্ট ঘাদু’। (সূরা ইউনুস: ২-৩)

وَقَالُوا يَا يَاهَا لَنِي نُنَزِّلَ عَلَيْهِاللَّهُرَبِّإِنَّكَلَمَجْنُونٌ

তারা রসূলকে সম্বোধন করে বলেছে যে, হে ঐ ব্যক্তি! যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তুমি উন্মাদ। (সূরা হিজর: ৭)

كُنْلَكَمَا أَئِلَّذِينَمِنْ قَبْلِهِمْمِنْ سُوْلِإِلَّاقَالُوا سَاحِرٌأَوْ مَجْنُونٌ  
أَتَّوَاصُوا بِهِبَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

অনুরূপভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এমন কোন রসূল আসে নি যাকে তারা ঘাদুকর বা উন্মাদ আখ্যা দেয় নি। এরা কি পরম্পরকে একই (আচরণের)

ওসীয়ত বা তাকিদপূর্ণ নসীহত করে আসছিল? হ্যাঁ, বরং এ জাতিটাই সীমা লঙ্ঘনকারী। (সূরা যারিয়াত: ৫৩-৫৪)

فَذَكِّرْ فِيمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَاهُنَّ وَلَا مَجْوِنٌ

সুতরাং তুমি তাদের সত্য পথের কথা স্মরণ করানো অব্যাহত রাখ। খোদার কৃপায় তুমি গণকও নও আর তোমার ওপর জ্ঞান বা উন্নাদনাও ভর করে নি। (সূরা তুর: ৩০)

قُلْ لَيْسَ احْسَنُ الْأُنْسُ وَالْجَنْ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِيَثِيلٍ هَذِهِ الْقُرْآنُ  
لَا يَأْتُونَ بِيَثِيلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِعَصْمِهِ

তাদের বল, যদি সমগ্র জ্ঞান ও মানবকূল ও কুরআনের সম্পর্কায়ের কোন গ্রহ লেখার বিষয়ে মতৈকে পৌছে আর তারা পরম্পরকে সাহায্যও করে, তবুও তারা তা কখনও বানাতে পারবে না। (সূরা বলী ইসরাইল: ৮৯)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا سُورَةً مِّنْ مُّثْلِهِ وَادْعُوا شَهِدًا إِعْلَمُ مَنْ دُونَ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَكُمْ تَقْتُلُوا فَإِنَّ قَاتِلَ النَّارِ الرَّقِيْقَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
أَعْلَمُ بِالْكُفَّارِ

আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যে বাণী অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা এ বিষয়ে কোনভাবে সন্দিহান হও অর্থাৎ যদি তোমরা মনে কর যে, সে নিজেই তা রচনা করেছে বা জ্ঞিনদের কাছে শিখেছে বা (যদি মনে কর) এটি এক প্রকার যাদু অথবা কবিতা বা যদি অন্য কোন ধরনের সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা এর একটি সূরার মত কিছু রচনা করে দেখাও। নিজেদের অন্যান্য সাহায্যকারী বা উপাস্যদের সাহায্যও নাও; যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি বানাতে না পার, যা তোমরা কখনও পারবে না; তাহলে সেই অগ্নিকে ভয় কর যার জ্বালানি হবে অগ্নি ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা বাকারা: ২৪-২৫)

وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هُلْ هُنَّا إِلَّا يَشْرِيفُونَ فِي  
رَبِّيْعِ الْعَلِمِ الْقُولَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِلْ قَالُوا أَخْفَغْنَا حَلْمَنِ بِلْ افْتَرَهُ بِلْ  
هُوَ شَاعِرٌ فَلَيْلَتَنَا إِيَّاهُ كَمَا أُرْسَلَ الْأَكْوَافُ

অস্বীকারকারীরা গোপনে পরম্পর এভাবে একে অন্যকে প্রশ্ন করে যে, বার্তাবাহক হওয়ার দাবি যে করে তার মাঝে বাড়তি কী যোগ্যতা আছে?

তোমাদের মত একজন মানুষই তো । তাই তোমরা কী জেনেশনে যাদু কবলিত হচ্ছ? পয়গম্বর (সা.) বলেন, আমার খোদা সবকিছু জানেন, হোক তা আকাশে বা ভূমিতে । নিজ সত্তায় তিনি সর্বশোতা ও সর্বজ্ঞনী । কোন কথা তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না । কিন্তু কাফের, নবীর কথার প্রতি কর্ণপাত করে না । তারা কুরআন সম্পর্কে বলে যে, এগুলো কিছু বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন (বৈ কিছু নয়) । বরং এ কথাও বলে যে সে নিজেই তা বানিয়েছে । বরং তাদের একটি বচন হলো, ‘এ ব্যক্তি এক কবি’ যদি সে সত্য হয় তাহলে আমাদের চোখের সামনে কোন নির্দশন দেখাক, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীরা প্রেরিত হয়েছে । (সূরা আমিয়া: ৪-৬)

حُكْمُ الْإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيْمُ اِيْتَىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ

তড়িঘড়ি করা মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য । (সূরা আমিয়া: ৩৮)

سَرْبِيْهُمْ اِيْتَنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَفْقَسِهِمْ حَتَّىْ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অচিরেই তোমাদেরকে আমি আমার নির্দশন দেখাবো । তাই আমার কাছে তড়িঘড়ি কোন নির্দশন দাবি করো না । অচিরেই আমরা তাদেরকে বিশ্বের দিগন্তে নির্দশন দেখাব এবং স্বয়ং তাদের নিজেদের মাঝে আমাদের নির্দশন প্রকাশ পাবে আর এক পর্যায়ে সত্য তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে । (সূরা হামাম আস সাজদা: ৫৪)

اَمْ يَقُوْنُنَ بِهِ جِنَّةً طَلْ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَآذْرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ

তারা কি বলে যে, সে বিকারগত? না, সত্য কথা হলো খোদা তাদের প্রতি সত্য প্রেরণ করেছেন আর তারা সত্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করছে । (সূরা মুমিনুন: ৭১)

وَلَوْ اتَّبَعُ الْحَقُّ اَهْوَاءِهِمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ طَبْلُ اَتَيْنِهِمْ بِنِذْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعِرْضُونَ

যদি খোদা তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করতেন, তা হলে স্বর্গ-মর্ত্য এবং এতে যা কিছু আছে, সবকিছু বিগড়ে যেতো বা সবকিছুর শৃংখলা হারিয়ে যেতো । বরং আমরা তাদের জন্য সেই পথ-নির্দেশনা এনেছি যার তারা মুখাপেক্ষী ছিল । সুতরাং তারা যে হিদায়াতের মুখাপেক্ষী, তার প্রতিই তারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে । (সূরা মুমিনুন: ৭২)

هَلْ أَتَيْنَاهُمْ عَلَى مِنْ تَنَزُّلِ الْشَّرِّ لِمَنْ يَرَوْنَ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَثْيِمٍ يُلْقَوْنَ السَّعْيَ وَأَكْرَهُمْ كَذَنْبُونَ  
وَالشَّرَعَاءِ يَدْعُهُمُ الْغَاوُنَ الْمُمْتَرَأَ إِنَّهُمْ فِي كُلِّ كَادِيَّةٍ مُؤْمِنُونَ وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ

আমি কি তোমাদেরকে এ খবর দেবো যে, জ্ঞান কাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়? জ্ঞান কেবল তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়, যারা মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী। তাদের অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর কবিদের অনুসরণ কেবল তারা করে, যারা নিজেরা মিথ্যাবাদী। তোমরা কি জান না যে, কবিরা মিত্রাক্ষর বা ছন্দের সন্ধানে জঙ্গলে হাবুড়ুর খেতে থাকে, অর্থাৎ তারা কোন ঐশ্বী সত্যের অনুশাসনের গান্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা যা কিছু বলে তা করে না। (সূরা আশ শো'আরা: ২২২-২২৭)

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ

অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে যে, তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও ঠিকানা কোনটি? (সূরা আশ শো'আরা: ২২৮)

وَبِالْعَنْقِ اتَّزَلَّنُوا بِالْعَنْقِ تَرَكُ

আর কুরআনকে আমরা প্রকৃত প্রয়োজনে অবতীর্ণ করেছি আর সত্য সহকারে তা অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বৰী ইসরাইল: ১০৬)

وَإِنَّهُ لَكَبِيبٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ طَتَّبِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيرٍ

আর তা এমন একটি গ্রন্থ, যা চিরকাল মিথ্যার মিশ্রণ হতে পবিত্র থাকবে। কোন মিথ্যা কখনো এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও কোন সময় পারবে না। অর্থাৎ পূর্ণ সত্য, যা সকল প্রকার মিথ্যা থেকে মুক্ত, সকল মিথ্যা পূজারীদেরকে অভিযুক্ত ও নির্বাক করতে থাকবে তারা পূর্বের হোক বা তাদের জন্য পরেই হোক না কেন। আর এর সামনে দাঁড়ানোর সামর্থ্য কোন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির নেই। (সূরা হা মীম আস সাজদা: ৪২-৪৩)

وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهِ فَأَيْسَ بِعُجْزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءٌ

আর যে ব্যক্তি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, সে খোদাকে স্বীয় বিজয় বা প্রাধান্য বিস্তারে ব্যর্থ করতে পারবে না। আর খোদার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কেউ তার সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল আহকাফ: ৩৩)

إِنَّا كَحْنُ نَرَنْ الْنَّذْكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفْظُونَ

এই বাণী আমরা স্বয়ং অবতীর্ণ করেছি, আমরা স্বয়ং এর তত্ত্বাবধান করবো।  
(সূরা হিজর: ১০)

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبُدُ

তুমি তাদেরকে বল, সত্য এসে গেছে, এরপর মিথ্যার এমন কোন শাখা-  
প্রশাখা গজাবে না যার খণ্ডন কুরআনে নেই আর তা নিজের প্রথম অবস্থায়ও  
ফিরে যাবে না। (সূরা সাবা: ৫০)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا سَمْعًا لِهُنَّ الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْبُّوْنَ

কাফেররা বলেছে যে, এখন তোমরা কুরআনের প্রতি কর্ণপাত করো না। আর  
যখন তোমাদেরকে তা শোনানো হয়, তোমরা কথার ছলে হটগোল বাধিয়ে  
দিও, হ্যাত এভাবে তোমরা বিজয় লাভ করবে। (সূরা হা মীম আস সাজদা: ২৭)

وَقَاتَ طَيْلَفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ امْنَوْا بِأَنَّمَايِنْ أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الْهَمَارِ وَأَفْqَوْرَا أَخْرَهَا  
لَعَاهُمْ يَرْجِعُونَ

কতক ইন্দু ও খৃষ্টান বলে যে, এ কৌশলটি অবলম্বন কর অর্থাৎ দিনের  
প্রথমভাগে ঈমান আন আর দিনের শেষভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা ইসলামের  
সত্যতা অঙ্গীকার করে বস। এভাবে হ্যাত মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া  
থেকে বিরত থাকবে। (সূরা আলে ইমরান: ৭৩)

فَلَنْذِيَقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنْجِزِيَّهُمْ أَسْوَالَنَّذِيْرِيْنَ كَانُوا يَعْلَمُونَ

সুতরাং আমরা তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো আর তাদের  
অপকর্ম ও নোংরা কর্ম অনুসারে তারা প্রতিদান পাবে। (সূরা হা মীম আস সাজদা:  
২৮)

بِرِّيْدُونَ أَنْ يُطْفِئُونَ رَبِّهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ لَآنْ يُنْهَمْ نُورَهُ وَكُوْكَرَ الْكَفَرُونَ هُوَ الَّذِي  
أَرْسَلَ رَسُولَهُ إِلَيْهِمْ وَدِيْنَ الْحَقِّ يُلْهِمَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْتَكْوَنَ

মুখের ফুর্তকারে তারা খোদার জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু খোদা  
সেই জ্যোতিকে পরিপূর্ণতা দেয়া পর্যন্ত কখনও নিজের কাজ পরিত্যাগ করবেন  
না, কাফেররা তা যতই অপচন্দ করুক না কেন। খোদা সেই সর্বশক্তিমান ও  
প্রতাপান্বিত সন্তা, যিনি স্বীয় রসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন  
পৃথিবীর সকল ধর্মের বিরুদ্ধে এটিকে জয়যুক্ত করার জন্য, মুশরেকরা তা যতই  
অপচন্দ করুক না কেন। (সূরা আত তাওবা: ৩২-৩৩)

**قُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتُعَلَّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبَيْدَادُ**

কাফেরদেরকে তুমি বলে দাও যে, তোমাদেরকে অচিরেই পরাত্ত করা হবে আর অবশ্যে জাহানামে নিপত্তি হবে। (সূরা আলে ইমরান: ১৩)

**إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَا إِلَّا مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِنِ**

তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, অর্থাৎ পৃথিবীতে ইসলামের সসম্মানে বিস্তার লাভ এবং এর পথে বাধাদানকারীদের লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তোমরা আদৌ একে বাধাগ্রাস্ত করতে পারবে না। (সূরা আল আম'আম: ১৩৫)

**وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْوُلَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ**

ইহুদীরা বলেছে, খোদার হাত বাঁধা রয়েছে অর্থাৎ যা কিছু হয়, তা মানুষের পরিকল্পনায় হয় আর খোদা স্বীয় শক্তিমন্তার সাক্ষর রাখার বিষয়ে অক্ষম। সুতরাং ইহুদীদের হাত খোদা তাঁলা চিরতরে বেঁধে দিয়েছেন। (সূরা আল মায়দা: ৬৫)

**ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْزَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقْفُوا إِلَّا يَجْبَلُ مِنَ اللَّهِ وَحْبَلُ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعَصْبَرٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتَلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حِقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ**

যদি তাদের পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনার কোন অর্থ থাকে, তাহলে এর শক্তি-বলে পৃথিবীর রাজত্ব ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করব্বক। তাদেরকে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যেখানেই থাকুন না কেন, তারা লাঞ্ছিত ও পরাধীন হিসেবে থাকবে। আর তাদের জন্য এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, পরাধীনতার ফ্লানি বরণ করা ছাড়া কারও দেশে সসম্মানে থাকতে পারবে না। দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য সর্বদা তাদের অদৃষ্ট হবে। এর কারণ হলো, তারা খোদার নির্দশনাবলীকে অস্বীকার আর খোদার নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আসছে এবং এ কারণেও যে, তারা অবাধ্যতা ও পাপের ক্ষেত্রে সীমা লজ্জন করেছে। (সূরা আলে ইমরান: ১১৩)

**إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ**

আমাদের রীতি হলো, আমরা ইহকাল ও পরকালে আমাদের পয়গম্বর ও বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করে থাকি। (সূরা আল মুমিন: ৫২)

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَمَ بِنَا وَرُسُلُهُ أَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

খোদা এই সিদ্ধান্তটি করে রেখেছেন যে, ‘আমি ও আমার রসূল জয়যুক্ত হবো’। খোদা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল মুজাদিলা: ২২)

وَيَحْكُمُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

খোদাকে বাদ দিয়ে কাফের তোমাকে অন্যান্য জিনিসের ভয় দেখায়। (সূরা আয় যুমার: ৩৭)

قُلْ ادْعُوا شَرَكَاءَ كُلُّهُ تُمْ كَيْدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ إِنَّ رَبَّيْكُمْ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَعْلَمُ الْمُلْجَيْنَ

তুমি তাদেরকে বল, তোমরা আমাকে পরাজিত করার জন্য স্বীয় সেসব উপাস্যদের সাহায্য যাচনা কর, যারা তোমাদের মতে খোদার সমকক্ষ, আর আমার ব্যর্থতার জন্য সকল প্রকার ঘড়্যন্ত কর এবং আমাকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দিও না। (জেনে রাখ!) আমার কার্যবিধায়ক ও কার্যনির্বাহক হলেন সেই খোদা যিনি আপন গ্রহ নায়িল করেছেন। তাঁর নিয়ম হলো, পুণ্যবানদের কাজ তিনি নিজেই করেন আর তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিজ থেকেই নেন। (সূরা আল আ'রাফ: ১৯৬-১৯৭)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

তুমি তোমার খোদার নির্দেশে ধৈর্য ধারণ কর আর তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাক। তুমি আমাদের স্নেহ-দৃষ্টিতে রয়েছ। (সূরা আত তুর: ৪৯)

وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ

যারা তোমাকে হত্যা করতে ওঁৎ পেতে আছে, তাদের দুষ্কৃতি থেকে খোদা তোমাকে রক্ষা করবেন। (সূরা আল মায়েদা: ৬৮)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَكَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا أَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ

আমরা তোমার পূর্বে অনেক বার্তাবাহক তাদের স্ব স্ব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি আর তারাও সমুজ্জ্বল নির্দর্শন প্রদর্শন করেছে। অবশেষে আমরা সেসব অপরাধীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি যারা এসকল নবীকে গ্রহণ করে নি। মু়মিনদেরকে সাহায্য করা আমাদের অবধারিত দায়িত্ব। (সূরা আর রুম: ৮৮)

وَلَقَرَ اسْتَهِزَىٰ بُرْسِلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالْذِيْنَ سَخْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهْرُءُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ افْتَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

আদি থেকে এটিই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে অর্থাৎ আদি হতে খোদার রীতি এভাবেই চলে আসছে যে, সত্য নবীদেরকে ব্যর্থ হতে দেয়া হয় না আর তাদের জামা'ত টুকরো টুকরো হয় না বা বিশ্বখ্লার শিকার হয় না বরং তারা সাহায্য লাভ করে। তোমার পূর্বেও নবীদের সাথে হাসিঠাট্টা করা হতো, কিন্তু তিরস্কারকারীরা সকল যুগে নিজেদের তিরস্কারের প্রতিফল পেয়েছে। তাদেরকে বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ! যারা খোদার নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে! (সূরা আল আন'আম: ১১-১২)

وَقَاتُوا لَوْلَا تُلَّلَ عَلَيْهِ أَيْهَةٌ مِنْ رَبِّهِ طَفْلٌ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ أَيْهَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ لَا يَعْلَمُونَ

আর কাফেররা বলে, তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার প্রতি কেন কোন নির্দশন অবর্তীর্ণ হয় নি? তুমি বল, নির্দশন অবর্তীর্ণ করার পূর্ণ ক্ষমতা খোদা রাখেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা আল আন'আম: ৩৮)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَمْنَنُ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَأْسِسَكُمْ شَيْعَاعًا وَ يُدْبِغُ بَعْضَكُمْ بَأْسًا بَعْضًا أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَذِيْنَ لَعَاهُمْ يَفْقَهُمُونَ

তুমি বল, তিনি তোমাদের নির্দশন প্রদর্শনের লক্ষ্যে ওপর থেকে কোন শাস্তি অবর্তীর্ণ করা বা তোমাদের পদতল হতে কোন শাস্তির প্রকাশ ঘটানো অথবা বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করানোর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। দেখ, আমরা কিভাবে নির্দশনাবলী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি যেন তারা বুঝতে পারে। (সূরা আল আন'আম: ৬৬)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ قُلْ لَا إِنْ مِنْكُمْ لَئِنْفَسِيْ ضَرَّأَ وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ طَلِيلٌ أُمَّةٌ أَجَلٌ إِذَا جَاءَهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْرُرُ مُؤْنَةً

আর কাফিররা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে বল, এই প্রতিশ্রূতি কখন পূর্ণ হবে? তুমি বল, নিজের ভাল মন্দের ওপর আমার নিজেরই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু খোদা যা চান তাই হয়। সকল জামাতের জন্য একটি নির্ধারিত সময় থাকে, তাদের নির্ধারিত সময় যখন আসে, তখন তারা এক মুহূর্ত পিছিয়েও থাকতে পারবে না আর এগিয়েও যেতে পারবে না। (সূরা ইউনুস: ৪৯-৫০)

فَلْ يَقُولُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَا كَانُوكُمْ إِذْ عَامِلُونَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيُهُ عَذَابٌ يُّخْزِيهِ وَيَجْلِلُ عَلَيْهِ  
عَذَابٌ مُّقِيمٌ

তুমি বল, হে আমার জাতি! তোমরা নিজ নিজ স্থানে কাজ করে যাও আর আমি নিজ স্থানে কাজ করে চলেছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, এ পৃথিবীতে কার ওপর লাঞ্ছনিক শাস্তি অবতীর্ণ হয় আর কার ওপর (খোদা) চিরস্থায়ী শাস্তি নাযেল করবেন। (সূরা আয যুমার: ৪০-৪১)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذُذْ نَهْمٌ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ

অর্থাৎ যারা কুফরী করেছে আর খোদার পথে বাদ সাধে, তাদের ওপর পারলৌকিক শাস্তি আমরা পরকাল ছাড়া এ পৃথিবীতেও অবতীর্ণ করবো এবং তারা তাদের নৈরাজ্যের জন্য শাস্তি পাবে। (সূরা আন নাহল: ৮৯)

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَصْرُوُ اللَّهَ شَيْئًا . . . وَآهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

কাফিরদের দুরভিসংক্ষি দেখে তোমার দুঃখভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয়; তারা খোদার ধর্মের কোন ক্ষতি করতে পারবে না আর খোদা তাদের জন্য মহাশাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৭৭)

كَذَابٌ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَفُرُوا بِاِلٰهٍ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِمِنْ تُوبُوهُمْ لَإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

যেভাবে ফেরাউনের পরিবার এবং এর পূর্বের কাফিরদের অবস্থা হয়েছে। যখন তারা খোদার নির্দর্শনাবলীকে অস্বীকার করার রীতি অবলম্বন করেছে, তখন খোদা তাদেরকে তাদের পাপের শাস্তি দিয়েছেন। নিচয় খোদা মহা শক্তিমন্ত্র অধিকারী এবং শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা আল আনফাল: ৫৩)

فَسَيِّئُ فِي هُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّيِّئُ الْعَلِيُّمُ

তাদের দুষ্কৃতি প্রতিহত করার জন্য তোমার পক্ষে খোদা-ই যথেষ্ট, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (সূরা আল বাকারা: ১৩৮)

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرْبِكَ مَا عَدُهُمْ لَقَبْرُونَ

আমরা তাদের সম্পর্কে যে প্রতিক্রিতি দিই, তা তোমাকে দেখানোর পূর্ণ ক্ষমতা আমরা রাখি। (সূরা আল মু'মিনুন: ৯৬)

وَ يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْبِئَ عَلَيْهِ أَيْهُ مِنْ زَيْدٍ فَقُلْ إِنَّمَا الْعَيْبُ إِلَيْهِ فَانْتَظِرُوهُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْمُنْتَظَرِينَ

তারা বলে, এর প্রভুর পক্ষ থেকে এর প্রতি ধর্মের সমর্থনে কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নি? তুমি বল, অদ্যশ্যের জ্ঞান খোদারই বিশেষত্ব। সুতরাং, তোমরা নিদর্শনের অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে নিদর্শনের অপেক্ষায় রইলাম। (সূরা ইউনুস: ২১)

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّدِ الْكُمُّ إِيَّاهُ فَتَعْرُفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ

তুমি বল, খোদা সকল অনুপম ও পরমোৎকর্ষ গুণাবলীর আধার। অচিরেই তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শন প্রদর্শন করবেন, তা এমন নিদর্শন হবে, যা দেখে তোমরা শনাক্ত করতে পারবে আর খোদা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে উদাসীন নন। (সূরা আল নাহল: ১৪)

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فُرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ  
فَأَخَذَنَاهُ أَخْذًا أَوْيَالًا فَلَيْلًا فَلَيْلًا فَتَقَوَّنَ إِنْ كَفَرُتُمْ

আমরা, তোমাদের প্রতি সেই রসূলসদৃশ এই রসূল প্রেরণ করেছি, যাকে ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং ফেরাউন যখন এ রসূলের প্রতি অবাধ্য হলো, তখন তাকে আমরা এমন শাস্তির মাধ্যমে ধৃত করলাম, যার পরিণাম ছিল ‘ওবাল’ অর্থাৎ সেই শাস্তির ফলেই ফেরাউন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। (সূরা আল মুজামিল: ১৬-১৮)

الْفَارِّ كَمْ حَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَمْ يَرَأْنَ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ تَحْنُنْ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سِيَهْزُمُ الْجَمْعُ وَ  
يُؤْلُونَ الدُّبُرَ

সুতরাং, তোমরা যারা ফেরাউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছ, অবাধ্য হয়ে তোমরা কীভাবে রেহাই পেতে পার? তোমাদের অস্ত্রাকারকারীরা কী ফেরাউনের দলবল থেকে উত্তম, নাকি ঐশী গ্রন্থে শাস্তি পাওয়া ও ধৃত হওয়া থেকে তোমাদেরকে নিরাপদ ও নির্দোষ আখ্যায়িত করা হয়েছে? এরা কি বলে যে, আমাদের জামাত বড় শক্তিশালী জামাত, যারা ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী? অচিরেই এই পুরো জামাত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। (সূরা আল কামার: ৪৪-৪৬)

وَلَا يَأْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصْبِبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا فَلَعْنَةٌ مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَعْتَقِي وَعْدُ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ

আর এই কাফিররা সর্বদা কোন না কোন লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতেই থাকবে, যতক্ষণ না সেই সময় এসে যায়, যার প্রতিশ্রূতি খোদা দিয়েছেন। খোদা প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করেন না। (সূরা আর রাদ: ৩২)

وَلَقَدْ سَيِّقُتْ لِكَمْنَاتٍ لِعِبَادَنَا الْمُرْسِلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَلَقَدْ جَنَّدَنَا لَهُمُ الْغَلِيبُونَ فَتُؤْلَى  
عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ قَسْوَفَ يُعْصِرُونَ

রসূলদের সম্পর্কে পূর্ব থেকে আমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, সাহায্য ও বিজয় তাদেরই প্রাপ্য। আর আমাদের বাহিনীই সদা জয়যুক্ত থাকবে। সুতরাং যতক্ষণ সেই প্রতিশ্রূতি পূর্ণ না হয়, তাদেরকে উপেক্ষা কর। তাদেরকে সেই পথ প্রদর্শন কর আর অচিরেই তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। (সূরা আস সাফকাত: ১৭২-১৭৬)

وَلَقَدْ كُلِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَهُمْ صَرْنَاءً وَلَا مُبْلِلَ لِكَلْمَتِ  
اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَارِي الْمُرْسِلِينَ

আর তোমার পূর্বে যেসব নবী এসেছে, তাদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও তারা দৈর্ঘ্য ধারণ করেছে। আর দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদেরকে দুঃখ দেয়া হয়েছে, এমনকি এক পর্যায়ে আমাদের সাহায্য এসে গেছে। অতীতের রসূলদের সংবাদও তোমার কাছে এসে গেছে। (সূরা আল আন-আম: ৩৫)

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَاتُوا لَوْلَا جَنَّبَنِيهَا قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُكُمْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْيَّ مِنْ رَبِّيْ هَذَا بَصَارِبُ مِنْ  
رَّبِّكُمْ وَهَذَيْ وَرَحْمَةٌ لِفَوْرِيْ بِعِصْمَوْنَ

যেদিন তুমি তাদেরকে কোন আয়াত শোনাও না, সেদিন তারা বলে, আজকে তুমি কোন আয়াত কেন বানালে না? তাদেরকে বল, আমি কেবল সেই বাণীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবর্তীণ হচ্ছে। নিজের পক্ষ থেকে কিছু আবিক্ষার করা আমার কাজ নয়। আর এগুলো এমন কথা নয়, যা কোন মানুষ প্রতারণামূলকভাবে বানাতে পারে। আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এগুলো দৃষ্টি উন্মোচনকারী অর্থাৎ এগুলো নিজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। (সূরা আল আ'রাফ: ২০৪)

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكُفَّارِ لِيُبَيِّنَ الْحَقَّ وَيُبَطِّلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ  
الْمُجْرِمُونَ

অধিকন্তে তা ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও আশীর্বাদ। স্বীয় উক্তির মাধ্যমে আপন বাণীর সত্যতা প্রমাণ করা আর অবিশ্বাসীদের মিথ্যা বিশ্বাসকে মূল হতে কর্তনের অভিপ্রায় আল্লাহর রয়েছে, যেন সত্য ধর্মের সত্যতা ও মিথ্যা ধর্মের মিথ্যা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া যায়, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (সূরা আল আনফাল: ৮-৯)

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْتَهُوا أَوْ يَقْتَلُوا أَوْ يُخْرُجُوا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

তুমি সে সময়কে স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমাকে বন্দী করা বা হত্যা করা বা বহিকারের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পরিকল্পনা করত আর করছিল আর খোদাও পরিকল্পনা করছিলেন; কিন্তু খোদা সর্বশেষ পরিকল্পনাকারী। (সূরা আল আনফাল: ৩১)

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْنَ اللَّهِ مَلِرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرْوَلْ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُحْلِفَ وَعِدْدَهُ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ

সুতরাং তাদের জন্য ঘটটা সম্ভব ছিল তারা ষড়যন্ত্র করেছে আর তাদের সকল ষড়যন্ত্র খোদার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্র পাহাড়কে নিজ স্থান থেকে অপসারণ করার মত ভয়াবহ হলেও তুমি মনে করো না যে, এর মাধ্যমে খোদার সে সকল প্রতিশ্রূতি টলে যাবে, যা তিনি স্বীয় রসূলদেরকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা ইব্রাহিম: ৮৭-৮৮)

لَرَأَدْكَ إِلَى مَعَادٍ

আর তিনি তোমাকে সেখানে ফিরিয়ে আনবেন, যে স্থান থেকে তুমি বহিক্ষৃত হয়েছ। (সূরা আল কাসাস: ৮৬)

الَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

স্মরণ রাখবে, খোদার সাহায্য সন্নিকট। (সূরা আল বাকারা: ২১৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُنْ أَدْلُلُمْ عَلَى تِجَارَةِ تَنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلَيْهِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُّجَاهِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِاِمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ دِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَبَرُّ مِنْ تَعْتَهَا أَلَّا هُنْ وَمَسْكِنَ طَبِيعَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ دِلِكَ الْفُورُ الْعَظِيمُ وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

হে যারা ঈমান এনেছ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সংবাদ দেব, যা তোমাদের বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? খোদা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আন আর খোদার পথে নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ উজাড় করে জেহান কর, কেননা এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এর কল্যাণে খোদা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন আর সে সকল জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন, যার তলদেশে স্বতঃস্বিনী প্রবাহিত। আর সেই প্রাসাদ দান করবেন, যা পবিত্র ও চিরস্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। মানুষের জন্য এটিই পরম সৌভাগ্য। দ্বিতীয়টি হলো তা, যা তোমরা এ পৃথিবীতেই চাও, অর্থাৎ খোদার পক্ষ থেকে সাহায্য ও এক আশু বিজয়। (সূরা আস সাফ: ১১-১৪)

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَلَا تَأْكُلُوا إِنَّمَا الْأَعْوَانُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

সুতরাং, তোমরা আলস্য প্রদর্শন করো না আর দুঃখিতও হয়ো না। অবশেষে তোমরাই বিজয় লাভ করবে, যদি তোমরা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। (সূরা আলে ইমরান: ১৪০)

وَلَئِنْ سَعَيْتُمْ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قِبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آذِيَّةً كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقْتَلُوا  
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টান এবং অন্যান্য মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক মর্মপীড়া দায়ক কথা শুনবে। (সূরা আলে ইমরান: ১৮-৭)

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقْتَلُوا لَا يَضْرُوكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

কিন্তু যদি ধৈর্য ধর এবং সকল প্রকার অধৈর্য ও হা-ভৃতাশ পরিহার কর, তাহলে তাদের ঘড়্যন্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান: ১২১)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْوَالُهُمْ مَمْنُونَ وَعَيْلُوا الصَّلِيلَاتِ لَيُسْتَخْلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتُخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ وَلَيُبَيَّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أُرْتَفِي لَهُمْ وَلَيُبَيَّنَ لَهُمْ مَنْ بَعْدَ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ  
لَا يُسْرِعُونَ بِإِيمَانِهِمْ

তোমাদের কিছু সংখ্যক পুণ্যবান বিশ্বাসীকে খোদা এই প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন যে, ভূগঠে তিনি তাদেরকে স্বীয় প্রিয় রসূলের খলীফা নিযুক্ত করবেন, তাদের মত যেভাবে পূর্বে বানিয়েছেন। তাদের যে ধর্ম তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীতে দৃঢ়তা দান করবেন এবং সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত

করবেন। বিশ্বাসীদের ভয়ের অবস্থার পর অর্থাং খাতামুল আবিয়া (সা.)-এর মৃত্যুর কারণে যখন এই আশঙ্কা দেখা দেবে যে, হয়ত এখন ধর্ম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে; তখন সেই ভয় ও আশঙ্কার অবস্থায় খোদা তাঁলা সত্য বা প্রশ়ি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় নেরাজের হৃষকি থেকে মুসলমানদের দুষ্টিমুক্ত করে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার খাঁটি ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এ হলো বাহ্যিক শুভসংবাদ। কিন্তু কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে খোদার চলমান রীতি হলো, এর অভ্যন্তরে একটি অন্তর্নিহিত অর্থও থাকে আর তা হলো, আধ্যাত্মিকভাবে। এ আয়াতগুলোতে আধ্যাত্মিক খিলাফতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যার অর্থ হলো সকল ভয়ভীতির মাঝে অর্থাং যখন খোদার ভালোবাসা হৃদয় থেকে উঠে যায় আর বিকৃত ধর্মাবলী সর্বত্র ছড়িয়ে যায়, মানুষ দুনিয়ামুখী হয়ে পড়ে আর ধর্ম হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, এমন সময় খোদা সর্বদা আধ্যাত্মিক খলীফাদেরকে দাঁড় করানো অব্যাহত রাখবেন, যাদের হাতে আধ্যাত্মিকভাবে ধর্মের সাহায্য ও বিজয় এবং সত্যের সম্মান ও মিথ্যার লাঞ্ছন প্রকাশ পাবে। যাতে ধর্ম সর্বদা নিজের প্রকৃত সতেজতা ফিরে পায় আর বিশ্বাসীরা অষ্টতার বিস্তার ও ধর্মের অবলুপ্তির আশঙ্কা থেকে নিরাপত্তার মাঝে এসে যায়। (সূরা আল নূর: ৫৬)

وَدَتْ طَلْفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِبْرِ لَوْ يُضْلُلُوكُمْ وَمَا يَشْعُونَ لَا إِنْفَهْمُ وَمَا يَشْعُونَ

এরপর বলেন, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের একটি শ্রেণি যে করেই হোক তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়। তোমাদেরকে কী পথভ্রষ্ট করবে, তারা নিজেদেরকেই ভষ্টতার মাঝে ঠেলে দিচ্ছে, যদিও বিভ্রান্ত হবার কোন ধারণা তাদের নিজেদেরই নেই। (সূরা আলে ইমরান: ৭০)

وَيُجْزِيُونَ أَنْ يُحْسِدُوا بِمَا لَوْ يَعْلَمُوا لَأَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَا تَحْسِبَهُمْ قِنْقَابَ أَلْبَمْ

তারা সে সকল কাজের জন্য প্রশংসা কুড়াতে চায়, যা তারা করে নি। সুতরাং তুমি এ ধারণা করো না যে, তারা শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে। বরং তাদের জন্য একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান: ১৮৯)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا أُسْمَهُ وَسَلَّى فِي خَارِبَهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرْكُبُوهَا لَا خَيْرٌ لَّهُمْ فِي الْذِي أَخْرَجُوا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

সে ব্যক্তি থেকে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে! যে খোদার মসজিদে তাঁর

স্মরণের বা ইবাদতের পথে বাধা দেয় এবং মসজিদ নষ্ট ও ধ্বংস করার পায়তারা করে? তিনি সেসব খ্রিষ্টানদের বাজে অভ্যাস ও নৈরাজ্যকর আচার-আচরণের কথা বলেছেন, যারা বাইতুল মুকাদ্দসের সম্মানের প্রতি ঝঙ্কেপ করে নি। একে অহংকারপ্রসূত উচ্ছ্঵াস নিয়ে ধ্বংস করেছে। এ আয়াতের পর বলেন, যে সকল খ্রিষ্টান এমন অহংকার করেছে, তারা পৃথিবীতে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হবে আর পরকালেও তাদের জন্য থাকবে মহাশান্তি। (সূরা আল বাকারা: ১১৫)

وَلَقُلْ كَتَبْنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْيَكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الْصَّلِبُونَ

আমরা যবুরে যিকেরের পর লিখে দিয়েছি যে, যারা পুণ্যবান তারাই ভূমির অর্থাৎ সিরিয়ার উত্তরাধিকারী হবে (যবুর: ৩৭)। (সূরা আল আখিয়া: ১০৬)

فِي اللَّهِمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِّزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذْلِّي  
مَنْ تَشَاءُ إِبْرَاهِيمَ الْخَيْرَ لِإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ

তুমি বল, হে খোদা! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দাও আর যার হাত থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে চাও সম্মান দাও আর যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। মানুষ যে সকল কল্যাণের সন্ধান করে, তা তোমারই হাতে আর তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান: ২৭)

فُلْ مَا يَعْوَدُ إِلَّمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُهُ فَقَدْ لَذَّبَهُ فَسْوَفَ يَكُونُ لِرَأْمَا

কাফেরদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা খোদার দাসত্ব না কর, তাহলে তিনি তোমাদের কীহিবা ঝঙ্কেপ করেন? যেহেতু তোমরা আনুগত্য ও দাসত্বের পরিবর্তে মিথ্যা প্রতিপন্থ করাকে বেঁচে নিয়েছে, তাই অচিরেই তোমরা এর শান্তি পেতে যাচ্ছ। (সূরা আল ফুরকান: ৭৮)

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ غَيْرُ مَعْجِزِ اللَّهِ لَا وَأَنَّ اللَّهَ مُحْرِزِي الْفَلَّيْفِينَ

আর তোমরা নিশ্চিত হতে পার যে, তোমরা খোদাকে তাঁর কাজে ব্যর্থ করতে পারবে না আর খোদা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (সূরা আত তাওবা: ২)

أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدْ يُرِيرُ

যারা তোমাদের অন্যায় যুদ্ধ ও হত্যার ঘড়িয়ন্ত্রের কারণে নির্যাতিত, তাদের অনুকূলে সাহায্যের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আর খোদা তাদের সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (সূরা আল হাজ্জ: ৮০)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّعُ إِلَيْهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ  
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ هُنَّا يَلْهُوُونَ بِهِمْ وَهُوَ أَعْرِيزُ الْحَكِيمُ

তিনি সেই দয়ালু ও করুণাময় খোদা, যিনি মানুষের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে এমন এক কামেল রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পবিত্র করেন, কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন! অথচ তারা নবীর আবির্ভাবের পূর্বে প্রকাশ্য ভষ্টায় নিপত্তিত ছিল। আর তাদের দলে অন্য দেশের লোকও রয়েছে, যাদের আদি হতে ইসলামে প্রবেশের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও মুসলমানদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় নি। আর খোদা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান, যার কাজ প্রজ্ঞাশূন্য নয়। (সূরা আল জুমআ: ৩-৮) অর্থাৎ স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে খোদা অন্যান্য দেশের লোকদের মুসলমান হওয়ার যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে সময় যখন এসে যাবে, তখন তারা ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدِّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهُهُمْ وَيُجْهِنُهُمْ أَذْلَلُهُ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَلُهُمْ عَلَى الْكُفَّارِ

হে বিশ্বসীগণ! তোমাদের কেউ যদি ইসলামধর্ম পরিত্যাগ করে, তবে তার স্থানে খোদা এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন আর তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মু'মিনদের সামনে বিনত-বিন্মৃ থাকবে আর কাফিরদের বিরুদ্ধে হবে জয়যুক্ত ও কঠোর। (সূরা আল মায়দা: ৫৫) অর্থাৎ খোদার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, সবসময় যা হবে তা হলো, বুদ্ধির ফেরে পড়ে কেউ যদি ইসলাম ছেড়ে দেয় তাহলে তার ধর্ম ছেড়ে দেয়ার ফলে ইসলাম ধর্মের কোন ক্ষতি হবে না, বরং সেই এক ব্যক্তির স্থানে খোদা বহু বিশ্বস্ত লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করবেন, যারা নিষ্ঠার সাথে এর ওপর সৈমান আনবে আর খোদার প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ বলে গণ্য হবে। অপরাদিকে-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُصْدُ وَاعْنَ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تُلَوِّنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً  
ثُمَّ يُغْلِبُونَ

সে সকল কাফের, যারা ইসলাম ধর্মকে বাধাগ্রাস্ত ও অবরুদ্ধ করার জন্য নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করছে, তারা সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত সেই অপচেষ্টা চালিয়ে যাবে, কিন্তু পরিণতিতে সে সমুদয় ব্যয় তাদের জন্য আক্ষেপ ও হা-ভতাশের কারণ হবে এবং তারা পরাজিত হবে। (সূরা আল আনফাল: ৩৭)

وَعَدَ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَخْلُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هُنَّهُ وَكَفَ أَيْرَى النَّاسِ عَنْهُمْ وَلَتَكُونُنَّ أَيَّةً لِإِسْمُوْمِنِينَ

খোদা তোমাদেরকে অনেক দেশের মালে গণিমত দান করার প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন। সেগুলোর প্রথম ঘটনা যা ঘটেছে তা হলো তিনি ইহুদীদের দুর্গপ্তলো সকল ধনসম্পদসহ তোমাদেরকে দান করেছেন আর বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, যেন তা মু'মিনদের জন্য একটি নির্দশন হতে পারে। (সূরা আল ফাতহ: ২১) খোদা তোমাদের অন্যদেশ অর্থাৎ পারস্যও আর রোমান সাম্রাজ্য (রোম) ইত্যাদিও দান করবেন।

وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَيْهَا قُدْحَاطَ اللَّهِ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

তোমাদের শক্তি এসব করতলগত করতে অক্ষম, কিন্তু খোদার শক্তি সেসবকে পরিবেষ্টন করে আছে আর খোদা তাঁলা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আল ফাতহ: ২২) এ পর্যন্ত থাকলো সে সব ভবিষ্যদ্বাণী যাতে বাহ্যিক শুভসংবাদ রয়েছে; এরপর অন্তর্নিহিত শুভসংবাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَئِنْ اللَّهُ لِيَعْفُرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهُمْ يَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقُنَّ جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا

যে সকল কাফির ও মুশরিক অবিশ্বাস নিয়েই মারা যাবে তাদের পাপ ক্ষমা করা হবে না। তাদের অবিশ্বাসের অবস্থায় খোদা তাদেরকে স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানের পথ দেখাবেন না, বরং জাহানামের পথ দেখাবেন যাতে তারা চিরকাল বসবাস করবে। (সূরা আন নিসা: ১৬৯-১৭০)

وَالَّذِينَ امْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَلَوْرُهُمْ

কিন্তু যারা খোদা ও রসূলের প্রতি ঈমান আনবে তারাই খোদার দৃষ্টিতে সিদ্ধীক বা নিষ্ঠাবান আর তাদের জন্য থাকবে পুরক্ষার। তাদের জন্য আলো থাকবে। (সূরা আল হাদীদ: ২০)

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَزُورُ الْعَظِيمُ

আর তারা এ জগতেই শুভসংবাদ লাভ করবে। অর্থাৎ তারা খোদা থেকে এলহামের জ্যোতি লাভ করবে এবং শুভসংবাদ পাবে যাতে থাকবে, তাদের কল্যাণ, প্রশংসা ও স্মৃতি; অধিকন্তু খোদা তাদের সত্যতাকে দীপ্তিময় করবেন।

খোদা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার সবই পূর্ণ হবে।\* খোদার কথায় কোন প্রকার পরিবর্তন আসবে না। এটিই মহা সৌভাগ্য। (সূরা ইউনুস: ৬৫) কেবল তারাই এর ভাগী হয় যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلِكُكُتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى الْبَيْتِ طَيَّبَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَاعَيْلِهِ وَ سَلِيمُوا شَلِيمِهَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَمْفَهِنَا

খোদা ও তাঁর সকল ফিরিশতা এই সম্মানিত নবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও তার প্রতি দরুদ প্রেরণ কর আর সুগভীর নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে সালাম কর। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের ওপর খোদার অভিসম্পাত। পৃথিবীতে যা হবে তা হলো, তারা আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত থাকবে আর পরকালে লাঞ্ছনিক জঙ্গনার সাথে জাহানামের আয়াবে নিষ্কিঞ্চ হবে। (সূরা আল আহযাব: ৫৭-৫৮)

স্বীয় স্বয়ংস্তরতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতাপের সুবাদে উপরোক্ত বর্ণনায় সফলতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; কোন বিশ্বাসী ও সত্যান্বেষী এসব প্রতিশ্রুতি কোন মানুষের কাজ বলে সন্দেহ করতে পারে কি যা যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং করে চলেছে? দেখ! একজন দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ এবং একান্ত অসহায় দীনহীন ব্যক্তি স্বীয় ধর্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভের সংবাদ তখন দিয়েছেন, যখন তার কাছে সহায়সম্বলহীন কতক দরবেশ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। মুসলমানের মোট সংখ্যা যা ছিল, একটি ছোট কক্ষেই তাদের সংকুলান সম্ভব হতো আর হাতের আঙুলে এক এক করে তা গণনা করা যেতো। এক গ্রামের কয়েক ব্যক্তির পক্ষেই তাদেরকে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল। অথচ যাদের সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে, তারা ছিল জগতের বাদশাহ ও শাসক। এদেরকে যেসব জাতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তারা সংখ্যায় ছিল কোটি কোটি, কিন্তু তবুও এদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার বিষয়ে ছিল তারা বন্ধপরিকর। আজ পৃথিবীর প্রাপ্তে প্রাপ্তে দৃষ্টিপাত করে দেখ! খোদা তাঁলা কীভাবে সেই দুর্বল ও মুষ্টিমেয় কিছু লোককে পৃথিবীময় বিস্তৃত করেছেন, কীভাবে তাদেরকে শক্তি, সম্পদ ও রাজত্ব দান করেছেন আর কীভাবে সহস্র সহস্র বছর ধরে সিংহাসনে আসীন ছিল যারা,

---

\* টীকা: পাদটীকা-১ দেখ, তাহলে বুবাবে, এই ভবিষ্যত্বাণী কীভাবে পূর্ণ হচ্ছে।

তাদের সিংহাসন ও মুকুট এদের হাতে তুলে দেয়া হলো? এমন একটি সময়ও ছিল যখন সেই জামা'তের সদস্য সংখ্যা ততটাও ছিল না, যতটা এক পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা হয়ে থাকে, অথচ পৃথিবীতে এখন তাদের সংখ্যাই কোটি কোটি। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার বাণীর বক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং আমি করব। এখন দেখ! এটি কি সত্য নয় যে, সেই শিক্ষা যা মহানবী (সা.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তার বাণী বা গ্রন্থের মাধ্যমে পৌঁছিয়েছেন, তা তাঁর গ্রন্থে বরাবর সংরক্ষিত হয়ে চলে আসছে। লক্ষ লক্ষ হাফেয় রয়েছে কুরআনের, আর এই রীতি চলে আসছে সূচনালগ্ন হতেই। খোদা বলেছিলেন, কোন ব্যক্তি প্রজ্ঞা, তত্ত্বজ্ঞান, আলংকারিকতা ও বাণিজ্য, ঐশ্বী জ্ঞান পরিবেষ্টন ও ধর্মীয় প্রমাণাদি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। অতএব, দেখ! কেউ সামনে দাঁড়াতে পারে নি। কেউ যদি একথা অস্বীকার করে, তবে এখনও করে দেখাক। এ গ্রন্থে, যাতে ১০ হাজার রূপির বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আমরা মানবীয় শক্তিবহির্ভূত যেসব তথ্য, তত্ত্ব ও কুরআনের বিষয়কর বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছি, তা অন্য কোন গ্রন্থ থেকে আমাদেরকে বের করে দেখাক। যতদিন উপস্থাপন না করবে ততদিন খোদার স্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণ তার সামনে দণ্ডয়মান থাকবে। খোদা তা'লা বলেছিলেন, আমি সিরিয়াকে খ্রিস্টানদের হাত থেকে মুক্ত করে মুসলমানদেরকে সেই ভূমির উত্তরাধিকারী করবো। দেখ! এখন পর্যন্ত সেই ভূমির উত্তরাধিকার মুসলমানদেরই হাতে। এ সংবাদগুলো এমন, যার সাথে অলৌকিক বিষয়াদি ও ঐশ্বী ক্ষমতা সম্পৃক্ত। এমন নয় যে, ভূমিকম্প আসবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, এক জাতির ওপর অন্য জাতি আক্রমণ চালাতে থাকবে, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হবে আর মহামারী ইত্যাদির বিস্তার ঘটবে মর্মে জ্যোতির্বিদদের অর্থহীন কথার ন্যায় নিছক কোন সংবাদ মাত্র। খোদার উক্তির অনুবর্তিতায় আর এরই প্রভাব ও কল্যাণে যারা কুরআন শরীফ অনুসরণ করে, খোদার প্রিয় রসূলের প্রতি আত্মিকভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁকে ভালোবাসে আর তাঁকে পুরো সৃষ্টি জগত, সকল নবী-রসূল, সকল পবিত্র মানব এবং সেসব বস্তুনিচয়, যা প্রকাশিত বা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে, তা হতে শ্রেয়, অধিক পবিত্র, শ্রেষ্ঠতম ও মহান জ্ঞান করে, তারাও সেসব নিয়ামত থেকে এখন পর্যন্ত অংশ পায়। আর যে শরবত মুসা ও ঈসাকে পান করানো হয়েছে, সেই শরবত অজস্র ধারায়, অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও সুমধুর স্বাদে পান করে এবং করছে। ইস্রাইলী জ্যোতি তাদের মাঝে দেদীপ্যমান। ইয়াকুবের বংশের নবীদের

কল্যাণরাজি তাদের মাঝে বিদ্যমান। সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্; হ্যরত খাতামুল আম্বিয়া কত মহান মর্যাদার নবী। খোদার কসম! কত মহান জ্যোতি তাঁর! তাঁর তুচ্ছ সেবক, তুচ্ছতিতুচ্ছ উম্মতি এবং তাঁর অতি নগণ্য চাকরও উল্লিখিত মর্যাদায় উপনীত হয়।

اللهم صل على نبيل وحبيل سيد الأنبياء وأفضل الرسل وخير المرسلين،  
 وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه وبارك وسلام

এ যুগের পাদিপঙ্গিত, ব্রাক্ষ ও আর্য এবং অন্যান্য বিরোধী যেন আশ্চার্যাপ্তি হয়ে একথা না বলে যে, সে সকল কল্যাণরাজি কোথায়? সেই স্বর্গীয় জ্যোতি কোথায় যাতে মহানবী (সা.)-এর উম্মত ঈসা ও মুসার উম্মতের কল্যাণরাজির অংশীদার আর তারা সেসব জ্যোতির উত্তরাধিকারী, যা থেকে অন্য সব জাতি ও ধর্মানুসারীগণ বঞ্চিত? এই সন্দেহ দূরীভূত করার নিমিত্তে আমরা বারবার এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে এসেছি যে, সত্যান্বেষীর জন্য- ইসলামের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেখে তৎক্ষণিকভাবে মুসলমান হতে যে প্রস্তুত, তাকে এই ধর্মীয় প্রমাণ দেয়ার জন্য আমরাই দায়বদ্ধ। আর পাদটীকা-২ এর ‘দ্বিতীয় রূপ’-এ আমরা এদিকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছি; বরং খোদা হিসেবে খোদা তাঁলা যেভাবে স্বীয় শক্তিমত্তা, কৃপা ও কল্যাণরাজি মুসলমানদের ওপর প্রকাশ করেন, সেসব ঐশী প্রতিশ্রূতি ও সুসংবোধগুলোর কিছুটা হলেও এই টীকায় লিপিবদ্ধ করেছি, যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। অতএব, যদি কোন পদ্ধী বা পাণ্ডিত বা ব্রাক্ষ, যে হন্দয়-চক্ষুর অঞ্চলের কারণে অস্বীকার করে, বা আর্য ও অন্যান্য ফিরকা হতে কেউ যদি সততা ও সত্যতার সাথে সত্যান্বেষী হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হবে, সত্যান্বেষীর ন্যায় স্বীয় সকল অহংবোধ, গর্ব ও কপটতা, জগৎপূজা, হঠকারিতা ও বাগড়াবিবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে একশ ভাগ সত্যের বাসনা নিয়ে সত্যান্বেষী হিসেবে এদিকসেদিক না তাকিয়ে দীনহীন, বিনয়ী ও তুচ্ছ এক ব্যক্তির ন্যায় সোজা আমাদের কাছে চলে আসা আর ধৈর্য, সহনশীলতা, আনুগত্য এবং নিষ্ঠাকে সত্যবাদীদের ন্যায় অবলম্বন করা, যেন খোদার ইচ্ছায় স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। এখনও যদি কেউ অনীহা প্রদর্শন করে তাহলে সে নিজেই নিজের স্বামানহীনতার সাক্ষ্য দিয়ে এমনটি করবে। কিছু অদুরদর্শী মানুষ যখন দেখে যে, খোদার নবী ও রসূলরাও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন; তখন তারা এই অজুহাত দেখায় যে, অলৌকিক ঐশী ক্ষমতা যাকে ঐশী সংবাদের চিহ্ন মনে করা হয়, তা যদি নবীদের সাথে থাকত

তাহলে তাদের কেন কষ্ট হয় আর কেনইবা সবচেয়ে বেশী সমস্যায় তারাই জর্জরিত হন? এই সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে ভিন্নভীন, নিছক মনোযোগের অভাবে এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ঐশ্বী সংবাদ, খোদার ক্ষমতা ও প্রতাপমূলে বর্ণিত হওয়া এক বিষয়, আর নবীদের সমস্যাকবলিত হওয়া ভিন্ন বিষয়, যাতে বিভিন্ন প্রকার প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত থাকে। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলে তোমরা জানতে পারবে যে, সেসব সমস্যা সত্যিকার অর্থে সমস্যা নয়, বরং বড় বড় পুরুষকার, যা কেবল তাদেরকেই দেয়া হয়, যারা খোদার কৃপা ও বদান্যতায় ধন্য হন। আর এগুলো এমন নেয়ামত বা পুরুষকার যাতে নবী এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে। নবীগণ ও আল্লাহ তাঁর ওলীদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হলো, সকল চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানুষকে তাদের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করা আর যেসব বিষয়ে খোদা তাদেরকে অবিচলতা দান করেছেন, সকল সত্যাষ্টেষীর দৃঢ়তার সাথে সেসব পথে পদচারণা করা। এটি অতি স্পষ্ট কথা যে, কোন ব্যক্তির উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রমাণ তখন সামনে আসে, যখন তা যথাসময়ে প্রকাশ পায় আর হৃদয়েও এর প্রভাব তখনই পড়ে থাকে। যেমন মার্জনা- সেটি নির্ভরযোগ্য ও প্রশংসনীয়, যা প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় প্রদর্শন করা হয়। আর সেই পরহেজগারী বা সাধুতা নির্ভরযোগ্য যা প্রবৃত্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অবলম্বন করা হয়। বস্তুত নবী ও ওলীদের সম্পর্কে খোদা তাঁলা চান যে, তাদের সকল প্রকার চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশ পাক এবং তা প্রমাণিত হোক। সুতরাং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য খোদা তাঁলা তাদের আলোকিত জীবনকে দু'ভাগে ভাগ করেন, এক অংশ কাটে কষ্ট ও সমস্যার মাঝে। সকল প্রকারের দুঃখকষ্ট দেয়া হয়, যেন তাদের সেই উন্নত চরিত্র প্রকাশ পেয়ে যায়, যা ভয়াবহ সমস্যা ছাড়া আদৌ প্রকাশ পাওয়া ও প্রমাণিত হওয়া সভ্ব নয়। তাদের ওপর যদি সেই ভয়াবহ সমস্যা না আসে, তাহলে কী করে প্রমাণিত হবে যে তারা এমন এক জাতি, যারা সমস্যায় কবলিত হলে স্বীয় প্রভুর সাথে অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে না, বরং আরো এগিয়ে যায় এবং সম্মানিত খোদা তাঁলার দরবারে এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, তিনি সকলকে বাদ দিয়ে তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়েছেন, তাঁর জন্য এবং তাঁর পথে দুঃখকষ্টে জর্জরিত হওয়ার যোগ্য তাদেরকেই মনে করেছেন। অতএব, তাঁদের ধৈর্য, অবিচলতা, পৌরুষ, দৃঢ়চিন্তা, বিশ্বস্ততা ও বীরত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য মানুষের সামনে প্রকাশ করার মাধ্যমে এবং তাদের *الْكِرَامَةُ فَوْقُ الْإِسْتِقْمَامَةِ* ‘অবিচলতা নির্দশনের চেয়েও মহান’

প্রমাণ করার লক্ষ্য, খোদা তাঁলা তাদের ওপর বিপদাপদ অবতীর্ণ করে থাকেন। কেননা চরম সমস্যা ছাড়া পূর্ণ ধৈর্য প্রকাশ পেতে পারে না, আর মহান অবিচলতা ও দৃঢ়চিন্তিতা ভয়াবহ ভূমিকম্প ছাড়া বোঝা যায় না। এসব সমস্যা নবী ও গুলীদের জন্য আধ্যাত্মিক নিয়ামত হয়ে থাকে যার মাধ্যমে সেসব শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণবলী প্রকাশ পায় আর পরকালে তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। খোদা যদি তাদের ওপর এসব বিপদাপদ আপত্তিত না করতেন, তাহলে নিয়ামত বা পুরক্ষারাদিও লাভ হতো না, আর না সাধারণে তাঁদের মহান চরিত্র যথাযথভাবে প্রকাশ পেত। বরং তাঁরা অন্যান্যদের মতো এবং তাঁদেরই সমপর্যায়ের প্রমাণিত হতেন। সেক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষণস্থায়ী জীবন যতই বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করতেন, অবশেষে একদিন এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হত আর তখন তাঁদের সেই আরাম-আয়েশও অবশিষ্ট থাকত না এবং পারলোকিক মহান মর্যাদাও লাভ হত না। অধিকন্তু এ পৃথিবীতে তাঁরা সেভাবে জগৎজোড়া পৌরূষ, বীরত্ব, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা ও খ্যাতি লাভ করতেন না, যে কারণে তাঁরা এমন নমস্য হয়েছেন যাদের সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁরা এমন অনন্য প্রমাণিত হয়েছেন যাদের মত আর কেউ নেই, এমন অদ্বিতীয় প্রমাণিত হয়েছেন, যাদের কোন জুড়ি নেই, দৃষ্টির এতটা অত্রালে পৌছেছেন, যে পর্যায়ে কোন ধ্যানধারণাও পৌছুতে পারে না আর এতটা পরিপূর্ণ ও সাহসী প্রমাণিত হয়েছেন, যেন এক বক্ষে সহস্র সিংহ আর এক দেহে সহস্র চিতা যার শক্তি ও ক্ষমতা সবার ধরাছোয়ার উর্ধ্বে আর যা নৈকট্যের সবচেয়ে মহান মর্যাদায় পৌছে গেছে।

নবী ও গুলীদের জীবনের দ্বিতীয় দিকটি বিজয়, উন্নতি ও সম্পদের ক্ষেত্রে পরম মার্গে উপনীত থাকে, যেন তাদের চরিত্রে সেই দিকগুলো প্রকাশিত হয়, যা প্রকাশের জন্য বিজয়ী, সৌভাগ্যবান ও সম্পদশালী, কর্তৃত্ববান এবং ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক। কেননা দুঃখ প্রদানকারীদের অন্যায় ক্ষমা করে দেয়া, কষ্টদাতাদেরকে উপেক্ষা করা, শক্রদেরকে ভালোবাসা, অকল্যাণকামীদের কল্যাণ কামনা করা, সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন না হওয়া, সম্পদ পেয়ে অহংকারী না হওয়া, প্রাচুর্যে কার্পণ্য না করা, দয়া, উদারতা ও বদান্যতার দ্বার উন্মুক্ত করা আর সম্পদকে কখনও রিপুর ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম হিসেবে না নেয়া আর ক্ষমতাকে অত্যাচার ও নিষ্পেষণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করা; এসব এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা প্রমাণের জন্য

সম্পদশালী ও শক্তিশালী হওয়া হলো পূর্বশর্ত। আর তখনই তা প্রমাণিত হয়, যখন শৌর্য-বীর্য ও ক্ষমতা থাকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার যুগ আর সম্পদ ও ক্ষমতার যুগ আসা ছাড়া যেহেতু এই উভয় প্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে পারে না, তাই আল্লাহ তাল্লা সীয় পরম প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে নবী ও ওলীদেরকে এই উভয় অবস্থায় ধন্য করতে চান, যা সহস্র সহস্র নিয়ামতের সমাহার। কিন্তু এই উভয় অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার যুগ সবার জন্য একই ধারাবাহিকতায় আসে না, বরং ঐশী প্রজ্ঞা কারও কারও জন্য শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের যুগ জীবনের প্রথম ভাগে নিয়ে আসে এবং কষ্টের যুগ পরে আর অপর কিছু লোকের ক্ষেত্রে প্রথম যুগে কষ্ট আসে আর শেষদিকে আসে ঐশী সাহায্য। কতকের ক্ষেত্রে উভয় অবস্থা প্রাচলিত থেকে যায়, আবার কতকের ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী রয়েছেন খাতামুর রসূল হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)। কেননা মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এসবের প্রকাশ ঘটেছে আর এমন ধারাবাহিকতায় এসেছে, যার কল্যাণে মহানবী (সা.)-এর সকল উন্নত নেতৃত্ব গুণাবলী সূর্যের মত আলো ঝলমল হয়ে উঠেছে আর **عَلَىٰ حُكْمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (সুরা আল কালাম: ৫) এ বর্ণিত বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হওয়া সকল নবীর চারিত্রিক সৌন্দর্যকেই প্রমাণ করে, কারণ তিনি (সা.) তাঁদের নবুয়ত ও তাঁদের কিতাবের সত্যায়ন করেছেন এবং তাঁরা যে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত, তা প্রকাশ করেছেন। এ সত্যায়নের মাধ্যমে সেই আপত্তিও দূরীভূত হলো, যা ঈসা (আ.)-এর চারিত্রি সম্পর্কে হৃদয়ে দানা বাঁধতে পারে, অর্থাৎ হ্যরত ঈসা (আ.)-এর চারিত্রিক সৌন্দর্য উপরোক্তিষিখিত উভয় যুগের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয় বরং এক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিতও হয় না। কেননা হ্যরত ঈসা (আ.) সমস্যার যুগে যে ধৈর্য ধারণ করেছেন, সেই ধৈর্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও যথার্থতা কেবল তবেই প্রমাণিত হত যদি মসীহ (আ.) সীয় পীড়নকারীদের বিরংদে ক্ষমতা ও বিজয় লাভ করে তাদের অন্যায় আচরণ আন্তরিকভাবে ক্ষমা করতেন, যেভাবে মহানবী (সা.) মক্কাবাসী ও অন্যান্যদের ওপর পূর্ণ বিজয় লাভ করে এবং তরবারির নিচে পেয়েও তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কেবল মুষ্টিমেয় সে ক'জন লোককে শান্তি দিয়েছেন, যাদের শান্তি দেয়ার জন্য মহাসম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ এসে গিয়েছিল। চির অভিশপ্ত সেই ক'জন লোক ছাড়া সকল শক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন আর বিজয় অর্জন করে - **لَا تُشَرِّبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ** - এর

গণ-ঘোষণা দেন (অর্থাৎ গণসাক্ষর ঘোষণা দেন)। নিজেদের দুক্ষর্মের ওপর দৃষ্টিপাতে তারা নিজেদেরকে প্রতিপক্ষের হাতে মৃত বলে জ্ঞান করত। পক্ষান্তরে সেই ক্ষমার সুবাদে, যা বিরোধীদের দৃষ্টিতে এক অসম্ভব বিষয় বলে মনে হতো, সহস্র সহস্র মানুষ তৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। সেই স্বর্গীয় ধৈর্য, যা মহানবী (সা.) দীর্ঘকাল তাদের কঠোর থেকে কঠোরতর যাতনার মুখে প্রদর্শন করেছেন, তা সূর্যের ন্যায় তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে একথা মানুষের অভ্যাসের অন্তর্গত যে, কেবল সে ব্যক্তির ধৈর্যের মাহাত্ম্য ও সম্মান মানুষের সামনে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়, যে কঠোর যুগের অবসানে কষ্টদাতাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা লাভ করেও তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। তাই ঈসা (আ.) এর ধৈর্য, নমনীয়তা ও সহনশীলতা-সংক্রান্ত চারিত্রিক গুণাবলী যথাযথভাবে প্রমাণিত হয় নি আর এ বিষয়টি ভালভাবে খোলাসা হয় নি যে, মসীহর সহনশীলতা কী স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, নাকি বাধ্যবাধকতার? কেননা অত্যাচারীদের মার্জনা করবেন, নাকি প্রতিশোধ নেবেন, তা পরথ করতে ঈসা (আ.) ক্ষমতা বা শক্তির যুগ দেখাই হয় নি। অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর চরিত্রে তা শত শত ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে আর তাঁর ক্ষেত্রে এগুলোর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তাঁর সত্যতা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। বদান্যতা, উদারতা, দানশীলতা, ত্যাগতিতীক্ষ্ণা, মানবিকতা, বীরত্ব, তাকওয়া, অঙ্গে তুষ্টি ও জগত বিমুক্তা সংক্রান্ত নৈতিক গুণাবলী মহানবীর পরিত্র সন্তান এমনভাবে দেদীপ্যমান, প্রদীপ্তি ও সমুজ্জ্বল ছিল যে, কেবল ঈসা (আ.)-ই নন, বরং মহানবী (সা.)-এর পূর্বে পৃথিবীতে কোন এমন নবী অতিবাহিত হন নি যার চরিত্র এমন পরিপূর্ণ স্পষ্টতায় দেদীপ্যমান ছিল। কেননা মহানবী (সা.)-এর জন্য খোদা তাঁলা অশোষ ধনভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়েছেন আর তিনি (সা.) এর পুরোটাই খোদার পথে ব্যয় করেছেন। এর কোন একটি শষ্য-দানাও নিজের আরাম ও বিলাসিতার জন্য ব্যয় করেন নি। কোন বাসস্থান নির্মাণ করেন নি, আর কোন অট্টালিকাও বানান নি, বরং ছোট একটি মাটির ঘরে নিজের পুরোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, যা গরীবদের কুটিরের চেয়ে উত্তম কিছু ছিল না। দুর্ব্যবহারকারীদের সাথে তিনি সন্দ্যবহার করে দেখিয়েছেন। যারা ছিল তাঁর মর্মযাতনার কারণ। তাদের কঠোর সময় নিজের সম্পদের মাধ্যমে তাদেরকে সুখ পৌছিয়েছেন। শোবার বিছানা প্রায়শ তিনি (সা.) মাটিতে পাততেন, বসবাসের জন্য ছিল একটি ছোট ঝুপড়ি ঘর আর খাওয়ার জন্য নির্ভর করতেন ভুট্টার রংটির ওপর কিংবা অনাহারে

থাকতেন। জাগতিক ধনসম্পদ তাঁকে অচেল দেয়া হয়েছে, কিন্তু মহানবী (সা.) জাগতিকতার মাধ্যমে নিজের পবিত্র হাতগুলোকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করেন নি। দারিদ্র্যকে সর্বদা সমৃদ্ধির ওপর, আর দীনতাকে প্রাচুর্যের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের দিন থেকে প্রিয় বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি স্বীয় মহা-মহিম প্রভু ছাড়া আর কারো পরোয়া করেন নি। শতভাগ খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সহস্র সহস্র শক্তির মোকাবেলায় রণাঙ্গনে দণ্ডয়ামান হয়ে স্বীয় বীরত্ব, বিশ্঵স্ততা ও অবিচলতা দেখিয়েছেন, যেখানে মৃত্যুর সমূহ আশঙ্কা ছিল। এক কথায়, বদান্যতা ও উদারতা, জগতের প্রতি অনীহা, অল্লে তুষ্টি, পৌরষ, বীরত্ব ও খোদাপ্রেম-সংক্রান্ত যেসব মহান চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে, তা-ও সম্মানিত খোদা মহানবীর মাঝে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কখনও প্রকাশিত হয় নি আর ভবিষ্যতেও প্রকাশ পাবে না। কিন্তু হ্যরত ঈসা (আ.) এর সত্তায় এমন গুণাবলী ভালোভাবে প্রমাণিত হয় নি। কেননা এসব বৈশিষ্ট্য বা চারিত্রিক গুণাগুণ, ক্ষমতা ও বিস্তৈভেতবের যুগ ছাড়া প্রমাণিত হয় না আর হ্যরত ঈসা ক্ষমতা ও বিস্তৈভেতবের সময়কাল দেখেন নি। তাই তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর উভয় পিঠ পর্দার অন্তরালেই প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে, শর্ত যেমন ছিল, তেমনটি প্রকাশ পায় নি। সুতরাং মসীহর দুর্বল অবস্থার ক্ষেত্রে যে আপত্তি বর্তায়, তা মহানবী (সা.)-এর মহানন্দিত জীবনালেখ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গেছে। কেননা মহানবীর সম্মানিত সত্তা সকল নবীকে পরিপূর্ণতা ও উৎকর্ষতা দিয়েছে। মসীহ (আ.) ও অন্যান্য নবীর সত্তা সম্পর্কে যা কিছু ছিল সন্দেহযুক্ত ও প্রচন্দ, সেই মহান সত্তার মাধ্যমে তা জাঞ্জল্যমানরূপে প্রতিভাত হয়েছে। সেই পবিত্র সত্তায় খোদা তাঁ'লা এই অর্থে ওহী ও রিসালত সমাপ্ত করেছেন অর্থাৎ সকল প্রকার অনুপম গুণাবলী সেই সম্মানিত ও উদার সত্তায় পরম উৎকর্ষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটি খোদার কৃপা, তিনি যাকে চান তাকে এতে ধন্য করেন।

**দশম সন্দেহ:** কিছু সংখ্যক অদূরদর্শী ব্যক্তি এই সন্দেহ ব্যক্ত করে যে, এলহামের ত্রুটি ও দুর্বলতা হলো— তা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের মার্গে উপনীত হওয়ার পথে অস্তরায়,\*(পাদটীকা-২) যা চিরস্থায়ী জীবন ও স্থায়ী পুণ্য অর্জনের প্রকৃত উপায়! এই আপত্তিসংক্রান্ত কথা তারা এভাবে তুলে ধরে যে, এলহাম

বি. দ্র.: পাদটীকা নম্বর দুই (২) এই পুস্তকের ২০৯ পৃষ্ঠায় আছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে পড়ে নিন। —অনুবাদক

চিন্তাভাবনার উন্নতির পথে অন্তরায় আর গবেষণা কর্মের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। কেননা এলহাম মান্য করা বা শিরোধার্য করার প্রেক্ষাপটে সব কথার উভয়ে এটি বলাই যথেষ্ট মনে করা হয় যে, আমাদের ঐশ্বী পুস্তকে এ বিষয়টি বৈধ বা অবৈধ হিসেবে লেখা আছে আর যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনভাবে অকেজো ও অকার্যকরাবস্থায় ছেড়ে দেয়, যেন খোদা তাদেরকে সেসব শক্তিই দেন নি। অব্যবহারে সেসব শক্তি ক্রমশ দুর্বল বরং বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যায় আর মানব-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে পঙ্গু মত হয়ে যায়। মানব প্রকৃতির মহান উৎকর্ষতা হলো যৌক্তিক বিষয়ে উন্নতি করা, অথচ তা বৃথা নষ্ট হয়ে যায় আর পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা থেকে মানুষ বিরত থাকে। মানুষের যে চিরস্থায়ী জীবন ও স্থায়ী পুণ্য অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে, তা অর্জনের পথে ঐশ্বী গঠাবলী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

**উন্নত:** স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদার সত্য গ্রন্থের অনুসরণ বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো ছেড়ে দেয়ার নামান্তর! এলহাম ও বুদ্ধি যেন, একে অন্যের বিরোধী ও পরিপন্থি, যা সহাবস্থান করতেই পারে না! ব্রাহ্মদের এমনটি মনে করা চরম নির্বাদ্বিতা ও অদূরদর্শিতা বরং হঠকারিতা বৈ কিছু নয়। আর এই অভ্যুত্ত সন্দেহ, অভ্যুত্ত সব বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত যার উপাদানগুলোর কিছু হলো মিথ্যা, কিছু বিদ্যে এবং কিছু অজ্ঞতা। মিথ্যা এই অর্থে যে, যদিও তারা ভালোভাবে জানে যে, ঐশ্বী সত্যের উন্নতি সদা তাদের মাধ্যমেই হয়ে আসছে, যারা এলহামের প্রতি অনুগত। আর পৃথিবীতে খোদার একত্ববাদের গৃঢ় শিক্ষা প্রচার প্রসারকারী কেবল সেসব ঘনোভীতসম্মানিত মানুষই ছিলেন, যারা খোদার বাণীতে বা গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। কিন্তু আবার জেনেশনে এই জানা সত্যের বিরুদ্ধে কথাও বলেছে। এদের বিদ্যে ও গোঁড়ামি দেখ! অযথা নিজেদের কথা সঠিক প্রয়াণ করার অপপ্রয়াসে এই স্পষ্ট সত্যকে গোপন করেছে যে, ঐশ্বী বিষয়ে নিছক বুদ্ধি, পূর্ণ বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছে দিতে পারে না। আর অজ্ঞতা দেখ! এলহাম ও বিবেকবুদ্ধি, এ দু'টোকে পরস্পর বিরোধী বিষয় জ্ঞান করে বসে আছে, যা সহাবস্থান করতে পারে না আর এলহামকে যুক্তিবুদ্ধির জন্য ক্ষতিকর ও পরিপন্থি আখ্যায়িত করেছে, অথচ এই আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। এটি জানা কথা যে, সত্যিকার এলহামের অনুসারী যৌক্তিক গবেষণা থেকে বিরত থাকতে পারে না, বরং বস্তুর স্বরূপ বোঝার জন্য এলহামের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে। এলহামের সাহায্যে ও এলহামের

আলোর কল্যাণে যুক্তিবুদ্ধিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সে কখনও প্রতারণার শিকার হয় না আর ভাস্তিতে নিপতিত (তথাকথিত) বুদ্ধিমানদের ন্যায় অনর্থক যুক্তিপ্রমাণ দাঁড় করানোর কোন প্রয়োজন পড়ে না, আর কোন কৃত্রিমতারও আশ্রয় নিতে হয় না। বরং যা সঠিক, বুদ্ধিমতাপ্রসূত পথ, তা তার চোখে পড়ে। প্রকৃত সত্যের ওপর তার দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। এক কথায়, যুক্তির কাজ হলো এলহামে উচ্চ কথাকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করা আর এলহামের কাজ হলো যুক্তিবুদ্ধিকে যত্রত্র হাবুড়ুর খাওয়া হতে রক্ষা করা। এমন পরিস্থিতিতে জানা কথা যে, যুক্তিবুদ্ধি ও এলহামের মাঝে কোন বিবাদবিরোধ নেই আর একটি অন্যটির বিপরীত এবং বিরোধী নয়। সত্য এলহাম অর্থাৎ কুরআন শরীফ বুদ্ধিবৃত্তিগত উন্নতির জন্য মাইল ফলক-স্বরূপ, বরং এটি বিবেককে আলোর দিশা দেয় আর এর অভিভ্রত সাহায্যকারী ও সহায়ক এবং তত্ত্বাবধায়ক। যেভাবে সূর্যের মূল্য চোখ থাকলেই বোৰা যায় আর আলোকেজ্জল দিনের উপকারিতা দৃষ্টিবান মানুষের সামনেই স্পষ্ট হয়। অনুরূপভাবে, খোদার বাণীর মূল্যায়ন পূর্ণরূপে কেবল তারাই করতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। যেমন আল্লাহ তাল্লা বলেন— ﴿إِنَّمَاٰنَّمُّلْكَ بِهِٰ لِّيَسْ وَمَا يَعْلَمُونَ﴾<sup>১</sup> অর্থাৎ আমরা মানুষের জন্য এ সকল উপমা বর্ণনা করি, কিন্তু যুক্তির নিরিখে কেবল তারাই এসব বোৰো, যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। (সূরা আল আনকাবুত: 88) একই মাপকার্তিতে, যেভাবে দৃষ্টি-শক্তির কল্যাণ কেবল সূর্যের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়, অর্থাৎ যদি তা না থাকে, দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিহীনতার কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না। অনুরূপভাবে, যুক্তির দৃষ্টি বা অন্তদৃষ্টির সৌন্দর্যও এলহামের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়। কেননা তা বিবেককে সহস্র সহস্র বিভাস্তি থেকে মুক্ত রেখে চিন্তা করার জন্য নিকটতম পথ বলে দেয়। আর যে পথে চললে স্পন্দন সময়ে উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে, সেই পথ প্রদর্শন করে। সকল বিবেকবান ভালোভাবে জানে যে, যদি কোন বিষয়ে ভাবার সময় এতটা সাহায্য লাভ হয়, অর্থাৎ কোন বিষয়ে সঠিক পথ অবলম্বন-সংক্রান্ত জ্ঞান যদি অর্জন হয়, সেই জ্ঞানের মাধ্যমে চিন্তাচেতনা দৃঢ়তা লাভ করে আর অনেক অগোছালো ধ্যানধারণা এবং অনর্থক মাথাব্যথা হতে পরিত্রাণ লাভ হয়। এলহামের অনুসারীরা কেবল নিজেদের ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে যুক্তি ও বুদ্ধির উন্নত গুণাবলীর অনুগমন করে এমন নয়, বরং স্বয়ং এলহামই তাদের বিবেককে দৃঢ় করার তাগাদা প্রদান করে। অতএব, যুক্তিবুদ্ধির ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য দ্বিপাক্ষিক আকর্ষণ তাদেরকে

অনুপ্রাণিত করে। একটি হলো প্রকৃতিগত উচ্ছ্বাস, যার কল্যাণে মানুষ সকল বস্তুর স্বরূপ ও বাস্তবতাকে যুক্তি ও প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে চায়, দ্বিতীয়টি হলো এলহামে প্রদত্ত তাগাদাসমূহ, যা মানুষের মাঝে এক দুর্বার আগ্রহ সৃষ্টি করে। যারা কুরআন শরীফকে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতেও দেখে, তারাও এই স্পষ্ট বিষয়ের কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, এই পবিত্র বাণীতে চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগানো বা অনুশীলনের বড় বড় তাগাদা দেয়া হয়েছে, এমনকি মু'মিনদের পরিচয়ই এটি নির্ধারণ করেছে যে, তারা সর্বদা আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান বিস্ময়কর সব বিষয়াদী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে আর ঐশ্বী প্রজ্ঞার প্রকাশসংক্রান্ত আইন বা বিধান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করা অব্যহত রাখে। যেভাবে কুরআনের এক স্থানে বলেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَابْنَ الْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِّا يُؤْمِنُ بِهَا كُوُنَّ اللَّهُ  
قَبِيلًاً وَقُعُودًاً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَكْفَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّكَمَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِّلا

(সূরা আলে ইমরান: ১৯১-১৯২)

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মাঝে বিশ্বস্তুর অস্তিত্ব ও শক্তি সম্পর্কে বহু নির্দশন বিদ্যমান। বুদ্ধিমান তারা, যারা বসে, দাঁড়িয়ে ও পার্শ্বদেশে ঘোরা অবস্থায়ও খোদাকে স্মরণ করে। যারা পৃথিবী, আকাশ ও অন্যান্য সৃষ্টির সৃজন সম্পর্কে চিন্তা ও প্রণিধানে রত থাকে। তাদের হৃদয়ে ও মুখে এই দোয়া বিরাজমান থাকে যে, হে আমাদের প্রভু! তুমি এ সকল বস্তু নিচয়ের কোন কিছুকে বৃথা ও অনর্থক সৃষ্টি কর নি। তোমার সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু প্রকৃতির বিস্ময় ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, যা তোমার পবিত্র সন্তার প্রমাণ বহন করে। অবশ্য অন্যান্য ঐশ্বী গ্রন্থ, যা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত, তাতে অযৌক্তিক ও অসম্ভব বিষয়ের ওপর হঠকারিতার সাথে অনড় থাকার তাগাদা পাওয়া যায়। যেমনটি কিনা, খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল। কিন্তু এটি এলহামের দোষ নয়, এটি সত্যিকার অর্থে ক্রটিপূর্ণ বুদ্ধির দোষ। মিথ্যা পূজারীদের বুদ্ধি যদি পরিপক্ষ হতো এবং ইন্দ্রিয় সঠিক হতো, তাহলে তারা কেন এমন পরিবর্তিত পরিবর্ধিত গ্রন্থ অনুসরণ করতো আর কেন তারা অপরিবর্তনশীল ও উৎকর্ষ এবং অনাদি-অনন্ত খোদার ওপর এ সকল বিপদাপদ ও সমস্যাবলী আসতে পারে বলে বৈধ জ্ঞান করতো? যেন তিনি এক দুর্বল শিশু হিসেবে ক্রমাগতভাবে অপবিত্র খাবার খেতে থাকেন, অপবিত্র দেহ ধারণ করেন এবং

নোংরা পথে নির্গত হয়ে নশ্বর জগতে পদার্পন করেন। বিভিন্ন প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন আর অবশেষে চরম দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থতার মাঝে ‘এলি এলি’ করতে করতে অঙ্কা পেয়েছেন। এলহামই ছিল, যা অবশেষে এই আস্তিকে দূর করেছে। আল্লাহ্ অতীব পবিত্র। কত মহান ও কত বিশাল করণ্ণাসমুদ্র সেই বাণী, যা সৃষ্টি পূজারীদেরকে পুনরায় একত্ববাদের প্রতি ফিরিয়ে এনেছে। কতই না চিত্তার্থক ও আকর্ষণীয় সেই জ্যোতি, যা এক বিশ্বজগতকে অন্ধকার কোণ থেকে বাইরে এসেছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও সহস্র সহস্র মানুষ বুদ্ধিমান আখ্যায়িত হয়ে এবং দার্শনিক সেজে এই আস্তি এবং এ ধরনের অগণিত আস্তিতে নিমজ্জিত হয়ে আসছে। কুরআন শরীফ যতদিন আসে নি, কোন বিজ্ঞ এত জোরালোভাবে এই মিথ্যা বিশ্বাসের খণ্ডন লিখে নি আর এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির সংশোধন করে নি, বরং জ্ঞানীরা নিজেরাই এমন শত শত অপবিত্র বিশ্বাসে কল্পিত ও লিঙ্গ ছিল। যেমন পাদী ইয়োত সাহেব লিখেন যে, সত্যিকার অর্থে এই বিশ্বাস খ্রিস্টানরা প্লেটো থেকে গ্রহণ করেছে। এই গ্রীক নির্বাদের আন্ত ভিত্তির ওপর আরও একটি আস্তির ভিত্তি রাখা হয়েছে। এক কথায় সত্য ও পূর্ণ এলহাম বিবেকের শক্র নয়, বরং দুর্বল বুদ্ধি নিজেই হাতুড়ে বুদ্ধিমানদের শক্র। যেমন এটি জানা কথা যে, প্রতিমেধক স্বয়ং মানুষের দেহের জন্য ক্ষতিকর কোন জিনিস নয়, কিন্তু যদি কেউ নিজের অবিবেচনা বশত বিষকে প্রতিমেধক মনে করে, তাহলে এটি স্বয়ং তারই বুদ্ধির ভুল, প্রতিমেধকের নয়। অতএব স্মরণ রাখা উচিত, সকল বিষয়ের গবেষণার জন্য এলহামী গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি দেয়া বিপজ্জনক! এই সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে কাঞ্জানহীনতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। যেমন, আমরা লিখে এসেছি যে, এলহাম বিবেকের জন্য সত্যদর্শী আয়না স্বরূপ। এর সত্যতার এটিই বড় প্রমাণ যে তা এমন সকল বিষয় হতে সম্পূর্ণভাবে পরিত্র যা খোদার শক্তিমত্তা, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার নিরিখে অসম্ভব প্রমাণিত হয়। বরং ধর্মীয় বা ঐশ্বী সূক্ষ্ম বিষয়াদির ক্ষেত্রে, যা বহু পর্দার অন্তরালে প্রচল্ল এবং গভীর বিষয়, দুর্বল মানুষের বুদ্ধিবিবেকের জন্য সোটিই (এলহাম) একমাত্র পথপ্রদর্শক। তাই স্পষ্ট যে, এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিবেককে দুর্বল করে না, বরং বুদ্ধিকে সে সকল সূক্ষ্ম রহস্যাবলী উদঘাটনে সাহায্য করে, যে পর্যায়ে নিজ গুণে পৌছা যুক্তিবুদ্ধির জন্য দুরুহ ব্যাপার। সুতরাং বুদ্ধি গেল যে, সত্যিকার এলহাম অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে মানুষের কেবল লাভই হয়, কোন ক্ষতি নয়। এলহামের কারণে বুদ্ধি বিপদে পড়ে না, বরং সত্যিকার আশক্ষা থেকে মুক্তি

লাভ করে। সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এটি গ্রহীত, বরং সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয়াদির অঙ্গর্গত কথা যে, নিছক বুদ্ধি বা বিবেকের সিদ্ধান্তে ভুলভাস্তির আশঙ্কা থেকে যায় কিন্তু অদৃশ্যে জ্ঞাত সত্ত্বার কথায় ভুলভাস্তি থাকা সম্ভব নয়। অতএব, তোমরা নিজেরাই এখন কিছুটা ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা কর, যে বিষয়টি কোন কোন সময় স্বয়ং ভয়াবহ স্থলনের শিকার হয়, তার সাথে যদি এমন কোন সাথীকে সম্পৃক্ত করা হয়, যে তাকে স্থলিত হওয়া থেকে রক্ষা করে আর যেখানে স্থলনের আশঙ্কা থাকে, সেখানে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে সে তার জন্য ভাল নাকি মন্দ? সেই সাথী কি তাকে পরম অভীষ্টে পৌছালো, নাকি বাধাইস্ত করলো? সাহায্য ও সমর্থনকারীকে বিরোধী ও প্রতিবন্ধক মনে করা হবে আর পরিপূর্ণতাদাতা ও সম্পূর্ণকারীকে ডাকাত ও ক্ষতিকর গণ্য করা হবে— এটি কেমন অন্তর্দৃষ্টিহীনতা? নিজেদের ইন্দ্রিয়ের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে আর সত্যান্বেষী হয়ে এ বিষয়ে চিন্তা করলে আপনাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, খোদা তাঁলা যে যুক্তিবুদ্ধিকে এলহামের সাথী আখ্যা দিয়েছেন, তা বুদ্ধির জন্য ক্ষতিকর কোন বিষয় নয়, বরং একে বিভ্রান্ত ও বিচলিত পেয়ে সত্য সন্তান করার জন্য একটি নিশ্চিত মাধ্যম বা যন্ত্র দান করেছেন, যার চিহ্নিত করার কারণে বুদ্ধির যে লাভ হয়, তাহলো শত শত বক্র ও অনিশ্চিত পথে হাবুড়ুর খাওয়া হতে তা রক্ষা পায়, পথহারা ও বিভ্রান্ত হয় না, যত্রত্র দিশেহারা ঘুরে বেড়াতে হয় না, বরং উদ্বিষ্ট বিশেষ পথ পেয়ে যায় আর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অনর্থক প্রাণ নাশ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। এর দ্রষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায়, যেমন কোন অভিজ্ঞ সন্ধানকারী হারিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে সংবাদ দেয় যে, সে অমুক দিকে গিয়েছে, অমুক শহর, অমুক পাড়া এবং অমুক স্থানে আত্মগোপন করে আছে। অতএব, এমন সংবাদদাতা, যে হারিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সঠিক খবর আনিয়ে দেয় আর তার কাছে যাওয়ার সহজ ও সঠিক পথ বলে দেয়; আপনির ছলেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি বলবে না যে, আমাদের কাজে সে প্রতিবন্ধক সেধেছে। বরং সে তার কাছে এ মর্মে যারপরনাই কৃতজ্ঞ হবে যে, আমরা জানতাম না, সে আমাদেরকে অবহিত করেছে। আমরা যত্রত্র হাবুড়ুর খাচ্ছিলাম সে আমাদেরকে বিশেষ জায়গার সংবাদ দিয়েছে। আমরা অঙ্ককারে ঢিল ছুঁড়ছিলাম, সে আমাদের জন্য নিশ্চয়তার দ্বার উন্মোচিত করেছে। একইভাবে, খোদা তাঁলা যাদেরকে সুস্থ বিবেক দিয়েছেন, তারা সত্যিকার এলহামের কাছে ঝঁঝী, এর প্রশংসাকারী ও গুণকীর্তনকারী আর ভালোভাবে জানে এবং বোঝে

যে, সত্যিকার এলহাম তাদের চিন্তাধারার উন্নতির পথে অন্তরায় নয়, বরং চিন্তাধারার লাগামহীনতার পথে বাধ সাধে এবং বিভিন্ন জটিল ও অনিশ্চিত পথের মাঝে একটি বিশেষ পথকে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে, যে পথে বিচরণ করা বিবেকের জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। জীবনের সংক্ষিপ্ততা আর শক্তি, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির স্বল্পতার কারণে মানুষ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেসব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। আমরা বারবার লিখেছি, মানবীয় বোধবুদ্ধি সীয় প্রকৃতির ক্ষেত্রে এমন দুর্বল ও অসম্পূর্ণ যে, অন্য কোন সাথীর সাহায্য ছাড়া এর কোন কাজ চলতে পারে না। ঘটনার সাক্ষ্য যতক্ষণ সে না পায় ততক্ষণ কোন মামলা ধর্মীয় হোক বা জাগতিক, পরিষ্কার ও সঠিকভাবে তার মাধ্যমে মীমাংসা হতে পারে না। নির্ভরযোগ্য কোন মাধ্যমে যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ পায়, তখনই বুদ্ধির জন্য বিষয় এত সহজ হয়ে যায় যে, সমস্যার এক পাহাড় যেন মাথার ওপর হতে নেমে গেল। মানব বিবেক বা বুদ্ধি যেখানে প্রকৃতগতভাবে এক সাথীর মুখাপেক্ষী, সেখানে সে নিঃসঙ্গভাবে কী করে একা উন্নতি করবে? বিভিন্ন দফায় আমরা এটিও লিখে এসেছি যে, খোদা ও পারলৌকিক বিষয়ে বিবেক বা বুদ্ধির এই যে সীমাবদ্ধতা, তার সূরাহা করে কুরআন শরীফ। কেবল এতটাই নয়, বরং সকল ঘোষিক প্রমাণাদিও পরিত্র কুরআন নিজেই বর্ণনা করে আর সকল ধর্মীয় সত্যের পানে নিজেই পথপ্রদর্শক ও নেতা। এখনই এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি কেউ গবেষণা করতে চায়, বা এ কথার সত্যায়ন চায়, তাহলে এর জন্যও আমরাই দায়িত্ব নেবো। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান সন্ধানী পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং যেখানে সফলভাবে আপত্তি খঙ্গন করে পূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে পশ্চ হলো, ব্রাহ্মসমাজীরা তবুও কেন অপলাপ হতে বিরত হয় না? তারা কোন নেশার ঘোরে অচেতন, নাকি উন্নাদ? সকল ইন্দ্রিয় কি একসাথে বিকল ও অকেজো হয়ে গেল যে, শুনানো সত্ত্বেও শুনে না, বোঝানো হয়েছে তবুও বোঝে না, দেখানো হয়েছে তবুও দেখে না? স্মরণ রাখা উচিত, এই মর্মে তাদের সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে অমূলক ও নিরর্থক যে, গবেষণার ধারা অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে আর কোন পর্যায়ে এসে তা থেমে যায় না। যদি এমন হতো, তাহলে ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে কখনো কোন কাজ সমাপ্ত হতো না আর কোন বিচারক কোন মামলার বিচারকার্য সুনিশ্চিতভাবে নিষ্পত্তি করতে পারত না। অধিকন্তু আদালতের সিদ্ধান্ত স্থায়ী সন্দেহের কারণে অসম্ভব ও অবৈধ থেকে যেতো। একথা কি সঠিক যে, সকল বক্তৃর তত্ত্ব কখনও

কোনভাবে স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় না, বরং কথা ও বিতর্কের অবকাশ সদা থেকেই যায়? বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া এ মতামত আদৌ সঠিক নয়, বরং কোন ঘটনা ততক্ষণ সন্দেহযুক্ত থাকে আর পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয় না, যতক্ষণ কোন বিষয় উদ্ঘাটনে নিছক বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা হয়। সে সকল গুরুত্বপূর্ণ সাথীগুলোর একটি হলো রসূলের ওহী, যা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় ও পরকাল সংক্রান্ত বিষয়ের সংবাদ দাতা। তা যদি বুদ্ধির ভাগ্যে জোটে তাহলে যৌক্তিক গবেষণা পূর্ণ-বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছে যায়। অতএব, যুক্তিবুদ্ধি কখনও উৎকৃষ্ট এলহামের সাহচর্যে আর কখনও ক্রমাগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের ফলে আবার কখনও মজবুত ও সুদৃঢ় ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে অর্থাৎ উপলক্ষ যেমনই হোক না কেন, কোন সাথীর মাধ্যমে উৎকৃষ্ট বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছে যায়। অবশ্য বুদ্ধি যে পথে চলতে চায়, সে পথে যদি কোন সাথী না পায় তাহলে পূর্ণ ঈমানের পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে পৌছে না, বরং পৌছলেও একান্তই সেখানে পৌছে, যেখানে কেবল ধারণাই সার। কিন্তু অভীষ্ট পথের সাথী যখন লাভ হয়, তখন সে তাকে অবশ্যই দৃঢ়বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছে দেয়। (টীকা ১১ সমাপ্ত)

## পাদটীকা নম্বর এক (১)



সম্পত্তি কসুরের মৌলভী আরু আবদুল্লাহ্ সাহেবের একটি পুষ্টিকা ঘটনাক্রমে আমার দৃষ্টিগোচর হয়, যার শেষ দিকে তিনি এলহাম ও ওহী সম্পর্কে নিজের কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন। এই পুষ্টিকা রচনার পিছনে মৌলভী সাহেবের উদ্দেশ্য কী- তা যদিও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু মানুষ আমার কাছে যা বলেছে, আর আমি তা পাঠে যা অবগত হয়েছি, সে অনুসারে ওলীউল্লাহ্‌দের প্রতি যে এলহাম হতে পারে, মৌলভী সাহেব তা অস্বীকার করেন বলে প্রতীয়মান হয়। وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِ তার হৃদয়ে কী আছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। যাহোক, আমি এ পুষ্টিকা পাঠে যা বুঝেছি তাহলো, তিনি একটি আক্ষরিক বিতর্কের অবতারণা করে এলহাম সম্পর্কে লিখেছেন যে, অভিধানে এলহামের অর্থ হলো, الْهَامُ چیزے در دل انداد گشتن و آنچه خدار در دل انداد ز এলহাম এমন একটি জিনিস যা হৃদয়ে নিষ্কেপ করা হয়, আর প্রকৃতপক্ষে খোদা তাঁলাই এটি হৃদয়ে স্থাপন করেন। আর তড়িঘড়ি এ সম্পর্কে এই মতামত ব্যক্ত করে বসেছেন যে, এলহাম যেখানে কেবল হৃদয়ে উদ্ভৃত ভালো বা মন্দ ধ্যানধারণার নাম, সেখানে এটি কোন ওলী বা পুণ্যবান বা ঈমানদার মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। কেননা মানুষের হৃদয়ে নানা প্রকার ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয়েই থাকে। আর পৃথিবীতে এমন কে আছে, যার হৃদয়ে কোন ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয় না? এরপর মৌলভী সাহেব সংক্ষেপে অস্পষ্ট কিছু কথা লিখে তার বক্তব্যের ইতি টেনেছেন। পরিষ্কার করে ও স্পষ্টভাবে এমন কোন বাক্য লিখেন নি, যার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব হতো যে, মৌলভী সাহেবের এ কথা মানেন ও স্বীকার করেন যে, ওলীআল্লাহ্ ও কামেল মু'মিনগণ খোদার সাথে বিশেষ যোগাযোগ রাখেন, আর খোদা যখন চান, তাদেরকে স্বীয় বাণীর মাধ্যমে কতক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন এবং স্বীয় পরিব্রত বাক্যাবলীর মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করেন। আর هَلْ يُسْتَوِي الْأَعْنَى وَالْبَصِيرُ অনুসারে অন্যদের সে মর্যাদা লাভ হতে পারে না। এক কথায়, মৌলভী সাহেবের পুষ্টিকায় বিধৃত লেখার রীতি হতে অবশ্যই এই

বি. দ্র.: পাদটীকা নম্বর এক (১) টীকা নম্বর এগার (১১)-এর ১৩৮ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে। -অনুবাদক

সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর ওলীদের এলহাম সম্পর্কে তার মনে কিছুটা সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। আল্লাহ না করুন যদি এটিই মৌলভী সাহেবের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যা লেখা থেকে প্রতিভাত হয় তাহলে মৌলভী সাহেব যে মহা ভুল করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর ওলীরা ‘তাঁর পক্ষ থেকে এলহামপ্রাপ্ত’- এ বিষয়টি অস্বীকার করা কোন মুসলমানের জন্য সম্ভব নয়, আর মৌলভী সাহেবদের ক্ষেত্রে এমন কথাতো ভাবাই যায় না। মৌলভী সাহেব কি জানেন না যে, হ্যারত মুসা (আ.)-এর মায়ের সাথে এলহাম যোগে খোদার বাক্যালাপ হয়েছে? মরিয়মের সাথে এলহামে খোদার কথোপকথন, হাওয়ারীদের সাথে এলহাম যোগে খোদার বাক্যালাপের বিষয়টি স্বয়ং কুরআন শরীফে উল্লিখিত ও বর্ণিত রয়েছে, অর্থ তাদের কেউই নবী-রসূল ছিলেন না। মৌলভী সাহেব যদি এই উত্তর প্রদান করেন যে, আল্লাহর ওলীরা তাঁর পক্ষ থেকে এলহামপ্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে আমরা বিশ্বাস রাখি ঠিকই কিন্তু এর নাম এলহাম নয়, বরং ওহী। আমাদের মতে, এলহাম হৃদয়ের ধারণার নাম মাত্র; আর এ বিষয়ে মুমিন-কাফির, পাপাচারী ও পুণ্যবানের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এতে কারো কোন বিশেষত্ব নেই, এটি কেবল শার্দিক বিতর্ক- এ বিষয়েও মৌলভী সাহেব ভ্রাতৃতে নিপত্তিত কেননা এলহাম শব্দ যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা অভিধানিক বা শার্দিক অর্থে নয়, বরং মুসলমান আলেমরা এটি যেভাবে বুঝেন সে অর্থে এটি প্রযোজ্য। আদি থেকে আলেমদের এটিই রীতি যে, রিসালাত-সংক্রান্ত ওহী হোক বা অন্য কোন মু'মিনের প্রতি অবতীর্ণ ওহী-এলহামই হোক না কেন, তারা সব সময় এর অর্থ এলহামই করে থাকেন। সর্বজনবিদিত এই বিষয় বা ‘ওরফ’কে কেবল সে-ই জানে না, সত্য গ্রহণের পথে যার কোন স্বার্থ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নতুনা কুরআনের শত শত তফসীর ও বেশ কয়েক সহস্র ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে কেউ কোন একটি রচনাও উপস্থাপন করতে পারবে না যাতে এ অর্থে এলহামের ব্যবহারকে অস্বীকার করা হয়েছে। বরং বিভিন্ন স্থানে মুফাস্সিরগণ ওহী শব্দের অর্থ এলহাম করেছেন। অনেক হাদীসেও এ অর্থই দেখা যায়, যা সম্পর্কে মৌলভী সাহেব অনবহিত নন। তাই জানি না মৌলভী সাহেব কোথায় এবং কার কাছে শুনেছেন যে, ধর্মীয় পুস্তকে এলহাম শব্দের সে অর্থই করা উচিত যা অভিধানে লিখিত আছে? অর্থ আলেমদের বেশিরভাগ এলহামকে ওহীর প্রতি-শব্দ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে একমত, আর মহানবী (সা.)ও এটি ব্যবহার করেছেন। তাই এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া চরম স্বেচ্ছাচার। মৌলভী সাহেব কি জানেন না যে

শরিয়তে এ ধরনের শত শত সুপরিচিত বা সুবিদিত শব্দ রয়েছে যেগুলোর ভাবকে শার্দিক অর্থের গভিতে সীমাবদ্ধ করা একটি বিজ্ঞানি। স্বয়ং ‘ওহী’ শব্দটিকে দেখুন; এর যেসব অর্থের আলোকে ঐশী গ্রাহাবলী স্বর্গীয় বাণী আখ্যা পায়, তা অভিধানে কোথায় লেখা আছে? আর যে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে খোদা নিজ প্রেরিতদের সাথে বাক্যালাপ করেন এবং তাদের প্রতি শিক্ষামালা অবতীর্ণ করেন, তা কোন্ অভিধানে লেখা আছে? একইভাবে, ইসলাম শব্দটি নিয়ে ভাবুন! এর একমাত্র আক্ষরিক অর্থ কারো প্রতি দায়িত্ব ন্যস্ত করা বা ঝগড়া বিবাদ পরিহার ও ভুলভুলি উপেক্ষা করা এবং আনুগত্য করা। এতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহু পড়তে হবে, কোথায় লেখা আছে? তাই সকল শব্দের সিদ্ধান্ত অভিধান থেকে যদি করতে হয়, তাহলে মৌলভী সাহেবের মতে ইসলাম শব্দের মর্ম হবে কেবল মীমাংসা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা। অন্য সব অর্থ তখন অবৈধ ও ভাস্ত আখ্যা পাবে। আমরা ভাস্ত চিত্তাধারা ও অদূরদর্শিতা থেকে খোদার আশ্রয় চাই। এক কথায়, এটি কারো অজানা নয় যে, ধর্মের জ্ঞান হোক বা বস্তু-জগতের জ্ঞান, অথবা অন্য কোন জ্ঞানই হোক না কেন, সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিভাষাগত সুবিদিত এমন শব্দ অবশ্যই ব্যবহার হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে জ্ঞানের সেই বিশেষ শাখার জন্য ব্যবহৃত শব্দের পরিভাষাগত উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। এ জ্ঞানের মাধ্যমে অন্যের হিতসাধন ও স্বয়ং উপকৃত হওয়ার জন্য কিছু শব্দের অর্থ এসবের ‘ওরফ’ বা পরিচিত অর্থের নিরিখে নির্ধারণ করা ছাড়া আলেমদের কোন গত্যস্তর থাকে না, যা পাঠকদের অজানা নয়। কিন্তু মৌলভী সাহেব যদি আলেমদের ‘ওরফ’ বা জানা রীতি অনুসরণ করতে না চান, তাহলে ওলীদেরকে খোদার পক্ষ থেকে প্রদত্ত অদৃশ্য সংবাদের নাম তিনি ওহীয়ে এলেলা (সংবাদ প্রদান-মূলক) এবং ওহীয়ে এলাম (অবগতি-মূলক) রাখুন। কিন্তু তার জন্য এ কথা স্পষ্ট করা বাঞ্ছনীয় যে, তার ও মুসলমানদের অন্য জামা’তগুলোর মাঝে বিতঙ্গ কেবল শার্দিক, অর্থাৎ যে সকল ঐশী বিষয়ের নাম আমরা (অর্থাৎ মৌলভী সাহেব) ওহী রাখি, অন্যান্য মুসলমান আলেমরা সেসবকে এলামও আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাদের ও আমাদের মাঝে শতভাগ মতৈক্য রয়েছে— যেন মানুষ তার সম্পর্কে সন্দেহে নিপত্তি না থাকে, আর তার সন্দেহের দোলাচলে দোদুল্যমান কথা যেন নৈরাজ্যের কারণ না হয়। আর কোন মুসলমানের সাথে খোদা এলামের মাধ্যমে বাক্যালাপ করেন বলে যদি মৌলভী সাহেবের সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে এ অধম খোদার কৃপা ও তাঁর রহমতে আর আয়াত

وَأَنْوَسَارِهِ نَمُونَا سَرْكَبٌ فَحَبَّتْ  
মাধ্যমে স্বয়ং এ অধম সম্মানিত হয়েছে এবং যার সুবাদে মৌলভী সাহেব  
পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেন ও প্রশাস্তি পেতে পারেন, বরং নিশ্চিত হতে  
পারেন। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে মৌলভী সাহেব অবগত হবেন যে, এসব ঐশ্বী  
জ্ঞান ও স্বর্গীয় রহস্য যা মুসলমানদের উপর নিশ্চিত ও অকাট্য এলহামের  
মাধ্যমে উন্মোচিত হয়, ইসলাম-বিরোধীদের ভাগ্যে তা কখনো জুটতে পারে না,  
আর কখনো জোটেও নি। ইসলামের কোন বিরোধীর এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কথা  
বলার জো নেই। সুতরাং এখনে কিছু এলহাম বিশদভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা  
হল, যেগুলোর উল্লেখ করা আমি যুক্তিশুভ মনে করি-

### প্রথম ধরণ:

খোদা আমাকে এলহামের যে কয়েকটি ধরন বা প্রকার সম্পর্কে সংবাদ  
দিয়েছেন, এর প্রথম প্রকার বা শ্রেণি হলো, খোদা তাঁ'লা কোন অদৃশ্য বিষয়  
বান্দার সামনে প্রকাশ করতে চাইলে কখনওকোমলতা আর কখনওদৃঢ়তার  
সাথে কিছু বাক্য সামান্য তন্দ্রায় মুখ থেকে নিঃস্তৃত করেন। আর যে সকল  
বাক্য কঠোরতা ও দৃঢ়তার সাথে নিঃস্তৃত হয়, তা এত জোরালেভাবে মুখে  
আসে যেমনটি কিনা আকস্মিকভাবে পাথুরে ভূমিতে শিলাবৃষ্টি বর্ষিত হয় বা খুব  
দ্রুত ও প্রবল গতিসম্পন্ন ঘোড়ার খুর যেমনটি দ্রুতলয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে  
(তেমন অনুভূতি হয়)। এই এলহামে এক অভাবনীয় গতি, দৃঢ়তা ও ত্রাস  
বিরাজ করে, যার কল্পাণে পুরো দেহ আলোড়িত হয়, আর জিহ্বা এত দ্রুত  
এবং প্রতাপান্বিত ধ্বনি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতি ও ছন্দময় হয়ে উঠে যেন তা  
মানুষের মুখ নয়। এর সাথে এক ধরনের যে তন্দ্রাভাব বিরাজ করে  
এলহাম সমাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে তা কেটে যায়। এলহামের বাক্য যতক্ষণ  
সমাপ্ত না হয়, মানুষ অচেতন ও স্থির অবস্থায় মৃতবৎ পড়ে থাকে। এ সকল  
এলহাম বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেসব পরিস্থিতিতে নাযেল হয়, যখন দয়া ও কৃপার  
আধার খোদা স্বীয় অদৃশ্য প্রজ্ঞা ও উপযোগিতার নিরিখে কোন দোয়া গ্রহণ  
করতে চান না বা কিছুদিন তা বিলম্বিত করতে চান বা অন্য কোন খবর দিতে  
চান, যা মানবিক দুর্বলতার নিরিখে মানুষের কাছে অসহনীয় মনে হয়।  
দৃষ্টিস্পর্ধ, মানুষ যখন তড়িঘড়ি কোন বিষয় হাতে পেতে চায় কিন্তু ঐশ্বী  
প্রজ্ঞানুসারে তা অর্জিত হওয়া যদি তার জন্য নির্ধারিত না থাকে বা যদি পরে  
লাভ হওয়া নির্ধারিত থাকে, তখন এমন ভারী ও প্রতাপান্বিত ওহী অবতীর্ণ

হয়, যা খোদার নির্দেশে মুখ থেকে নিঃস্ত হতে থাকে। কোন কোন সময় আমার প্রতিও (এমনটি) হয়েছে, যা বর্ণনা করা দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হবে। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ কেবল একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য উপস্থাপন করছি। তা হল, খুব সম্ভব তিনি বছরের মত সময়-কাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে, আমি এ লক্ষ্যে দোয়া করি যে, মানুষ যেন এ গ্রন্থের (ছাপা ও প্রচার কার্যের প্রতি) মনোযোগী হয়— তখন সুন্দর ও কঠোর তাকিদপূর্ণ সেই এলহাম, যার কথা এখন আমি উল্লেখ করলাম, ﴿شَدِّيْدٌ بِّعْلَمٌ﴾ শব্দে অবতীর্ণ হয় আর এই এলহাম যখন এ অধ্যমের প্রতি নাযেল হয়, তখনই প্রায় ১০-১৫ জন হিন্দু ও মুসলমানকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যারা আজও কাদিয়ানে বসবাস করছে। এছাড়া এলহাম অনুসারে যেভাবে মানুষের পক্ষ থেকে ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হয়েছে তা-ও এরা ভালোভাবে অবহিত। দ্বিতীয় প্রকার এলহাম, অর্থাৎ এমন এলহাম, যাতে মুখ থেকে কথা কিছুটা কোমলতার সাথে মস্তুলভাবে নিঃস্ত হয়, এ শ্রেণির (এলহামের) ক্ষেত্রে কেবল নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এতটা লেখা যথেষ্ট হবে যে, উপরোক্ত প্রথম এলহামের পর একটি দীর্ঘসময় কেটে যায়। মানুষের অমনোযোগের কারণে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা দেখা দেয় আর সমস্যার কোন অঙ্গ ছিল না। এমতাবস্থায় একদিন সন্ধ্যার দিকে মহান আল্লাহ্ এই এলহাম করেছেন *هَزِ إِلَيْكَ بِجُنْدِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطُ عَلَيْكَ رَبِّ جَنِيَا* (সূরা মরিয়ম: ২৫) তখন আমি বুরতে পেরেছি যে, এটি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা ও তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার প্রতি ইঙ্গিত। অধিকন্তু এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, বইয়ের এ অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের ফলেই অর্থ সংগৃহীত হবে। এ সংক্রান্ত সংবাদও যথারীতি কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমানকে দেয়া হয়েছে। দৈবক্রমে সেদিন বা পরের দিন হাফেয় হিদায়েত আলী খান সাহেব কাদিয়ান আসেন, যিনি সে সময়ে এ জেলায় এক্সট্রা এসিস্টেন্ট ছিলেন, তাকেও এলহাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আমার মনে পড়ে, একই সঙ্গাহে আমি তার বন্ধু মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকেও অবহিত করেছি। এখন সার কথা হল, এই এলহাম অবতীর্ণ হওয়ার পর মহাসম্মানিত খোদার নির্দেশ অনুসারে আমি মানুষকে আহ্বান জানাই। এরপর লাহোর, পেশাওয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি, মালির কোটলা এবং আরো কয়েকটি স্থান থেকে, এক কথায় যেখান থেকে খোদা যতটা চেয়েছেন, ছাপাধীন এই অংশের জন্য সাহায্য আসে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্। এই সময় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, তা

হল, একদিন প্রভাতে কিছুটা তন্দুরাশ অবস্থায় আকস্মিকভাবে মুখ থেকে ‘আবদুল্লাহ খান ডেরা ইসমাইল খান’ নিঃস্ত হয়। এটিও একই প্রকার এলহামের একটি দ্রষ্টান্ত। এ সম্পর্কে কয়েকজন হিন্দুকেও অবহিত করা হয়, যারা তখনও আমার কাছে ছিল আর এখনও এখানেই বসবাস করে। সেদিন কাকতালীয়ভাবে সেই হিন্দুদের একজন ডাকবরে যায় এবং আবদুল্লাহ খান নামক এক ব্যক্তির প্রেরীত একটি পত্র নিয়ে আসে। একই সাথে কিছু রূপিও আসে। উল্লিখিত ঘটনার কিছুদিন পূর্বে অতি আশ্চর্যজনক একটি গ্রন্থি নির্দর্শন প্রকাশ পায়। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, কাদিয়ানের স্থানীয় স্কুলে অধ্যয়নরত ২০ বা ২২ বছর বয়স্ক একজন স্থানীয় আর্য-হিন্দু, যে এখনো এখানে অবস্থান করছে, দীর্ঘদিন ধরে যক্ষা রোগে আক্রান্ত ছিল। ধীরে ধীরে তার রোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং নৈরাশ্যকর লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। একদিন সে আমার কাছে এসে অবোরে কাঁদতে থাকে এবং জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য ব্যক্ত করে। তার কর্মণ দশা দেখে আমার অন্তর বিগলিত হয় আর খোদার দরবারে আমি তার জন্য দোয়া যাচনা করি। যেহেতু খোদার সন্নিধানে তার সুস্থতা লাভ নির্ধারিত ছিল, তাই দোয়া করতেই এলহাম হয় **مَلَكُ نَارٍ بَرْدَا وَ سَلَّمٌ قَلْنَى يَا نَارُ كُونَى بَرْدَا** অর্থাৎ আমরা যক্ষার অগ্নিকে বললাম তুমি ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে যাও। তখনই সেই হিন্দুসহ আরো কয়েকজন স্থানীয় হিন্দুকে এই এলহাম সম্পর্কে অবহিত করা হয় যারা এখনও এ গ্রামেই বসবাস করে। একইসাথে খোদার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে দাবি করা হয় যে, সে অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবে এবং এ রোগে সে আদৌ মরবে না। এরপর এক সঙ্গাহ না কাটতেই, উক্ত হিন্দু প্রাণসংহরী সেই রোগ থেকে পূর্ণ নিরাময় লাভ করে। সকল প্রশংসা আল্লাহর। মৌলভী সাহেব! এখন দেখুন, একে বলা হয় প্রমাণ। ধর্মের শক্তিদের বরাতে আর দয়ানন্দের অনুসারীদের সাক্ষ্য সংযুক্ত করে ইসলামের সত্য ও কল্যাণময় এলহামের প্রমাণ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং ধর্ম বিরোধীদেরকেই সাক্ষী নির্ধারণ করা-এর চেয়ে দ্রুতর কোন প্রমাণ পৃথিবীতে আছে কি? হে আমার সুহৃদ! আপনি কোথায় আর কোন দেশে এবং অন্য কোন ধর্ম, যেমন খ্রিস্টান, আর্য ও ব্রাহ্মণদের মাঝে ভয়াবহ বিরোধীদের সাক্ষ্য-সম্বলিত এ ধরনের সত্য ও আশিসময় এলহাম দেখেছেন যাতে এক নিরাশ ব্যক্তির জীবিত থাকার সংবাদ দেয়া হয়ে থাকবে- আর তাও এমন, যেন এক মৃত ব্যক্তি জীবন লাভের শুভসংবাদ লাভ করল? চাক্ষুষ কোন ঘটনা যদি স্মৃতিপটে থাকে, তাহলে দু’একটি উল্লেখ করুন।

এখন বলুন, এই আশিসময় এলহাম উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য নয় কি? অনুরূপভাবে শত শত এমনই সুমহান এলহাম সম্পর্কে আমাদের কাছে এত প্রমাণাদি রয়েছে যা আপনারা গুণেও শেষ করতে পারবেন না। আপনি দিনকে রাত আখ্যায়িত করেছেন, তবে বলুন, সুর্যকে এখন কোথায় লুকাবেন? আপনি ইসলাম ধর্মের বিরোধীদের ঘর সম্পর্কে কিছু খবর রাখেন কি? সেখানে ঈমানের জ্যোতি তো দূরের কথা, ঈমানই নেই। *وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ ثُورًا فَإِلَّا مَنْ نُورٌ* আপনি যদি একথা বলেন যে, আমরা ওলি-আল্লাহগণের এলহামে বিশ্বাস করি এবং একে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষত্ব হিসেবে গ্রহণ করি; কিন্তু ওলীদের প্রতি যে এলহাম হয়, একে সুনিশ্চিত জ্ঞানের কারণ মনে করি না, বরং আনুমানিক জ্ঞানের কারণ মনে করি! সত্য বলতে কী— এ কথা আপনার একটি সন্দেহ বৈ কিছু নয়, যার পক্ষে কোন যৌক্তিক ও কুরআন-হাদীস- ভিত্তিক প্রমাণ দেয়া যাবে না, বরং সঠিক ও নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা এবং কুরআনের সঠিক ও সুদৃঢ় আয়াত এর মিথ্যা হওয়ারই সাক্ষ্য বহন করে। সত্যিকার অর্থে এমন কুমন্ত্রণা কেবল সে সকল লোকদের হাতয়ে সৃষ্টি হয় যারা ঐশ্বী এলহামের উৎকর্ষ আলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বর্গীয় জ্ঞানের মর্যাদা অনুধাবনে অক্ষম। এছাড়া খোদা যে নিজ অনুসন্ধানীদেরকে বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের অনন্ত মর্যাদায় উপনীত করতে পারেন, সেসব ঐশ্বী দানের বিষয়ে তারা উদাসীন। এরা এ কথা বোঝে না যে, খোদা নিজ বান্দাদের হাতয়ে নিশ্চিতভাবে স্বর্গীয় জ্ঞান (এলমে লাদুন্নি) অর্জনের এক আকুল প্রেরণা জুগিয়েছেন, অধিকন্তু তাদের পুরো তত্ত্বজ্ঞান, প্রথর অস্তর্দৃষ্টি এবং পূর্ণ জ্যোতি পর্যন্ত পৌছার জন্য অদৃশ্য প্রেরণায় ব্যাকুল করে তুলেছেন। সেই মহানুভব খোদা এমন নন যে, তাদের আকুল আবেগ ও বেদনা এবং তাদের প্রেমাকুল প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেন। যতটা স্মৃত্বা সৃষ্টি করেছেন ততটা খাবার সরবরাহ করবেন না বা যতটা পিপাসা জাগিয়ে দিয়েছেন ততটা পানি পান করাবেন না, এটি হতেই পারে না। এক ব্যক্তি তাঁর জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রাণাধিক বাসনা রাখে এবং নিজের সকল শক্তি ব্যয় করে আর নিজ সত্ত্বার সকল শক্তি নিয়োজিত করে তাঁর পানে ছুটে-প্রশংস হলো, খোদা কি তার প্রতি করণ্ণা করবেন না? তিনিকি তার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিবেন না? তার দোয়া কি গৃহীত হওয়ার যোগ্য নয়? তার আহাজারি কথনো কি খোদা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না? খোদা কি তাকে ব্যর্থতার মাঝে ধ্বংস করে

দেবেন? সে কি সহস্র প্রকারের ব্যথা-বেদনা নিয়ে করবে যাবে? আর খোদা কি তার চিকিৎসা করবেন না? সেই মহা সম্মানিত প্রভু কি তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন বা ছেড়ে দেবেন? খোদা কি স্থীর সত্যবাদী ও অনুগত অনুসন্ধানীকে আপন নবীদের পথ দেখাবেন না? স্থীর বিশেষ নিয়ামতে কি ধন্য করবেন না? নিঃসন্দেহে তিনি স্থীর, অনুসন্ধানীদের প্রতি স্লেহ-দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। যারা তাঁর পানে ধারিত হয়, তিনি তাদের প্রতি তাদের চেয়ে অধিক বেগে (আগ্রহে) সাগ্রহে ছুটে আসেন। যারা তাঁর নেকট্য সন্ধান করে, তিনি তাদের অতি কাছে এসে যান, তিনি তাদের চোখ হয়ে যান যার মাধ্যমে তারা দেখে, তিনি তাদের কান হয়ে যান যার মাধ্যমে তারা শোনে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, যাদের চোখ ও কান সেই অদৃশ্য-জ্ঞাত সন্তা, (আল্লাহ) এমন ব্যক্তি কি খোদা-প্রদত্ত জ্ঞানে বিশ্বাসের জ্যোতি পর্যন্ত পৌছুবে না? সে কি অনুমান বা ধারণার মাঝেই নিমজ্জিত থাকবে? তোমরা নিশ্চিত জেনো, সত্যবাদীদের জন্য তাঁর দরজাগুলো তাদের নিষ্ঠা অনুপাতে খুলে। তাঁর ভাঙ্গারে কোন অভাব নেই। তাঁর সন্তায় কোন কার্পণ্য নেই। তাঁর কৃপারাজির কোন শেষ নেই, আর তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতিরও কোন সীমা নেই। অবশ্য প্রথমে অদৃশ্যের প্রভূত সংবাদরূপী নিয়ামত ও স্বর্গীয় নিশ্চিত জ্ঞানের ধনভাণ্ডার স্থীর মনোনীত রসূলদেরকে প্রদান করেছেন, কিন্তু এরপর পর্যন্ত পৌছুতে পারে, যা মূলত খোদার নবীদেরকে দেয়া হয়েছে। এই অর্থেই আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী আখ্যায়িত হন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উত্তরাধিকার লাভ তাদের জন্য যদি সম্ভবই না হতো, তাহলে তারা কী করে উত্তরাধিকারী হলেন? মহানবী (সা.) কি বলেন নি যে, এই উম্মতে মুহাম্মদ হবে আর আল্লাহ তাঁর বলেছেন নি যে, وَقُلْ رَبِّ رِزْقِيْ عَلِمٌ [وَقُلْ رَبِّ رِزْقِيْ عَلِمٌ] (সূরা আন কুরুত: ৭০) (সূরা তাহা: ১১৫) এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, ঐশ্বী জ্ঞানের ভিত্তি যদি সম্পূর্ণভাবে ধারণার ওপরই হয়ে থাকে, তাহলে এর নাম জ্ঞান কীভাবে হতে পারে? ধারণার কি এমন কোন গুরুত্ব আছে, যে কারণে একে জ্ঞান নাম দেয়া যেতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে [عَلِمٌ رِزْقُهُ مَنْ يَرَىْ] (সূরা আল কাহফ: ৬৬) এর কী অর্থ হবে? অতএব জানা উচিত যে, খোদার উক্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে চিন্তা এবং অপরাপর শত শত পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা থেকে এটিই প্রমাণিত হয়

যে, খোদা তা'লা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির্বর্গকে এই রসূলের আনুগত্যে বিলিনতার কারণে আর প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর অনুসরণ করার কল্যাণে এই রসূলের কল্যাণরাজি হতে অংশ দিয়ে থাকেন। এমন নয় যে, তিনি তাদের নিছক প্রাণহীন বৈরাগ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। আর কোন হৃদয়ে নবী (সা.) এর কল্যাণের প্রতিফলন ঘটলে অনুসরণীয় নবীর মত তারও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন হওয়া অবধারিত বিষয়। কেননা তাকে যে প্রস্তবণের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে সংশয় ও সন্দেহের কলুষতা থেকে মুক্ত। আর রসূলের উত্তরাধিকারী হওয়ার পদটিও এ দাবিই করে যে, তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিশ্চিত ও অকাট্য হবে। কেননা তার কাছে কেবল কতগুলো ধারণাই যদি থেকে যায়, তাহলে সে নিজ দুর্বল বিষয়াদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির হিতসাধন কী করে করতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে সে পূর্ণ নয়, বরং অর্ধেক উত্তরাধিকারী হল, অর্থাৎ দুই চক্ষুর অধিকারী নয় বরং এক চোখ বিশিষ্ট হল। আর যে সমস্ত ভৃষ্টতা নিরসনের জন্য খোদা তাকে দণ্ডযামান করেছেন, সেসব ভৃষ্টতার ভয়াবহতা, যুগের চরমভাবে রোগাক্রান্ত হওয়া, অস্থীকারকারীদের চরম ঘড়্যন্ত্রে লিপ্ত থাকা, উদাসীনদের কুস্তর্কর্ণের নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকা, বিরোধীদের ঘৃণ্যভাবে অস্থীকার করা এসবই জোর দাবি জানায় যে, এমন ব্যক্তির ঐশ্বী জ্ঞান রসূলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত। আর এমন মানুষের নামই হাদীসে ‘আমসাল’ বা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কুরআনে ‘সিদ্দীক’ বা সত্যবাদী বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাদের যুগ পয়গম্বরদের আবির্ভাব-কালের সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে, অর্থাৎ যেভাবে পয়গম্বরগণ পৃথিবীতে ভয়াবহ ভৃষ্টতা ও উদাসীন্যের বিস্তারকালে আসেন, অনুরূপভাবে এরাও তখন আসেন, যখন সর্বত্র ভয়াবহ প্রাধান্য থাকে, সত্যের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করা হয়, মিথ্যার প্রশংসা করা হয়, মিথ্যাবাদীদেরকে সত্যবাদী আখ্যা দেয়া হয়, দাজ্জালদেরকে মাহ্নী মনে করা হয়, বস্ত্রজগত আল্লাহর সৃষ্টির কাছে অত্যন্ত প্রিয় মনে হয়, যা হস্তগত করার জন্য তারা পরম্পর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে আর তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম তুচ্ছ ও সামান্য বিষয় পরিগণিত হয়। এমতাবস্থায় সে সমস্ত লোকই ইসলামের সত্যতার প্রমাণ হয়ে থাকে যাদের প্রতি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত এলহাম অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর যারা পূর্বে অতিবাহিত শ্রেষ্ঠ লোকদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন। সার কথা হল, নিশ্চিত ও সুদৃঢ় এলহাম এক বাস্তব সত্য বিষয়। উম্মতে

মুহাম্মদীয়ায় এমন শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অস্তিত্ব প্রমাণিত সত্য আর এটি কেবল তাদেরই বিশেষত্ব। অবশ্য এটি সত্য কথা যে, রসূলদের এলহাম অতি উন্নত মানের, সমুজ্জ্বল, সবচেয়ে দীপ্তিমান, সবচেয়ে দৃঢ়, সবচেয়ে স্বচ্ছ ও সুমহান বিশ্বাসের সবচেয়ে উন্নত মার্গে উপনীত আর সুর্মের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে থাকে যা সকল অমানিশা দূরীভূত করে। তবে ওলীদের এলহামগুলোর কোন একটি বাক্যের অর্থ যতক্ষণ অস্পষ্ট ও অজানা থেকে যায় ততক্ষণ তা আনুমানিক বিষয়ই রয়ে যায়। ওলীর এলহাম কেবল তখনই নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার গান্ধিভূক্ত হবে, যখন তা দুর্বল এলহামের শ্রেণিভূক্ত হবে না বরং বৃষ্টির ন্যায় অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়ে স্বীয় পূর্ণ জ্যোতি দৃঢ়ভাবে বিচ্ছুরিত করে এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাদয়কে পূর্ণ বিশ্বাসে ভরে দেবে। বিভিন্ন বাক্যে ও শব্দে অবতীর্ণ হয়ে অর্থ ও ভাব পুরোপুরি খোলাসা করবে আর বাক্যকে অস্পষ্টতা বা দ্঵্যর্থতার গান্ধি থেকে বাইরে নিয়ে আসবে। লাগাতার দোয়া ও যাচনার সময় স্বয়ং খোদা তাঁলা দোয়া করুল করে ও অবিরাম ধারায় উন্নত প্রদানের মাধ্যমে সে সমস্ত অর্থ যে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় তা পুরো স্পষ্টতার সাথে বর্ণনা করেন। কোন এলহাম যদি এ পর্যায়ে পৌছে যায়, তাহলে তা দীপ্তিতে পরিপূর্ণ আর সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ়। যারা বলে যে, মূলের দিক থেকে ওলীদের এলহামের নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই, তারা পূর্ণ মারণেফত বা তত্ত্বজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ও রিঙ্গেহস্ত। **وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقُّ قَدْرِهِ۔ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَمْةً مُّحَمَّدٍ** ওলীদের এলহাম যদি মুহাম্মদীসত্য শরিয়তের পরিপন্থী হয়, তাহলে কী হবে- মর্মে সন্দেহটি এমন একটি উক্তি যেমনটি কিনা কোন ব্যক্তি বলে যে, এক নবীর এলহাম যদি অন্য নবীর এলহামের পরিপন্থী হয় তাহলে কী হবে? এমন সন্দেহ বা কুমন্ত্রণার উন্নত হল আমরা পূর্ণ জ্যোতির্ময় এলহামের যেই সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তা সত্য মুহাম্মদী শরিয়তের পরিপন্থী হতে পারে না। যদি স্বল্পবুদ্ধির কোন মানুষ পরিপন্থী বলে মনে করে, তাহলে তা তার নিজের বুঝার ভুল।

### দ্বিতীয় ধরণ:

অগণিত বিস্ময়াবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে যে এলহামের নাম আমি উৎকর্ষ এলহাম রেখে থাকি তা হলো কোন বিষয়ে খোদা তাঁলা স্বয়ং বা বান্দার দোয়ার পর তাকে অদৃশ্য বিষয়ের কোন সংবাদ দিতে চাইলে আকস্মিকভাবে তার ওপর

এক প্রকার অচেতনতা ও তন্দ্রা-ভাব সৃষ্টি করেন, যে কারণে স্বীয় সন্তা থেকে সে পৃথক হয়ে যায় আর আত্মবিশ্মতি, তন্দ্রা এবং অচেতনতায় এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে যায় যেভাবে কেউ পানিতে ডুব দেয় আর পানিতে তলিয়ে যায়। এক কথায় বান্দা যখন ডুব দেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এই তন্দ্রা থেকে বেরিয়ে আসে, তখন নিজের মাঝে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করে যা একটি প্রতিধ্বনির মত। সেই প্রতিধ্বনি কিছুটা যখন কেটে যায়, তখন হঠাতে করে তার নিজের ভেতর থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ উৎকৃষ্ট ও সুস্থির সংবেদী এবং প্রশান্তিকর বাণীর অনুভূতি হয়। তন্দ্রার মাঝে ডুব দেয়ার এ অবস্থাটি একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয়, যার বিশ্ময়কর দিকগুলো ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই অবস্থার মাধ্যমেই মানুষের সামনে তত্ত্বজ্ঞানের এ সমুদ্র উন্মোচিত হয়। কেননা বারংবার দোয়ার সময় খোদা তাঁ'লা এই তলিয়ে যাওয়া ও তন্দ্রাভাব বান্দার ওপর সৃষ্টি করে একটি সূক্ষ্ম ও সুমিষ্ট উক্তির মাধ্যমে তার সকল দোয়ার উত্তর প্রদান করেন। সকল জিজ্ঞাসার প্রত্যন্তে তার সামনে সেই সকল তত্ত্বকথা প্রকাশ পায়, যা প্রকাশ করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। তখন এ বিষয়টি তার জন্য বর্ধিত তত্ত্বজ্ঞান ও পূর্ণ অস্তর্দৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। বান্দার দোয়া করা আর উপাস্য হিসেবে খোদার স্বীয় বিকাশের মাধ্যমে সকল জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান, এ পৃথিবীতে দাসের স্বীয় মনিবের দর্শন লাভ করার মত একটি বিষয়। উভয় জগত তার জন্য এতটাই এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, যে দুঁয়োর মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। বান্দা স্বীয় কোন প্রয়োজনে আপন কৃপাশীল প্রভুর কাছে বারংবার কোন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান চায়, আর নিজের অবস্থা তাঁ'র কাছে তুলে ধরার পর যখন সম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে সেভাবে উত্তর পায়, যেভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কথার উত্তর দিয়ে থাকে, আর সেই উত্তরও আসে একান্ত বাণিজ্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষ্যে, বরং কখনও কখনও এমন ভাষায় হয় যা সম্পর্কে সেই বান্দা সম্পূর্ণভাবে অনবহিত হয়ে থাকে। কখনও তা অদৃশ্য বিষয়াদি সম্বলিত হয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টের শক্তির বাইরে থাকে। আবার কখনও কখনও এর মাধ্যমে মহাদানের শুভসংবাদ লাভ হয় এবং সুমহান পদমর্যাদা প্রাপ্তির শুভসংবাদ শোনানো হয়, আল্লাহর নৈকট্যের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়। কোন কোন সময় জাগতিক কল্যাণ সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে থাকে। সৃষ্টের শক্তির উর্ধ্বে আর মহান সে সমস্ত সূক্ষ্ম ও পরম উৎকৃষ্ট বাক্যাবলী শুনলে যে স্বাদ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তা

কেবল সে বান্দাই জানে, যাকে এই নেয়ামত দান করা হয়। সত্যিকার অর্থে সে খোদাকে সেভাবে সন্তুষ্ট করে, যেভাবে তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজের আন্তরিক ও পুরোনো বন্ধুকে চিনে। প্রায় সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ সকল এলহাম হয়ে থাকে। কোন কোন সময় এমন এলহামে এমন শব্দও থেকে থাকে, যার অর্থ অভিধান দেখে করতে হয়, বরং অনেক সময় এলহাম অপরিচিত ভাষায়ও হয়ে থাকে; যেমন ইংরেজী বা অন্য এমন কোন ভাষায়, যে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনবৃহিত। আমাদের কাছে এমন এলহামের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই টীকা লেখার সময় অর্থাৎ ১৮৮২ সনে যা হয়েছে এবং যাতে ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এই অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞাপনমূলক এই গ্রন্থের মাধ্যমে এবং এতে অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর বিরোধীরা অবশেষে শোচনীয় পরাজয় দেখবে আর সত্যান্বেষীরা হিদায়াত লাভ করবে, আন্ত বিশ্বাস দূরীভূত হবে এবং মানুষ ঐশ্বী প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে এবং এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার কল্যাণে সাহায্য করবে ও মনোযোগী হবে এবং (আমাদের কাছে) আসবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়াবলীও রয়েছে। সেসব এলহামী বাক্য নিম্নরূপ:

يَا أَخْمَدُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِكَ، مَا رَأَيْتَ إِذْ رَأَيْتَ وَلَكَنَ اللَّهُ رَمِيْتَ، الرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْآنَ، لِتُشَدِّرَ قَوْمًا مَّا أَنْذَرَ آبَاؤُهُمْ، وَلِتَسْتَبِّئَنَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ。 قُلْ إِنِّي أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ أَوْلَ تَائِبٍ إِلَى اللَّهِ بِإِمْرِ اللَّهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَوْ أَوْلَ من يُؤْمِنُ بِهِذَا الْأَمْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهْوَقًا。 كُلُّ بَرَكَةٍ مِّنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَبَارَكَ مِنْ عَلَمَ وَقَعَلَمْ، قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي。 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَىٰ وَبِنِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ。 ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ。 أَيْ لِيَظَاهِرَ دِينَ الإِسْلَامَ بِالْحَجَّاجِ الْقَاطِعَةِ وَالْبِرَاهِينِ السَّاطِعَةِ عَلَى كُلِّ دِينٍ مَا سَواهِ؛ أَيْ يَنْصُرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُظْلَوْنَ بِإِشْرَاقِ دِينِهِمْ وَإِتَامِ حِجَّتِهِمْ。 إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، يَقُولُونَ أَنِّي لَكَ هَذَا، أَنِّي لَكَ هَذَا؟ إِنْ هَذَا إِلَّا قُولُ الْبَشَرِ، وَأَغْنَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ。 أَفَتَثُونَ السَّخْرَ وَأَتَتُمْ تِبْصِرُونَ، هَيَّهَا هَيَّهَا لَمَا ثُوَدُونَ。 مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينُ، وَلَا يُكَادُ يُبَيِّنُ، جَاهِلٌ أَوْ مَجْهُونٌ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ。 هَذَا مَنْ رَحْمَةً رَبِّكَ، يَتَمَّ نَعْمَلُهُ عَلَيْكَ لِيُكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ。 أَنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكَ، فَبَشِّرْ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْمُونَ。 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُجْبِيَنَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِبُكُمُ اللَّهُ。 إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، هَلْ أَنْتُمْ كُمْ عَلَى مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ، تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَাকِ أَثِيمٍ。 قُلْ إِنِّي شَهَادَةً مِّنَ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ؟ قُلْ إِنِّي شَهَادَةً

مَنْ اللَّهُ فَهُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ إِنَّ مَعِي رَبِّي كَيْفَ تُخْبِي الْمُوَتَىٰ . رَبْ اغْفِرْ وَازْحِمْ مِنَ السَّمَاءِ . رَبْ لَا تَذَرْنِي فَرِداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارثِينَ . رَبْ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ . رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ . وَقُلْ اعْلَمُوا عَلَىٰ مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَالِمٌ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ . وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا . وَرَبِّحَوْفَنَّكَ مِنْ دُونِهِ . إِنِّي بِأَعْيُنِنَا . سَمِيَّتَكَ الْمُتَوَكِّلَ . يَخْمُدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرِشِهِ . تَخْمُدُكَ وَنُصْلِي . يُرِيَّنُونَ أَنْ يُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمِّمٌ نُورَهُ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ . سَنَقْلِي فِي قَلْوَبِهِمُ الرُّغْبَ . إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَأَنْتَهِي أَمْرُ الزَّمَانِ إِنَّنَا . أَلَيْسَ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايِي مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا . وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا احْتِلَاقٌ . قُلْ اللَّهُ ثُمَّ دَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ . قُلْ إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَيْ إِجْرَاءِي وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَا . وَلَئِنْ تَرَضَ عَنَكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَخَرَقُوا لَهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَاتِ بِعِيرٍ عَلِمْ . قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوا أَحَدٌ . وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ . الْفَتْشَةُ هَاهُنَا فَاضِيَّرْ كَمَا ضَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ . وَقُلْ رَبِّ أَذْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقٍ . وَإِمَّا تُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَّكَ . وَمَا كَانَ اللَّهُ يَعِذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، أَيْ مَا كَانَ اللَّهُ يَعِذِّبُهُمْ بَعْذَابَ كَامِلٍ وَأَنْتَ سَاكِنٌ فِيهِمْ -

إِنِّي مَعَكَ وَكُنْ مَعِي أَيْنَمَا كُنْتَ ، كُنْ مَعَ اللَّهِ حَيْثُ مَا كُنْتَ . أَيْنَمَا تُولُوا فَشَمْ وَجْهُ اللَّهِ . كُنْمُ شَمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ وَأَفْتَحْتَارَا لِلْمُؤْمِنِينَ . وَلَا تَبْيَسْنِ مِنْ زُوحِ اللَّهِ إِنَّ رُوحَ اللَّهِ قَرِيبٌ . أَلَا إِنْ تَصْرُكَ اللَّهُ قَرِيبٌ . يَأْتِيَكَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٌ . يَأْتِيَكَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٌ . يَأْتِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَنْدِهِ ، يَأْتِيَكَ رَجَالٌ نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ . لَا مُبَدِّلَ لِكَلْمَاتِ اللَّهِ . إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا . فَتْحُ الْوَلِيٍّ فَتْحٌ وَفَرَبَّنَاهُ نَجِيًّا . أَشْجَعُ النَّاسِ . وَلَوْ كَانَ الإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَى لِتَالِهِ . أَتَأْرَ اللَّهَ بُرْهَانَهُ . يَا أَخْمَدْ فَاصْبِرْ الرَّوْحَمَةَ عَلَى شَفَقَتِكَ . إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا يَرِفْعُ اللَّهُ دُكْرَكَ . وَيَتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَوَجَدْكَ ضَالًاً فَهَدَى . وَنَظَرْنَا إِلَيْكَ وَقَلَّنَا يَا تَأَرْ كُونِنِي بَرِداً وَسَلَّمَنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ . خَرَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ . يَا أَئِمَّا الْمُدَثِّرُ وَرَبِّكَ فَكَبَرَ . يَا أَحْمَدْ بِيَمِّ اسْمُكَ وَلَا يَتَمَّ اسْمُوِي أَيْ أَنْتَ فَإِنْ فَيْنَقْطَعْ تَحْمِيدُكَ وَلَا يَنْتَهِي مَحَمَّدَ اللَّهُ فِإِنَّهَا لَا تَعْدُ وَلَا تَحْصَى -

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَائِنَكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٌ ، وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ الصَّدِيقِينَ ، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . الصَّلَاةُ هُوَ الْمَرِيبُ . إِنِّي رَأَيْتُكَ إِلَيْ وَأَقْنَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنِّي . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَكْتُبْ وَلَيْطَبْ وَلَيَرْسَلَ فِي الْأَرْضِ . خُذُوا التَّوْحِيدَ التَّوْحِيدَ يَا أَبْنَاءَ الْفَارِسِ . وَبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَدِقُ عِنْدَ رَبِّهِمْ .

وَأَتُلُّ عَلَيْهِمْ مَا أُوحىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تُصَعِّرْ لِحَقِّنِ اللَّهِ وَلَا تَشَأْمُ مِنَ النَّاسِ。 أَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَمَا أَذْرَكَ مَا أَصْحَابُ الصُّفَّةِ، تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَقْيَضُ مِنَ الدَّمْعِ。 يُصْلُونَ عَلَيْكَ。 رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي إِلَيْلَيْمَانَ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُّبِينًا، أَمْلَوْا۔

অর্থাৎ- হে আহমদ! খোদা তোমায় কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। তুমি যা কিছু নিষ্কেপ করেছ, সত্যিকার অর্থে তা তুমি নিষ্কেপ কর নি বরং আল্লাহ নিষ্কেপ করেছেন। খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন অর্থাৎ এর সঠিক অর্থ তোমার কাছে প্রকাশ করেছেন যেন তুমি সে জাতিকে সর্তক করতে পারো, যাদের পিতা-পিতামহকে সর্তক করা হয় নি। আর অপরাধীদের পথ যেন চিহ্নিত হয়ে যায় অর্থাৎ এটি যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কে তোমার প্রতি বিমুখ মনোভাব প্রদর্শন করে। তুমি বল! আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আর আমিহই এর প্রতি প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী। অর্থাৎ এ যুগে খোদার নির্দেশে খোদার দিকে সর্বপ্রথম প্রত্যাবর্তনকারী বা এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের মাঝে সর্বপ্রথম (সঠিক অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন)। তুমি বল, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে। কেননা পলায়নপ্রতাই মিথ্যার নিরাতি। সকল কল্যাণের উৎস হলেন মুহাম্মদ (সা.)। সুতরাং বড়ই কল্যাণময় তিনি, যিনি শিখিয়েছেন আর যিনি শিখেছেন। তুমি বল, এ বাক্যগুলো যদি আমি প্রতারণামূলকভাবে রচনা করতাম আর খোদার উক্তি না হতো তাহলে আমি কঠোর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। খোদা হলেন সেই সত্তা, যিনি আপন রসূল ও প্রেরিত পুরুষকে সীয়া হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন- একে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য। খোদার কথা অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করে, কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না। তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন অর্থাৎ অপরাপর ধর্মের ওপর সুস্পষ্ট যুক্তি ও সমুজ্জ্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে ইসলামকে জয়যুক্ত করার (ক্ষমতা রাখেন) অর্থাৎ আল্লাহ নির্যাতিত মুমিনদেরকে তাদের ধর্মকে সমুজ্জ্বল করে ও সত্ত্বের অকাট্য প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করবেন। ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মোকাবিলায় আমরা তোমার জন্য যথেষ্ট। মানুষ বলবে, এই মর্যাদা তোমার কী-করে লাভ হলো? এলহাম নামে যা প্রচার করা হয়, তা তো মানুষেরই বানানো কথা এবং অন্য মানুষের সাহায্য সহায়তা নিয়ে তা রচনা করা হয়েছে। হে মানুষ! তোমরা কি জেনেশনে প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে? এ ব্যক্তি

তোমাদের যেসব প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে (ভয় দেখাচ্ছে), তা কী করে পূর্ণ হতে পারে? বিশেষ করে এমন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া, যে হীন ও ইতর! সে তো অজ্ঞ বা উন্নাদ! সে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে প্রমাণাদি উপস্থাপন কর। এটি তোমার প্রভুর করণ, তিনি তোমার জন্য স্বীয় নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দেবেন যেন তা মুমিনদের জন্য একটি নির্দশন প্রমাণিত হয়।

তুমি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তোমার জন্য শুভসংবাদ। এটি তোমার প্রভুর অনুগ্রহ যে, তুমি উন্নাদ নও। বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালোবাস তাহলে আস আমার অনুসরণ কর, যেন খোদা তোমাদেরকে ভালোবাসতে পারেন। হাসি-বিদ্রূপকারীদের মোকাবিলায় আমরা তোমার জন্য যথেষ্ট। শয়তান কার ওপর অবতীর্ণ হয়, সে বিষয়ে আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব? সে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর ওপর অবতীর্ণ হয়। তুমি তাদেরকে বলে দাও! আমার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাক্ষ্য আছে। সুতরাং তোমরা গ্রহণ করবে কি? পুনরায় তাদেরকে বল, আমার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাক্ষ্য আছে সুতরাং তোমরা ঈমান আনবে কি? আমার সাথে আমার প্রভু আছেন, তিনি আমাকে পথের দিশা দেবেন। হে আমার প্রভু! মৃতদেরকে তুমি কীভাবে জীবিত কর, তা আমাকে দেখাও। হে আমার প্রভু! ক্ষমা কর ও আকাশ থেকে দয়া বর্ণ কর। হে আমার প্রভু! আমাকে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করো না, কেননা তুমি ওয়ারিসদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আমার প্রভু! তুমি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধন কর। হে আমার প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মাঝে সত্যিকারভাবে মীমাংসা করে দাও। কেননা তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। তুমি তাদেরকে বল, তোমরা নিজ স্থানে, নিজ নিজ পদ্ধতিতে কাজ করে যাও আর আমিও নিজস্ব রীতিতে কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। কোন বিষয় সম্পর্কে বলো না যে, আমি কালই এটি করতে যাচ্ছি। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাকে অন্যদের ভয় দেখায়। তুমি আমাদের স্নেহ দৃষ্টিতে রয়েছ। আমি তোমার নাম ‘মুতাওয়াক্লিন’ রেখেছি। আরশ থেকে আল্লাহ্ তোমার প্রশংসা করেন। আমরা তোমার প্রশংসা করি আর তোমার প্রতি রহমত বর্ণ করি। তারা খোদার জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায়, জেনে রাখ অবশেষে খোদার জামা’তই জয়যুক্ত হবে। তুমি ভয় করো না, তুমই জয়যুক্ত হবে। আমরা তাদের হস্তয়ে ত্রাস সঞ্চার

করব। খোদার সাহায্য যখন আসবে আর যুগ আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন বলা হবে, এ ব্যক্তি যে প্রেরিত হয়েছে সে কি সত্যের ওপর ছিল না? এটিই আমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা আর আমার প্রভু তা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তারা বলে, এটি মিথ্যা বৈ কিছুই নয়। তুমি বল! খোদা এই বাণী অবর্তীণ করেছেন, এরপর তাদেরকে বৃথা ও বাজে চিন্তাধারার মাঝে ছেড়ে দাও। তুমি বল, যদি আমি প্রতারণামূলকভাবে এমনটি করে থাকি, তাহলে এর পাপ আমার কাঁধে বর্তাবে। সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নাম ভঙ্গিয়ে প্রতারণা করে আর মিথ্যা বলে? ইহুদী ও খ্রিস্টান কথনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। তারা তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা সন্তান প্রস্তাব করে। তুমি বল, তিনি এক অদ্বিতীয় আল্লাহ, আল্লাহ স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভরস্থল তিনি কাউকে জন্ম দেন নি আর তিনি জন্মগ্রহণও করেন নি আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তারা নিজস্ব ঘড়যন্ত্র আঁটিবে আর খোদা নিজের পরিকল্পনা করবেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। সেখানে অচিরেই নৈরাজ্য দেখা দেবে। সুতরাং তুমি দৃঢ় প্রত্যয়ী নবীদের ন্যায় দৃঢ় প্রত্যয়ী হও। খোদার কাছে তোমার সত্যতা প্রকাশের জন্য আকৃতি ও মিনতি কর। তোমার মৃত্যুর পূর্বে তাদের সামনে তোমাকে প্রদত্ত ঐশী প্রতিশ্রূতির পূর্ণতা প্রকাশ করার বা তোমাকে মৃত্যু দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা আমরা রাখি। যাদের মাঝে তুমি আছ, এমন নয় যে খোদা তাদের শাস্তি দেবেন অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি তাদের মাঝে আছ, খোদা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন না। আমি তোমার সাথে আছি। সুতরাং তুমি যেখানে থাক না কেন আমার সাথে আছ। যেখানেই থাকলা কেন খোদার সাথে থাক। যেদিকেই তুমি মুখ ফেরাও না কেন সেই দিকেই খোদাকে দেখতে পাবে। তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিশ্বাসীদের গর্বস্বরূপ। খোদার করুণা সম্পর্কে নিরাশ হবে না। শোন! খোদার করুণা সন্নিকটে। শোন! খোদার সাহায্য অতি নিকটে। সকল সুদূরের পথ বেয়ে তোমার কাছে সাহায্য আসবে। তোমার কাছে এত মানুষ আসবে যে, তাদের পদভারে রাস্তায় গর্ত হয়ে যাবে। তোমার কাছে এত মানুষ আসবে যে, যে পথে তারা চলাচল করবে তা খানা-খন্দে পরিণত হবে। আল্লাহ নিজের সন্নিধান হতে তোমাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ তোমাকে সাহায্য করবে যাদেরকে আমরা নিজেরাই অনুপ্রাণিত করব। খোদার কথা কেউ পরিবর্তন করতে পারে

না। আমরা তোমাকে একটি স্পষ্ট বিজয় দান করব। আল্লাহর বন্ধুর বিজয়ই প্রকৃত বিজয় আর আমরা তাকে এমন নৈকট্য দান করেছি যে, সে আমাদের অস্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। সে সবচেয়ে সাহসী মানুষ। ঈমান সুরাইয়াতে চলে গেলেও সেখানে গিয়ে সে তা পৃথিবীতে নিয়ে আসত। খোদা তার যুক্তিপ্রমাণকে আলোকিত করবেন। হে আহমদ! তোমার ঠেঁট থেকে রহমত-ধারা প্রবাহিত হবে। তুমি আমাদের স্নেহদৃষ্টিতে রয়েছ। আল্লাহ তোমার নামকে সমৃষ্ট করবেন আর এ পৃথিবী ও পরকালে তোমার জন্য তাঁর নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করবেন। তিনি তোমাকে তাঁর হিদায়াতের সন্ধানী পেয়েছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। আমরা তোমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিয়েছি আর যা কিনা মানুষের দুঃখতির অগ্নি তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, এই ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তোমাকে খোদার রহমতের ভাঙ্গার প্রদান করা হবে। হে চাদর আবৃত ব্যক্তি! দণ্ডয়মান হও এবং সতর্ক কর (আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে) আর তোমার প্রভুর মহাত্ম্য ঘোষণা কর। হে আহমদ! তোমার নামের সমাপ্তি ঘটবে কিন্তু আমার নাম ঘটবে না অর্থাৎ তুমি মরণশীল আর তোমার প্রশংসা সীমিত কিন্তু খোদার প্রশংসা সীমাহীন। কেননা তা গণনা করা যায় না আর তার কোন শেষও নেই। পৃথিবীতে এক আগন্তুক বা পথিকের ন্যায় জীবন কাটাও এবং মুভাকী ও বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হও। পুণ্যের প্রতি আহ্বান কর এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ আর মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি দরদ প্রেরণ কর আর দরদ পড়াই হলো সত্যিকার প্রশিক্ষণ। আমি তোমাকে আমার প্রতি উত্থিত করব আর তোমাকে আমার নৈকট্য দান করব এবং তোমাকে আমার ভালোবাসায় সিঞ্চ করব। তিনিই আল্লাহ, যিনি সত্যিকার অর্থে ইবাদতের যোগ্য। তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। এরপর এটি লিপিবদ্ধ কর আর এটিকে ছেপে সারা বিশ্বে প্রচারিত হতে দাও। হে পারস্য বংশীয় ব্যক্তি! তৌহীদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, তৌহীদকে আঁকড়ে ধর। তাদেরকে শুভসংবাদ দাও যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রভুর সন্ধানে তাদের সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে সব ওহী করা হয় তা তাদের পক্ষে শুনাও। স্মরণ রেখো! এমন সময় আসছে যখন মানুষ দলে দলে তোমার কাছে আসবে। সুতরাং তোমার জন্য আবশ্যিক হলো মানুষের প্রতি অহংকার প্রদর্শন না করা আর দলে দলে আগত লোকদেরকে স্বাগত জানিয়ে ঝান্তি প্রকাশ না

করা। কিছু এমন মানুষও আছে, যারা নিজেদের বসতবাড়ি থেকে হিজরত করে তোমার গৃহে বসতি গড়বে। তারা হলো আসহাবুস্সুফ্ফা। তুমি কি ভাবতে পার যে, আসহাবুস্সুফ্ফার মর্যাদা কত মহান? তারা ঈমানের ক্ষেত্রে খুবই দৃঢ়। তারা আকৃতি করবে, হে আমাদের প্রভু! এক আহ্বানকারীকে আমরা ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি আর খোদার দিকে এক আহ্বানকারী এবং এক প্রদীপ্ত সূর্য। এসব ভবিষ্যত্বাণী লিখে রাখ, তা যথা সময়ে পূর্ণ হবে।

এখানে এই কুমন্ত্রণা বা সন্দেহ হৃদয়ে স্থান দেয়া উচিত নয় যে, সামান্য একজন উম্মতি কী করে মহানবী (সা.)-এর নাম বা গুণাবলী অথবা প্রশংসারাজিতে তাঁর অংশীদার হতে পারে? নিঃসন্দেহে এটি সত্য কথা যে, প্রকৃত অর্থে কোন নবীই মহানবী (সা.)-এর সমর্পণ্যায়ের পবিত্র আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার হতে পারে না, বরং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে কারো কোন সামঞ্জস্য থাকা তো দূরের কথা, সব ফিরিশতারও সম্মিলিতভাবে এক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষতার দাবি করার সুযোগ নেই। কিন্তু হে সত্যাষ্টী! খোদা তোমায় হিদায়াত দান করুন, তুমি মনোযোগ সহকারে একথা শ্রবণ কর যে, এই প্রিয় রসূলের কল্যাণরাজি প্রকাশ করা চিরকাল অব্যাহত রাখার জন্য আর তাঁর জ্যোতি ও গ্রহণীয়তার উৎকৃষ্ট কিরণমালা যাতে বিরোধীদেরকে অভিযুক্ত ও নির্বাক করতে থাকে, এর জন্য তিনি স্বীয় পরম প্রজ্ঞা ও করুণায় এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার যারা পরম বিনয় ও ন্মতার সাথে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করে আর বিনয়ের আস্তানায় পড়ে সম্পূর্ণভাবে অবাধ্য প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে, তাদেরকে খোদা এক স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পেয়ে তাদের লৌকিকতামুক্ত সন্তার মাধ্যমে নিজ প্রিয় রসূলের কল্যাণরাজি প্রকাশ করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের যে প্রশংসা করা হয় বা তাদের মাধ্যমে যেসব লক্ষণাবলী ও কল্যাণরাজি এবং নির্দশনাবলী প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে এসব প্রশংসার পূর্ণ দাবিদার এবং এ সমস্ত কল্যাণের পূর্ণ উৎসস্থল হলেন মহানবী (সা.)। প্রকৃত ও সম্পূর্ণরূপে সে সমস্ত প্রশংসা তাঁকেই শোভা পায়। তিনি এসবের পূর্ণ সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সুন্নত ও রীতিনীতির অনুসারী যেহেতু নিজ পূর্ণ অনুসরণের দিক থেকে সেই দানশীল নবীর আলোকিত সন্তার জন্য ছায়াস্বরূপ হয়ে থাকে, তাই সেই পবিত্র ব্যক্তির মাঝে যে ঐশ্বী জ্যোতি সৃষ্টি ও প্রকাশিত

থাকে, তা ঠাঁর সেই প্রতিচ্ছবির মাঝেও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। ছায়ায় মূলের সেসব রীতিনীত ও ধ্যানধরণ প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি কারো অজানা নয়। তবে এটি সত্য কথা যে, ছায়া প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী নয় আর বাস্তবে তাতে কোন স্বকীয়তা বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং যা কিছু এতে বিদ্যমান, তা সেই মূল ব্যক্তিরই একটি ছবি মাত্র, যা তার মাঝে প্রকাশিত ও প্রতিভাত হয়েছে। তাই আবশ্যিকীয় বিষয় হল, আপনি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যেন এ কথাকে এই মর্মে অসম্মান বা ক্ষতির কারণ মনে না করেন যে, মহানবী (সা.)-এর অভ্যন্তরীণ আলো উম্মতের শ্রেষ্ঠ অনুসারীরা কীভাবে লাভ করতে পারে? এখানে বুঝতে হবে যে, আলোর এই প্রতিফলন, যা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার স্বচ্ছ ব্যক্তিবর্গের উপর স্থায়ী কল্যাণ-প্রবাহ হিসেবে বিদ্যমান, এর ফলে দুটো ঘনান বিষয় সৃষ্টি হয়। একটি হলো এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। কেননা যে প্রদীপের মাধ্যমে অন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হতে পারে আর সদা সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে, এমন প্রদীপ তা হতে উত্তম, যার মাধ্যমে অন্য প্রদীপ আলোকিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যান্য উম্মতের উপর এর বিশেষত্ব সেই স্থায়ী কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আর ইসলাম ধর্মের সত্যতাও সব সময় এর মাধ্যমে নিত্যন্তুন মহিমায় পরিস্ফুটিত হয়, শুধু অতীতের বরাত টানা হয় না। এটি এমন একটি বিষয়, যার মাধ্যমে কুরআন শরীফের সত্যতার জ্যোতি সূর্যের মত প্রকাশ পেয়ে যায় আর ইসলাম বিরোধীদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ স্পষ্ট হয় এবং ইসলামের শক্রদের লাঞ্ছন্গ গঞ্জনা ও চেহারা কালিমা লিঙ্গ হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি খুলে যায়। কেননা তারা ইসলামে সেসব আশিষ ও জ্যোতি দেখতে পায় যার দৃষ্টান্ত তারা স্বীয় জাতির পাদি ও পঙ্গিতদের মাঝে প্রমাণ করতে পারে না।

فَتَدْبِرْ أَيْهَا الصَّادِقُ فِي الْطَّلْبِ، أَبْدِكُ اللَّهَ فِي طَلْبِكَ

এ ক্ষেত্রে স্বল্পবুদ্ধির কোন কোন মানুষের হৃদয়ে এ সন্দেহ দানা বাধতে পারে যে, উল্লিখিত এলহামী বাক্যে কেন এক মুসলমানের প্রশংসা করা হয়েছে? স্মরণ রাখা উচিত যে, দুটো বড় উপকারী দিক এ প্রশংসার সাথে সম্পৃক্ত বলে ধারণা করা যায় যা মৃত্যুমান প্রজ্ঞা খোদা তাঁলা সৃষ্টির কল্যাণার্থে বর্ণনা করেছেন। প্রধানত অনুসরণীয় নবীর আনুগত্যের কল্যাণরাজি সম্পর্কে অবগত হওয়া, যেন সৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা কত মহান আর সত্যের সেই সূর্যের প্রভাব কত দেদীপ্যমান, যার অনুসরণ মানুষকে

পূর্ণ মু'মিনের পদমর্যাদায় উপনীত করে। মানুষকে তত্ত্বজ্ঞানীর মর্যাদায় পৌঁছায়। কাউকে আয়াতুল্লাহ্ এবং ভজ্জাতুল্লাহ্ (আল্লাহর নির্দশন ও প্রমাণ) মর্যাদা দান করে আর এভাবে তাদেরকে ঐশী প্রশংসায় ধন্য করে।

বিভিন্ন প্রকার অভ্যন্তরীণ বিদ্যাত ও রোগ ব্যাধির সংশোধন হলো এর লক্ষ্য, আর এটিই ওহীর মাধ্যমে নতুন কল্যাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রশংসার দ্বিতীয় উপকারিতা। কেননা অতীতের ওলী ও পুণ্যবানদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ অজ্ঞ শত শত প্রকার অপবাদ আরোপ করে রেখেছে যেন তাঁরা নিজেরাই বলেছেন যে, আমাদেরকে খোদার সমকক্ষ দাঁড় করাও, আমাদের কাছে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির দোয়া কর, আমাদেরকে খোদার মত সর্বশক্তিমান ও বিশ্বজগতের নিয়ন্তা জ্ঞান কর! এহেন পরিস্থিতিতে যেসব প্রশংসা তাদের পীরদের সম্পর্কে তাদের মাথায় বসে আছে, কোন নতুন সংস্কারক যতক্ষণ এমন প্রশংসায় প্রশংসিত না হবে ততক্ষণ তার ওয়াষ-নসীহত খুব কমই কার্যকরী হবে। কেননা তারা মনে মনে অবশ্যই বলবে, এই তুচ্ছ ব্যক্তি কী করে আমাদের পীরদের সমমর্যাদার মানুষ হতে পারে? যেখানে আমাদের বড় বড় পীররা আমাদের অভীষ্ট পূরণের প্রতিক্রিয়া দিয়ে রেখেছেন সেখানে এ ব্যক্তি কে? আর তার সামর্থ্য, গুরুত্ব ও মর্যাদাই বা কী যে, তাঁদেরকে পরিত্যাগ করে এর কথা শুনবো? সুতরাং এ হলো দুটো গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে জন্য সকল সেই সম্মান ও প্রশংসার অধিকারী প্রভু, স্বীয় এক দুর্বল দাস এবং এই মাটির ঢেলার প্রশংসা করেছেন। তুচ্ছ মাটি কী-ই বা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে! এটিই সত্য কথা। সকল প্রশংসা, সকল পুণ্য সেই একমাত্র সন্তার উদ্দেশ্যেই নিরবিদিত, যিনি বিশ্বপ্রতিপালক এবং চিরঝীব জীবনদাতা ও চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা। উল্লিখিত প্রজ্ঞার অধীনে মহা সম্মানিত খোদা যখন এমন কোন বান্দার প্রশংসা করেন, যার হাতে সৃষ্টির সংশোধন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; তার জন্য আবশ্যক হবে সেই প্রশংসাকে সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ভালোভাবে প্রচার করা আর সাধারণ মানুষ কী বলবে সে সম্পর্কে আদৌ শক্তি না হওয়া। সাধারণ মানুষ নিজেদের ধাত-প্রকৃতি ও বুদ্ধি অনুসারে অবশ্যই কিছুটা হলোও অপলাপ করবে। কেননা আদি থেকেই কুধারণা ও কুচিঞ্চল করা সাধারণ মানুষের স্বভাব চলে আসছে, কোন যুগে তা কি করে পরিবর্তিত হতে পারে? কিন্তু এ সকল প্রশংসা সত্যিকার অর্থে সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। প্রথম দিকে তা সাধারণের কাছে

অপছন্দীয় বা প্রতারণা মনে হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে খোদা তাঁলা তাদের সামনে বিষয়ের স্বরূপ স্পষ্ট করে থাকেন। যখন সাধারণের সামনে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সেই বান্দা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর মদদপুষ্ট, তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে দণ্ডয়মান ব্যক্তির জন্য সে সকল প্রশংসা এক মহান বিজয়ের কারণ হয়ে যায় এবং একটি সুগভীর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে খোদার বিভাস্ত বান্দাদেরকে তাঁর তৌহীদ ও অদ্বিতীয় সত্ত্বার প্রতি আকৃষ্ট করে। কিছুদিন হাসিস্তাটা ও তিরক্ষারের লক্ষ্যে পরিণত হলেও এসব হাসিস্তাটা ও বিদ্রূপ সহ্য করা ধর্মসেবকের জন্য একান্ত সৌভাগ্য ও গর্ব ছাড়া আর কিছু নয়। *وَالَّذِينَ يَلْعَنُونَ رَسَالَاتَ رَبِّهِمْ لَا يُخَافُونَ لَوْمَةً لَّا*

### ত্রৃতীয় ধরণ:

মানুষের হৃদয়ে কোমলতার সাথে, ধীরে ধীরে কোন কথার ‘এলকা’ বা প্রেরণা সম্বন্ধের হয় অর্থাৎ আকস্মিকভাবে হৃদয়ে কোন বাক্য বা কথার উদয় হয়, যাতে সেসব বিস্ময়কর বিষয়াদী পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট মাত্রায় বিরাজ করে না যা এলহামের দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে বরং এতে কোন প্রকার নিদ্রা বা তন্দ্রাও আবশ্যিক নয়। অনেক সময় একান্ত জাগ্রত অবস্থায় তা ঘটে যায়, মনে হয় যেন অদৃশ্য স্থান থেকে কেউ হৃদয়ে সেই কথা ফুঁত্কার করেছে বা ছুঁড়ে দিয়েছে। মানুষ কিছুটা জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে এতে নিমজ্জিত ও আত্মবিস্মৃত অবস্থায় থাকে। আর কোন কোন সময় সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত থাকে এবং হঠাৎ দেখে, একটি নবাগত বাক্য তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে বা কোন সময় এমনও হয় যে, সে কথা হৃদয়ে প্রবেশ করতেই তা স্বীয় প্রথর আলো প্রকাশ করে। মানুষ বুঝতে পারে যে, এ কথাগুলো খোদার পক্ষ থেকে সম্বন্ধের করা হয়েছে। অভিজ্ঞ মানুষ জানে, যেভাবে প্রশ্নাসের সময় বাতাস ভেতরে প্রবেশ করে আর হৃদয় ইত্যাদি সকল অঙ্গপ্রতঙ্গকে সতেজতা ও প্রশান্তি দিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে এলহাম হৃদয়কে প্রশান্তি, তৃষ্ণি ও আরাম দিয়ে থাকে আর ব্যাকুল হৃদয়ে এর আনন্দঘন ও সুশীতল প্রভাব বয়ে যায়। এটি একটি সূক্ষ্ম রহস্য, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু দৃষ্টিবান ও তত্ত্বজ্ঞানী যাদেরকে মহাসম্মানিত প্রকৃত দাতা ঐশ্বী রহস্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলেছেন, তারা এটি ভালোভাবে বুঝে ও জানে। এমন এলহামও এই অধ্যমের প্রতি বারংবার হয়েছে, যা লিপিবদ্ধ করার কার্যত কোন প্রয়োজন নেই।

## চতুর্থ ধরণ:

সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোন বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় বা কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে কোন ফিরিশ্তা কোন অদৃশ্য সংবাদ প্রদান করে অথবা কাগজে বা পাথরে লিপিবদ্ধ কোন লেখা চোখের সামনে এসে ভেসে উঠে, যার মাধ্যমে কতক অদৃশ্য রহস্যাবলী প্রকাশিত হয়। এছাড়া এলাহামের আরো প্রকারভেদ রয়েছে।

যেমন, এ অধম স্বীয় কতক স্বপ্ন দ্রষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করছে, যার সংবাদ তখন ইসলামের অধিকাংশ বিরোধীকে দেয়া হয়েছে যখন সেই স্বপ্ন দেখেছিলাম আর এর সত্যতাও তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে। সেসব স্বপ্নের একটিতে এ অধম হ্যারত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, এই অধম ১৮৬৪-১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ সে যুগের কাছাকাছি কোন সময়ে, যখন দুর্বল এই বান্দা জীবনের প্রথম ভাগে জ্ঞান অর্জনে রত ছিল, হ্যারত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-কে স্বপ্নে দেখে। এ অধমের হাতে তখন একটি ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল, যা অধমের রচনা মনে হচ্ছিল। মহানবী (সা.) এই গ্রন্থ দেখে আরবী ভাষায় বললেন, তুমি এ গ্রন্থের কী নাম রেখেছ? অধম নিবেদন করলো, আমি এর নাম রেখেছি ‘কুত্বী’। এই সুপ্রচারিত ও সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক ছাপার পর সেই নামের যে অর্থ বোধগম্য হয় তা হল, এটি সেই গ্রন্থ যা মেরং নক্ষত্রের ন্যায় দোনুল্যমানতার উর্ধ্বে ও সুদৃঢ়, যার পূর্ণ দৃঢ়তা উপস্থাপন করে ১০ হাজার রূপির বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে। বস্তুত মহানবী (সা.) আমার হাত থেকে সেই গ্রন্থটি নিলেন এবং সেই পরিত্র নবীর কল্যাণময় হাতের পরশ পেতেই তা একটি অতি আকর্ষণীয় রঙের দৃষ্টিনন্দন ফলে পরিণত হয় যা পেয়ারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে এর আকৃতি ছিল তরমুজের মত। মহানবী (সা.) এই ফল বিতরণের জন্য যখন টুকরো করতে চাইলেন, তখন এটি হতে এত পরিমাণ মধু নিঃসৃত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর পরিত্র হাত কনুই পর্যন্ত মধুতে ভরে যায়। তখন দরজার বাইরে পড়ে থাকা একটি লাশ মহানবী (সা.)-এর নির্দর্শনে জীবিত হয়ে এই অধমের পেছনে দাঁড়িয়ে যায়। এই অধম মহানবী (সা.)-এর সামনে সেভাবে দণ্ডযামান ছিল, যেভাবে এক ফরিয়াদী বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। মহানবী (সা.) সুগভীর প্রতাপ ও বিচারক সূলভ মহিমায় একজন শক্তিশালী পালোয়ানের

ন্যায় চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। সারকথা হল, সেই ফলের একটি ফালি মহানবী (সা.) সে ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য আমাকে প্রদান করেন, যে নতুনভাবে জীবন লাভ করেছে আর অবশিষ্ট ফালিগুলো আমাকে প্রদান করেন। সেই একটি ফালি আমি ত্রি ব্যক্তিকে প্রদান করলাম আর সে তখনই তা খেয়ে ফেলল। সদ্য জীবনপ্রাণ সেই ব্যক্তি তা খাওয়া শেষ করলে আমি দেখলাম, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেয়ার পূর্বের জায়গা থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। সূর্যের কিরণ যেভাবে ঝলমলিয়ে উঠে, অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর আশিসমণ্ডিত ললাট থেকে আলো ঠিকরে নির্গত হতে আরম্ভ করে, যা ইসলাম ধর্মের সতেজতা ও উন্নতির প্রতি ইঙ্গিত ছিল। সেই জ্যোতি দেখতে দেখতে চোখ খুলে যায়। এ অভিজ্ঞতার সমূহ প্রশংসা আল্লাহ্ তালারই প্রাপ্য।

এটি সেই স্বপ্ন, যা সে যুগে প্রায় ২০০ ব্যক্তিকে শোনানো হয়েছে, যাদের মাঝে ৫০ বা এর কাছাকাছি হিন্দু এমন হবে যাদের অধিকাংশ এখনও সুস্থ ও সবল রয়েছে। তারা সবাই খুব ভালোভাবে জানে যে, সে যুগে বারাহীনে আহমদীয়া রচনার কোন নাম গন্ধই ছিল না। আর হৃদয়ে এমন কোন ধারণা ও ছিল না যে, কোন ধর্মীয় গ্রন্থ লিখে এর দৃঢ়তা ও সত্যতা প্রকাশের লক্ষ্যে ১০ হাজার রূপির বিজ্ঞাপন দেয়া উচিত। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, এখন সেসব বিষয় যার উল্লেখ স্বপ্নে রয়েছে, তা অনেকটা পূর্ণতা লাভ করেছে। আর তখনকার স্বপ্নে এই গ্রন্থকে যে মেরু-নক্ষত্র নাম দেয়া হয়েছে, সেই কুতুবীয়ত বা মেরু-নক্ষত্রের ওজ্জল্যকে বড় অঙ্কের পুরস্কারের প্রতিশ্রূতি সম্বলিত করে এখন বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামের সত্যতা তাদের সামনে অকাট্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর স্বপ্নের যে অংশগুলো এখনো পূর্ণ হয় নি, সবাইই তা পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা উচিত। কেননা স্বর্গীয় কথা কোন দিন টুলতে পারে না।

এখন আর একটি স্বপ্ন শুনুন। প্রায় ১২ বছর পার হয়েছে, একজন হিন্দু, যে এখন কাদিয়ানের আর্য সমাজের সদস্য আর সুস্থ ও সবল রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর নির্দর্শনাবলী ও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোরতর অঙ্গীকারকারী। পাদ্রীদের মত চরম শক্রতার বশবর্তী হয়ে সে এ ধারণা রাখত যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী মুসলমানরা নিজেরাই বানিয়েছে। মহানবী (সা.)-এর কাছে খোদা তালা কোন অদৃশ্য সংবাদ প্রকাশ করেন নি, অধিকন্তু তাঁর মাঝে নবুয়তের

এসব লক্ষণ ছিল না। কিন্তু সুবহানাল্লাহ, স্বীয় নবীর প্রতি খোদার কত বড় অনুগ্রহ! আর সেই নিষ্পাপ ও পবিত্র নবীর মহিমা কত মহান, যার সত্যতার কিরণ আজও একইভাবে দেদীপ্যমান, যেভাবে প্রারম্ভিক ঘৃণ থেকে চলে আসছে। স্বল্পকাল পর কাকতালীয়ভাবে যে ঘটনা ঘটে তা হলো, সেই হিন্দু সাহেবের এক আত্মীয় হঠাতে করে কোন অপ্রত্যাশিত অভিযোগে কারাগারে প্রেরিত হয় আর তার সাথে অপর এক হিন্দুও প্রেরিত হয়। তাদের মামলা চীফ কোর্টের আপিল বিভাগ পর্যন্ত গড়ায়। দিঘিদিক জ্ঞানশূন্যতা ও বিহ্বলতার মাঝে একদিন সেই আর্য সাহেব আমাকে বলে, অদৃশ্যের সংবাদে বিশ্বাস করবো যদি আজকে কেউ বলতে পারে যে, আমাদের মামলার রায় কী হবে! তখন আমি বললাম, অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল খোদারই বিশেষত্ব। ঐশ্বী গোপন রহস্যাবলীর জ্ঞান কোন জ্যেতিষি ও রাখে না আর কোন গণক, শাকুনিক বা কোন সৃষ্টি সে সম্পর্কে অবহিত নয়। অবশ্য একথাও সত্য যে, খোদা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা ঘটে সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, তিনি নিজের কামিল ও পবিত্র রসূলদেরকে স্বীয় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুসারে অদৃশ্য রহস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত করে থাকেন। অধিকন্তু যখন পছন্দ করেন, স্বীয় সত্য রসূলের কামিল মুসলমান অনুসারীদের উপর তাঁর আনুগত্যের কল্যাণে এবং স্বীয় রসূলের জ্ঞানের ওয়ারিশ হওয়ার সুবাদে কিছু অদৃশ্য রহস্যাবলী তাদের সামনেও উন্মোচিত করেন, যেন তা তাঁর ধর্মের সত্যতার নির্দর্শন বলে প্রমাণিত হয়। হিন্দু ও তাদের পঞ্জিত আর খ্রিস্টান ও তাদের পদ্বীদের ন্যায় অপরাপর যেসব জাতি মিথ্যার ওপর রয়েছে, তাদের সকলেই এই কল্যাণরাজি হতে বাধ্যত। আমি একথা বলা মাত্রই সে এই মর্মে নাহোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে যে, যদি ইসলামের অনুসারীদের অন্যান্য জাতির ওপর প্রাধান্য থাকে, তাহলে এখনই সেই প্রাধান্যের প্রমাণ দেয়া উচিত। প্রত্যুভাবে যদিও বলা হয়েছে যে, এ বিষয়টি খোদার নিয়ন্ত্রণে, মানুষের এর ওপর কোন কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু সেই আর্য অস্বীকারের ক্ষেত্রে হঠকারিতা প্রদর্শন অব্যাহত রাখে। বক্ষত যখন আমি দেখলাম যে, সে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও ইসলাম ধর্মের ঘৃণ্য অস্বীকারকারী, তখন আমার হৃদয়ে খোদার পক্ষ থেকে এই প্রেরণা সঞ্চার করা হয় যে, খোদা তাকে এই মামলায় লাষ্টিত ও অপদস্ত করণ। আমি দেয়া করি, হে মহাসম্মানিত খোদা! এ ব্যক্তি তোমার সম্মানিত রসূলের সম্মান ও মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে আর তুমি তোমার রসূলের প্রতি স্বীয় যেসব নির্দর্শন

ও ভবিষ্যত্বাণী প্রকাশ করেছ, সে তার ঘৃণ্য অস্থীকারকারী। এই মামলার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে তা প্রকাশ করা হলে সে নির্বাক হতে পারে। তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান, তুমি যা চাও কর, কোন বিষয়ই তোমার সর্বব্যাপী জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়! তখন ইসলাম ধর্মের নিরাপত্তা বিধানকারী খোদা, যিনি স্বীয় রসূলের সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে চান; রাতের বেলা স্বপ্নে আমার সামনে পূর্ণ সত্য খুলে দিয়েছেন আর প্রকাশ করেছেন যে, মামলাটি চীফকোর্ট থেকে পুনরায় নিম্ন আদালতে ফেরত আসবে এবং এই নিম্ন আদালতে তার শাস্তি অর্ধেকে নেমে আসবে, কিন্তু পূর্ণ নির্দোষ খালাশ পাবে না- গ্রীষ্মীয় তকদীরে এভাবেই বিষয়টি অবধারিত। দ্বিতীয়জন, তার সাথী পুরো কারাশাস্তি ভোগ করে মৃত্তি পাবে আর নির্দোষও প্রমাণিত হবে না। সুতরাং আমি জাহাত হওয়ার পর আমার মহা সম্মানিত খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম যিনি বিরোধীদের সামনে আমাকে অসহায় ও নিরূপায় রূপে পরিত্যাগ করেন নি। তখনই আমি এই স্বপ্ন একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে শুনিয়ে দিয়েছি। অধিকন্তু সেই হিন্দু সাহেবকেও সেন্দিনই অবহিত করেছি। এখন মৌলভী সাহেবে, আপনি স্বয়ং এখানে এসে যেতাবে চান কাদিয়ানে বসবাসরত সেই হিন্দু সাহেবে এবং অন্যান্যদের জিজেস করতে পারেন যে, আমি যে সংবাদ শুনলাম তা কী সঠিক, নাকি সঠিক নয়? আর এমন বিষয়ে ধর্মের বিরোধীদের সাক্ষ্য, বিশেষ করে পশ্চিত দয়ানন্দের অনুসারীদের সাক্ষ্য যে কতটা বিশ্বাসযোগ্য হবে তা আগন্তরাই ভালো জানবেন। এখন আমরা তৃতীয় একটি স্বপ্নও আপনার সমীপে নিবেদন করছি।

সর্দার মুহাম্মদ হায়াত খানের নাম হয়তো আপনি কোন সময় শুনেই থাকবেন যিনি সরকারের নির্দেশে দীর্ঘদিন বরখাস্তাবদ্ধায় ছিলেন। দেড় বছর হয়ত কেটে থাকবে বা কিছু দিন বেশিও হতে পারে; এই অবস্থায় তিনি যখন বিভিন্ন প্রকার সমস্যা, বিপদাপদ ও কাঠিন্যের সম্মুখীন হন আর সরকারের ইচ্ছাও কিছুটা বৈরী বলে প্রতীয়মান হয়, সেন্দিনগুলোতে আমি আমার স্বপ্নে তাঁর নির্দোষ খালাশ পাওয়ার সংবাদ পাই। স্বপ্নেই আমি তাকে বলেছিলাম যে, তুমি কোন ভয় করো না, খোদা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান, তিনি তোমাকে মৃত্তি দেবেন। সে অনুসারে এই সংবাদ বহু হিন্দু, আর্য ও মুসলমানকে জানিয়ে দেয়া হয়। যে-ই শুনেছে, সে এটিকে অকল্পনীয় জ্ঞান করেছে আর অনেকেই একে অসম্ভব বিষয় মনে করেছে। আমি শুনেছি, সে যুগে লাহোরে হায়াত খাল

সাহেবকেও কেউ এই সংবাদ পৌছে দিয়েছে। সুতরাং সকল প্রশংসা ও কৃপা আল্লাহর যে, এই শুভসংবাদও সেভাবেই পূর্ণ হয়েছে, যেভাবে দেখেছিলাম। এই স্বপ্নের সাক্ষীও ৬০-৭০ জন থেকে কম হবে না। যদি এক্ষেত্রে মুসলমানদের বা হায়াত খান সাহেবের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য না হয় তাহলে আপনাদের যেন স্মরণ থাকে যে, সাক্ষীদের মাঝে ১০-১২ জনের মত এমনও আছে, যারা হিন্দু ও আর্য সমাজের সদস্য, যারা বেদের অঙ্গ অনুসারী এবং মুসলমানদের চরম শক্তি। সর্দার মুহাম্মদ হায়াত খান সাহেবের সাথে আমাদের পত্র বিনিময়ও নেই আর মেলামেশাও নেই আর তেমন কোন সম্পর্ক এবং পরিচয়ও নেই। আমরা বিস্মিত হই যে, তার সর্বশেষ অবস্থা তার চরম ব্যাকুলতার যুগে খোদা কেন আমাদের সামনে প্রকাশ করলেন? অতএব, আজ এর কারণ প্রকাশিত হয়েছে যে, এই দিব্যদর্শনের কারণ হল, খোদা আমাদেরকে যে ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত করেছেন, সে ক্ষেত্রে এটিকে কাজে লাগানো। অতএব, সকল প্রশংসা আল্লাহর, পুনরায় বলছি সকল প্রশংসা আল্লাহর।

এখন আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য একটি চতুর্থ স্বপ্নও বর্ণনা করছি। প্রায় দশ বছর হবে, স্বপ্নে আমি হ্যারত ইসা (আ.)-কে দেখি। ইসা (আ.) এবং আমি এক স্থানে একই থালায় খাবার খাই আর খাবারে আমরা উভয়েই পরস্পরের প্রতি এমন অক্ত্রিম প্রীতিময় ব্যবহার করি, যেভাবে দু'জন আপন ভাই ও দীর্ঘদিনের দুই সাথী ও বন্ধু হয়ে থাকে। এরপর যেখানে বসে এ অধম এখন এই টীকা লিখছে, সেখানে আমি, ইসা (আ.) এবং রসূল (সা.)-এর বংশের একজন কামেল পৃত পবিত্র ব্যক্তি সাইয়েদ দালানে (দালান অর্থ এমন দীর্ঘ কক্ষ যেখানে মেহরাব সদৃশ জানালা থাকে) সানন্দে বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডয়ামান থাকে। সাইয়েদ সাহেবের হাতে একটি কাগজ ছিল, যাতে উন্মতে মুহাম্মদীয়ার কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিবর্গের নাম লিখিত ছিল আর মহাসম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে তাদের বিষয়ে কিছুটা প্রশংসাসূচক কথা লিখিত ছিল। সাইয়েদ সাহেব সেই কাগজ পড়া আরম্ভ করেন যা দেখে এমন মনে হচ্ছিল যেন তিনি মসীহকে উন্মতে মুহাম্মদীয়ার সেসব পদমর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করতে চান, যা আল্লাহর সন্নিধানে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আর এ কাগজে প্রশংসাসূচক বাক্যগুলো সম্পূর্ণভাবে খোদা তাঁলার পক্ষ থেকে ছিল। পড়তে পড়তে সে কাগজ যখন শেষের দিকে পৌছে আর কেবল সামান্যই অবশিষ্ট ছিল, তখন এ

অধমের নাম আসে, যাতে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আরবী ভাষায় এই প্রশংসা সূচক বাক্য লিপিবদ্ধ ছিল যে, فَكَادَ أَنْ يُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ، فَكَادَ أَنْ يُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ, সে আমার দৃষ্টিতে আমার তৌহিদ ও আমার স্বাতন্ত্রতার ন্যায় মর্যাদা রাখে, অচিরেই মানুষের মাঝে তাকে খ্যাতি দেয়া হবে। এই বাক্যের শেষাংশ এলহামস্বরূপ ‘এলকা’ও (অর্থাৎ জোরালোভাবে এ-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ) হয়েছে। যেহেতু সূচনা হতেই আমার এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রসারের প্রতি আগ্রহ রয়েছে, তাই স্বপ্ন এবং এই এলকাও (এক প্রকার এলহাম) কিছু মুসলমান এবং হিন্দুকে তখনই শোনানো হয়েছে, যারা এখনও কান্দিয়ানেই আছে। এখন দেখুন! এই স্বপ্ন ও এই এলহাম কত মহান আর মানবীয় শক্তির কতটা উর্ধ্বে। এই এলহাম যদিও এখনও পুরোপুরি পূর্ণতা লাভ করে নি, কিন্তু যথাসময়ে এর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা উচিত। কেননা খোদার প্রতিশ্রূতির ব্যত্যয় ঘটতে পারে না। এখানে স্মরণ থাকা উচিত যে, কখনো কখনো এমন মানুষও কোন না কোন সত্য স্বপ্ন দেখে থাকে, যারা ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত। কিন্তু তাদের ও খোদার প্রিয় রসূলের আনুগত্যকারী মুসলমানদের স্বপ্নে কয়েক প্রকার স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সেসব পার্থক্যের একটি হল, মুসলমানরা সত্য স্বপ্ন ব্যাপক হারে দেখে থাকে যেমন, খোদা তা'লা তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট প্রতিশ্রূতি দিয়ে রেখেছেন যে, إِنَّ الْبَشَرَىٰ فِي الْجِبْرِيلِ لِمَنْ يُهْلِكُ هُنَّا কিন্তু কাফির ও ইসলামের অস্তীকারকারীদের ভাগে এত ব্যাপক হারে সত্য স্বপ্ন আদৌ জোটে না বরং এর সহস্রতম অংশও নয়। আমাদের সেই সহস্র সহস্র সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে এর সত্যতার প্রমাণ দেয়া সম্ভব, যা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা শত শত মুসলমান ও হিন্দুকে অবহিত করেছিলাম আর আমরা শুরু থেকেই দাবি করে আসছি যে, ভিন্ন জাতি এর মোকাবিলার শক্তি রাখে না।

আরেকটি পার্থক্য হল, মুসলমানের স্বপ্ন বেশিরভাগ সময় অত্যন্ত উচ্চমানের ও সুমহান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শুভ সংবাদ সংবলিত হয়ে থাকে আর কাফিরের স্বপ্ন প্রায় সময় ইতর, তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন বিষয়ে হয়ে থাকে আর লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার ঘণ্য লক্ষণাবলী এতে প্রকাশ পায়। এর প্রমাণ পেতে হলে ন্যায়ের দৃষ্টিতে আমাদেরই স্বপ্ন সম্পর্কে গভীর মনোযোগ সহকারে প্রণিধান করা যথেষ্ট। যদি কেউ অস্তীকার করে, তাহলে ভিন্ন ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন মহান স্বপ্ন আমাদের সামনে উপস্থাপন করে প্রমাণ দিক।

আরেকটি পার্থক্য হল, মুসলমানের স্বপ্ন অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে থাকে।

এমনটি খুব কমই হয়ে থাকে যে, খাঁটি মুসলমানের স্বপ্ন অমূলক ও বিশ্বজ্ঞল স্বপ্নের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা সে পবিত্র হৃদয় ও পবিত্র ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে আর এক খোদার সাথে সত্যিকার যোগাযোগ রাখে আর এটি ইসলামের অস্বীকারকারীর বিপরীতে হয়ে থাকে, যে হৃদয়ের নোংরামী ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বক্রতা ও অসরলতার কারণে যেন এক নোংরামীতে পড়ে আছে, তার কোন স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার ঘটনা দৈবাংক ঘটে। এছাড়া অভিজ্ঞতা থেকে এটিও প্রমাণিত যে, ইসলামের কোন অস্বীকারকারীর কোন কোন স্বপ্ন কালেভদ্রে সত্য প্রমাণিত হলেও শর্ত হলো সে কোন পদ্মী বা পঙ্গিত যেন না হয় বরং এটি ঘটে থাকে কোন সরলপ্রাণ হিন্দু বা দীনহীন খ্রিস্টানের ক্ষেত্রে যার স্বীয় ধর্মে তেমন একটা বিশ্বাসও থাকে না আর ইসলামের প্রতিও তার তেমন কোন বিদ্বেষ না থাকা হলো শর্ত। এছাড়া ব্যাপক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটিও প্রমাণিত যে, কোন দরিদ্র হিন্দু ও খ্রিস্টানের স্বপ্ন কোন সময় কোন ক্ষেত্রে পূর্ণ হলেও তা ভুলভ্রান্তির মিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে না, বরং কিছু না কিছু বাড়তি-ঘাটতি, আগোছালো ভাব, অতিরঞ্জন এবং অপ্রতুলতা এতে অবশ্যই থেকে থাকে। আমাদের স্মৃতিতে অংশান যে, ১২৯৯ হিজরীর মহররম-এর প্রথম বা দ্বিতীয় তারিখে আমাদেরকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি বই ছাপার কাজে সাহায্যের আন্তরিকতা নিয়ে ৫০ রূপি পাঠিয়েছে। সেই রাতে একজন আর্য সাহেবও আমাদের জন্য স্বপ্ন দেখে যে, কেউ বই ছাপার কাজে সাহায্যের জন্য এক হাজার রূপি পাঠিয়েছে। তিনি স্বপ্ন শোনান আর আমরাও তখনই তাকে আমাদের স্বপ্ন শুনিয়ে দেই আর একথাও বলে দেই যে, তোমার স্বপ্নে ১৯ভাগ মিথ্যার মিশ্রণ ঘটেছে। তুমি যেহেতু হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের গঁণ বহির্ভূত, তাই এটি তারই শাস্তি। এটি হয়তো তার কাছে খোরাপ লেগে থাকবে কিন্তু কথা সত্য ছিল, যার সত্যতা ৫ম বা ৬ষ্ঠ মহররমে প্রকাশ পেয়ে গেছে। অর্থাৎ ৫ম বা ৬ষ্ঠ মহররমে একজন আর্য ও অন্য কিছু লোকের সামনে আমাদের কাছে জুনাগড় থেকে ৫০ রূপি আসে, যা সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী জনাব শেখ মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন সাহেব বই খাতে পাঠিয়েছেন, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

অনুরূপভাবে একবার খোদা আমাকে এক রাজার মৃত্যুর সংবাদ দেন। সেই সংবাদ আমি একজন হিন্দুকে অবহিত করি, যিনি ওকালতি করেন। সেই

সংবাদ সেদিনই পূর্ণ হলে সেই হিন্দু সাহেব গভীরভাবে আশ্চর্যাপ্তি হয় যে, অদৃশ্যের এমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার জ্ঞান কি করে জানা গেল?

সেই উকিল সাহেব একবার উকালতি পরীক্ষা দেন। সে বছর তাঁর সাথে জেলার আরো অনেকেই পরীক্ষা দিয়েছে। তখনও আমি একটি স্বপ্ন দেখি আর আমি সেই উকিল সাহেব এবং আরো কিছু লোককে তা অবহিত করি, যাদের কেউ ছিলেন তহসিলদার, কেউ দণ্ডরী আর কেউ মুহূরী। আমি বলেছি যে, তাদের মধ্য থেকে কেবল প্রথমোক্ত ব্যক্তি পাশ করবে, বাকি সকল প্রার্থী অকৃতকার্য হবে। অবশেষে তাই হয়েছে। ১৮৬৮ সনে উকিল সাহেবের পত্রের মাধ্যমে কাদিয়ানে আমরা এখানে এ সংবাদ পাই। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহুর।

এখানে যেন এ কথাও স্মরণ থাকে যে, যেভাবে জাগতিক বিষয়ে আমাদের বিরোধীদের স্বপ্ন প্রায়শ অমূলক, মিথ্যা ও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, অনুরূপভাবে ধর্মীয় বিষয়েও এর মিথ্যা ও হাত পা-বিহীন হওয়া সদা প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি আমরা শুনেছি খুব সম্ভব ৮/৯ বছর অতিবাহিত হয়ে থাকবে, একজন পাদ্রী সাহেব এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিন বছরের ভিত্তি হয়রত ঈসা (আ.) পাদ্রীদের সাহায্যের জন্য আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। আবার আমরা মনশূরে মুহাম্মদী বা কোন পত্রিকায় পড়েছি যে, ব্যঙ্গলোরের এক পাদ্রীও এমন এক প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। যাহোক সেই তিন বছর মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ঈসাকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখে নি। পাদ্রীদের এই ভবিষ্যদ্বাণী সেভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, যেভাবে কিছু জ্যোতিষ ১৮৮১ সনের নভেম্বরে কিয়ামত হবে বলে ধরে নিয়েছিল। স্পষ্ট হওয়া উচিত, আমরা এ কথা অস্বীকার করি না যে, কোন পাদ্রী হয়রত ঈসা (আ.)-এর নামেল হওয়া সম্পর্কে স্বপ্ন দেখে থাকবেন। কিন্তু আমরা যা বলতে চাই তা হলো, হয়রত খাতামুল আস্মিয়া (সা.)-এর বিরোধিতা ও তাঁর প্রতি শক্রতার কারণে পাদ্রীদের স্বপ্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিথ্যা ও বিফল প্রমাণিত হয়। আর বিরল ও ব্যতিক্রম হিসেবে কোন স্বপ্ন কিছুটা সত্য প্রমাণিত হলেও তা অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত থেকে যায়। অতএব, ঈসা (আ.) সম্পর্কে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন, তাকে যদি এই দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত করেন, তাহলে এর অর্থ হবে, মসীহ বলতে উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার কোন কামেল

ব্যক্তিকে বোঝায়। কেননা আদি হতে এই অভিজ্ঞতা চলে আসছে যে, কোন খ্রিস্টান যখন স্বপ্ন দেখে যে, এখন মসীহ আগত প্রায়, যিনি ধর্মকে সংজ্ঞীবিত করবেন বা কোন হিন্দু যদি দেখে যে, এখন কোন অবতার আসতে যাচ্ছেন, যার মাধ্যমে ধর্মের উন্নতি হবে। তাদের এমন স্বপ্ন কোন সময় সত্য হলেও এর ব্যাখ্যা যা দাঁড়ায় তা হলো, এই মসীহ বা অবতার বলতে কোন মুসলমান বোঝায়, যিনি ধর্মের উন্নতি ও সংশোধনকল্পে নিজের সময়ে আবির্ভূত হন। স্থীয় জ্যোতির্ময়তায় তিনি যেহেতু সকল পরিত্রিদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন, তাই যাদের সন্দেহের বাতিক রয়েছে, তাদের চিন্তার জগতে এমন ভাবেই চোখে পড়ে। অর্থাৎ সে তাদের চোখে এমন এক ব্যক্তির আকারে ধরা পড়ে, যাকে তারা নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে পরম পরিত্র, শ্রেষ্ঠ, সততা ও সাধুতার পথে নেতৃত্বদানকারী এবং নিজেদের পথ প্রদর্শক মনে করে। এক কথায়, খ্রিস্টান ও হিন্দুদের স্বপ্ন প্রায় সময় অঙ্গুলক, সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা বা সন্দেহপূর্ণ প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ সকল দিকগুলো সামনে রেখে এ কথা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, অজস্র ধারায় সত্যস্বপ্ন দেখা, উৎকৃষ্ট স্বপ্ন দেখা, মহান বিষয়াদি সম্পর্কে দেখা এবং অত্যন্ত পরিক্ষারভাবে দেখার মত বিশেষত্বগুলো হলো উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষত্ব। অন্য কোন ফির্কার এতে কোন অংশীদারিত্ব নেই। আর অংশীদারিত্ব না থাকার কারণ হল, তারা সকলে সঠিক ও সোজা পথ হতে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। তাদের চিন্তাধারা জগৎপূজা, সৃষ্টিপূজা ও প্রবৃত্তিপূজার জন্য নিরবিদিত। সরলপ্রাণ লোকদের আলো হতে তারা সম্পূর্ণভাবে রিভ্যু, বধিত ও দুর্ভাগ্য, যা খোদার পক্ষ থেকে তাদের লাভ হয়ে থাকে। এটি কেবল মৌখিক দাবি নয় বা কেবল বুলিসর্বস্ব বিষয় নয়, এটি একটি প্রমাণিত সত্য যা কোন বিবেকবান অস্থীকার করলে তার জন্য আবশ্যিক হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখানো। কেননা যে বিষয় শ্রেষ্ঠ প্রমাণাদি ও শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তা কেবল বৃথা ও বাজে কথায় খণ্ডিত হতে পারে না— সুতরাং ভেবেচিস্তে কথা বল।

### পঞ্চম ধরণ:

সেটি এমন, যার সাথে মানুষের ধারণার কোন সম্পর্ক নেই, বরং বাহির থেকে কোন শব্দ আসে আর এই শব্দ এমন মনে হয় যেমনটি কিনা পর্দার অন্তরাল থেকে কোন ব্যক্তি কথা বলে। কিন্তু সেই শব্দ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও সুউচ্চারিত

এবং কিছুটা দ্রুতলয় হয়ে থাকে আর হৃদয়ে এর মাধ্যমে এক প্রকার সুখকর অনুভূতি বিরাজ করে। মানুষ যখন কিছুটা চিন্তামগ্ন থাকে, তখন আকস্মিকভাবে এই শব্দ আসে আর সেই শব্দ শুনে সে আশ্চর্যাপ্ণিত হয় যে, এই শব্দের উৎস কোথায় আর কে আমার সাথে কথা বলেছে? বিস্ময়াভিভূত ব্যক্তির ন্যায় সে অগ্রে পশ্চাতে তাকায় আর তখন তার বোধদয় হয় যে, এটি কোন ফিরিশতার ধ্বনি। আর বহিরাগত এই আওয়াজ প্রায় সময় এমন অবস্থায় শুভসংবাদস্বরূপ আসে যখন মানুষ কোন বিষয়ে উদ্বিদ্ধ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে বা কোন অনভিপ্রেত মিথ্যা সংবাদ শুনার ফলে গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার এলহামের ন্যায় এক্ষেত্রে বারংবার দোয়ার ফলে এই আওয়াজ বা ধ্বনি সৃষ্টি হওয়া অভিজ্ঞতায় আসে নি, বরং খোদা যখন চান কোন ফিরিশতা হঠাতে অজানা স্থান হতে আকস্মিকভাবে শব্দ করে। দ্বিতীয় ধরনের এলহামের বিপরীতে এতে প্রায়শ পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট দোয়ার ফলশ্রূতিতে মহাসম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে উভর প্রদানের অভিজ্ঞতা হয়েছে। শতবার দোয়া ও যাচনার ব্যাপার ঘটলেও মহাদানশীল খোদার পক্ষ থেকে এর উভর শতবার আসা সম্ভব, এ অধমের নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা এ কথার সাক্ষী। এ ধরনের এলহামের প্রেক্ষাপটে এই অধমের একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে, যার মাধ্যমে খোদার পক্ষ থেকে সম্মানিত হয়ে এই অধম কাদিয়ানে বসবাসকারী আর্য সমাজীদের এক সদস্যকে অভিযুক্ত করেছে এবং তার মুখ বন্ধ করেছে, যে এখনও জীবিত আছে। এটি এমন অকল্পনীয় এবং যার ঘটা বাহ্যত এতটা অসম্ভব মনে হত যে, তা শুনে এ আর্য ঘৃণ্যভাবে অস্বীকার করে আর হঠকারিতামূলকভাবে বলে যে, এরূপ অকল্পনীয় ঘটনা ঘটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কিন্তু একথা অবশ্যে সেভাবেই পূর্ণ হয়েছে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল এই আর্যকেই বলা হয় নি, বরং আরো অনেককে অবহিত করা হয়েছে, যারা এখনও জীবিত আছে আর কারও অস্বীকারের জো নেই। যেহেতু এই ভবিষ্যদ্বাণী একটি দীর্ঘ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, তাই এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যাহোক বুঝতে হবে যে, এলহাম এক বাস্তব ও নিশ্চিত সত্য, যার পৃত পরিত্র উৎস হল, ইসলাম ধর্ম। খোদা, যিনি আদি হতে সত্যবাদীদের বন্ধু, তিনি অন্যদের সামনে এই জ্যোতিমণ্ডিত দ্বার আদৌ উন্মুক্ত করেন না আর স্বীয় বিশেষ নিয়ামত অন্যদেরকে আদৌ দান করেন না আর কেনই বা দেবেন? যে

ব্যক্তি নিজের ঘরের সকল দ্বার বন্ধ করে চোখের উপর পর্দা লেপন করে বসে আছে, সে কী সেই ব্যক্তির মত আলো লাভ করবে, যার (ঘরের) সব দরজা খোলা এবং যার চোখ পর্দামুক্ত? দৃষ্টিইচী ও দৃষ্টিবান কি সমান হতে পারে? অঙ্ককার কি আলোর সামনে দাঁড়াতে পারে? কুস্থ রোগী, যার সারা দেহ কুস্থে খাওয়া, যার অঙ্গপ্রতঙ্গ পচে গলে খসে পড়ে, সে কি দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তের সমকক্ষতার দাবি করতে পারে, যাদেরকে খোদা পূর্ণ সুস্থতা ও সৌন্দর্য দান করেছেন? সদা সত্যাগ্রহীকে আমরা এ কথার প্রমাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি যে, সেই আধ্যাত্মিক ও প্রকৃত এবং সত্য কল্যাণরাজি যা মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারীদের মাঝে বিদ্যমান, তা অন্য কোন ফির্কায় আদৌ নেই। আমরা যেখানে খ্রিষ্টান, আর্য ও অন্যান্য জাতির তমসাছন্ন ও ভৃক্ষেপহীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি আর তাদের সকল পঞ্চিত, যোগী, সন্ন্যাসী, পাত্নী ও মিশনারীদেরকে স্বর্গীয় জ্যোতি থেকে সম্পূর্ণরূপে রিঙ্গ ও বঞ্চিত দেখি, পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় (সা.) স্বর্গীয় জ্যোতি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজির একটি সমুদ্র প্রবাহমান পাই এবং ঐশ্বী জ্যোতিকে বারিধারার ন্যায় বর্ষণরত লক্ষ্য করি— সেখানে প্রশং দাড়ায় যে, কী করে আমরা তা অস্তীকার করতে পারি, যে বিষয় আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি আর যার সাক্ষ্য আমাদের শিরা-উপশিরায় বিরাজমান আর আমাদের প্রতিটি রক্ত বিন্দু যার দর্শনভিত্তিক সাক্ষী? জানা বিষয়কে আমরা কি অজানা জ্ঞান করব বা দেখা ও পরীক্ষিত বিষয়কে অদেখা ও অপরীক্ষিত আখ্যা দেব, কী করবো? আমরা সত্য বলছি আর সত্য বলা থেকে কোনভাবে বিরত থাকতে পারি না, মহানবী (সা.) যদি না আসতেন, কুরআন যদি অবতীর্ণ না হতো, যার প্রভাব ও কার্যকারিতা আমাদের নেতৃস্থানীয় ও জ্যেষ্ঠরা শুরু থেকে দেখে আসছেন আর আজ আমরা দেখছি, তাহলে কেবল বাইবেল দেখে নিশ্চিতরূপে শনাক্ত করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যেতো যে হ্যরত মুসা, হ্যরত ঈসা ও অতীতের অপরাপর নবীরা (আ.) সত্যিকার অর্থে সেই পৃত পবিত্র জামা'তের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে খোদা স্বীয় বিশেষ স্নেহের পরাশে আপন রিসালতের জন্য বেছে নিয়েছেন। আমাদের প্রতি কুরআনের এই অনুগ্রহ স্বীকার করা উচিত, যা সকল যুগে নিজেই স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করেছে আর সেই পূর্ণ জ্যোতির মাধ্যমে অতীতের নবীদের সত্যতাও আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আর এই অনুগ্রহ শুধু আমাদের প্রতি নয়, বরং আদম থেকে আরম্ভ করে হ্যরত ঈসা

পর্যন্ত সব নবীর প্রতি হয়েছে, যারা কুরআনের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন। আর সব রসূল সেই মহান সত্তার অনুগ্রহের কাছে ঝণী, যাকে খোদা সেই উৎকৃষ্ট ও পবিত্র গ্রন্থ দিয়েছেন, যার পরমোক্তর প্রভাবের কল্যাণে সব সত্য চিরতরে অমর হয়ে গেছে এবং যার মাধ্যমে সেসব নবীর নবুয়তে বিশ্বাস স্থাপনের একটি পথ উন্মোচিত হয় আর তাদের নবুয়ত সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত থাকে।

জানা থাকা উচিত যে, দু'ধরনের নিদর্শন পবিত্র কুরআনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। একটি হল, কুরআনের ভাষার নিদর্শন আর দ্বিতীয়টি হল, কুরআনের ভাষার প্রভাব বা কার্যকারিতার নিদর্শন। এই উভয় প্রকার নিদর্শন এত স্পষ্ট যে, যদি কারো হৃদয় বাহ্যিক অথবা রূপক ভ্রক্ষেপহীনতার কারণে পর্দাবৃত না থাকে, তাহলে সে তাৎক্ষণিকভাবে সত্যের এই জ্যোতিকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। কুরআনের ভাষা যে নিদর্শনমূলক, এই পুরো গ্রন্থ এর বর্ণনায় পরিপূর্ণ আর কোন কোন প্রকার নিদর্শনের কথা ১১ নম্বর টীকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনের ভাষার প্রভাব ও কার্যকারিতার নিদর্শন সম্পর্কে আমাদের কাছে এই প্রমাণও রয়েছে যে, আজ পর্যন্ত এমন কোন শতাব্দী অতিবাহিত হয় নি, যাতে খোদা তাঁলা সোচ্চার ও সত্যান্বেষীদেরকে কুরআনের পূর্ণ অনুসরণের ফলে উৎকৃষ্ট আলো পর্যন্ত পৌছান নি। সন্ধানীদের জন্য এখনও এই জ্যোতির অতি প্রশংসন্ত দ্বার উন্মোচিত রয়েছে, কেবল অতীতের কোন শতাব্দীর বরাতে কথা বললেই চলে না। সত্য ধর্ম ও ঐশ্বী গঞ্জের সত্যিকার অনুসারীদের ভেতর আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি থাকা বাস্তুনীয়, বিশেষ ঐশ্বী রহস্যাবলীভিত্তিক এলহামের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত আর এসব কল্যাণরাজি আজও সন্ধানীদের লাভ হওয়া সম্ভব। কারো দেখে ইচ্ছা থাকলে নিষ্ঠার সাথে এদিকে আসা উচিত আর তা দেখে নিজের পরিণাম শুভ করা উচিত, ইনশাআল্লাহ্ সত্যান্বেষী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে আর প্রত্যেক দৃষ্টিবান এ ধর্মের মাহাত্ম্য দেখতে পাবে। কিন্তু আমাদের সামনে এসে কে এ কথার প্রমাণ দিতে পারে যে, হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালতের শ্রেষ্ঠত্ব ও কুরআন খোদার পক্ষ থেকে হওয়ার কথা অস্বীকারকারী আমাদের কোন বিরোধীর মাঝেও সেই স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান? সেও কোন আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও ঐশ্বী সমর্থন নিজের সাথে রাখে? পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এমন কোন

মানুষ আছে কি যে কুরআন শরীফের এসব জাঞ্জল্যমান জ্যোতির মোকাবিলা করতে পারে? কেউ নেই, একজনও নেই। বরং যারা আছলে কিতাব আখ্যায়িত হয়, তাদের হাতে শুধু কথা ছাড়া আর কিছুই নেই। হ্যরত মূসার অনুসারীরা বলে যে, হ্যরত মূসা যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, তখন একই সাথে তাঁর লাঠিও বিদায় নিয়েছে যা সাপ হয়ে যেতো। আর যারা হ্যরত ঈসার অনুসরনের দাবিদার তাদের কথা হল, হ্যরত ঈসাকে আকাশে উঠানো হয়েছে আর একই সাথে তাঁর সেসব কল্যাণও উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, যার কল্যাণে তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতেন। অবশ্য খ্রিস্টানরা এ দাবিও করে যে, হ্যরত ঈসার ১২জন শিষ্যও কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাদের এ উক্তিও রয়েছে যে, সেই ১২জন ইমাম ঐশ্বী জ্যোতি ও এলহামকে নিজেদের সাথে নিয়ে গেছেন আর তাদের তিরোধানের পর আকাশের দরজায় মজবুত তালা লেগে গেছে। এরপর কোন খ্রিস্টানের ওপর সেই কবুতর আর নায়িল হয় নি, যা প্রধানত হ্যরত ঈসার প্রতি নায়িল হয়ে এরপর অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করে হাওয়ারীদের (শিষ্যদের) প্রতি নায়িল হয়েছিল। এক কথায় ঈমানের সেই স্বর্গীয় শস্যদানা, যার আকর্ষণে সেই স্বর্গীয় কবুতর অবতরণ করতো, তাদের হাতেই ছিল আর এই শস্যদানার পরিবর্তে খ্রিস্টানদের হাতে এখন বন্দুবাদিতার জাল বা ফাঁদ রয়ে গেছে, যা দেখে সেই কবুতর আকাশ পানে উড়ে গেছে। এক কথায়, কুরআন শরীফ ছাড়া স্বর্গীয় জ্যোতি অর্জনের কোন মাধ্যম এখন আর নেই। আর সত্য-মিথ্যার মাঝে যাতে স্থায়ীভাবে পার্থক্য বজায় থাকে এবং কোন যুগে যাতে মিথ্যা সত্যের সামনে দাঁড়াতে না পারে, তাই আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে কালের শেষ পর্যন্ত এই দু'টি নির্দর্শন অর্থাৎ কুরআনের ভাষা বা বিষয়বস্তু এবং কুরআনের প্রভাব বা কার্যকারিতার নির্দর্শন না থাকত, তাহলে ঈমানের লক্ষণাবলী ও ঈমানের আলোর ক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কি-ই বা শ্রেষ্ঠত্ব থাকত? কেননা কেবল তপস্যা, বৈরাগ্য ও পাপমুক্ত থেকে (মানুষ) নির্দর্শনের পর্যায়ে পৌছতে পারে না। কোন পদ্মী বা পঙ্গিত অথবা ব্রাক্ষণের জন্য প্রকৃতিগতভাবে এমন সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারী

হওয়া সম্ভব নয় কি যে, বাহ্যত পাপ বর্জন ও তপস্যা এবং পবিত্রতা অবলম্বন করবে? এমন ক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, সকল ফির্কা যদি শুক্র বৈরাগ্য অবলম্বন করতে পারে তাহলে মু'মিন ও অমু'মিনের লক্ষণাবলীর মাঝে কি-ই বা পার্থক্য থাকলো? অথচ লক্ষণ ও প্রভাবের দিক থেকে সত্য ও মিথ্যার অনুসারীদের মাঝে পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। মু'মিনও যদি বিশ্বাসহীনের ন্যায় স্বর্গীয় জ্যোতি থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াবে, তার ঈমানের এমন কোন্ জ্যোতি পৃথিবীতে প্রকাশিত হলো? আর ঈমানহীনতার উপর ঈমানের কি-ই বা শ্রেষ্ঠত্ব? কুরআনের প্রভাব বা কার্যকারিতার নির্দর্শন যেভাবে দেদীপ্যমান এবং যে বিষয়ে মানুষকে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য আমরা নিজেই দায়িত্ব নিয়েছি, সেখানে এই প্রমাণের বর্তমানে কথা আর দীর্ঘ করার কোন প্রয়োজন নেই। যার সন্দেহ হয়, সে পরীক্ষা করে নিক। এখানে একথাও স্পষ্ট হওয়া চাই যে, ঐশ্বী এলহামের মাধ্যমে কারো সামনে যে বিষয় অবর্তীর্ণ হয়, তা যদি বিশ্বাস করার মত কোন কারণ নিজের মাঝে রাখে বা বিশ্বাস স্থাপনের কোন নির্দর্শন খোদা যদি তার সামনে প্রকাশ করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তার জন্য এবং অন্য সবার জন্য তা অনুসরণ করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তিকে সেই এলহামের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, সে যদি তা কার্যে রূপায়িত করা থেকে জেনেগুনে বিরত থাকে, তাহলে সে ঐশ্বী কোপানলে পড়বে, বরং তার পরিণতি অশুভ হওয়ার ভয়াবহ আশংকা রয়েছে। বালম বিন বউরকে খোদা এলহামে বলেছিলেন যে، تَدْعِ لَا تَدْعِ تাদেরকে অভিশাপ দেবে না অর্থাৎ মূসা ও তাঁর বাহিনীকে অভিশাপ দিও না, সে খোদার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে হ্যরত মূসার বাহিনীকে অভিশাপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরিণতি যা হয়েছে তা হল, খোদা তাকে নিজ সন্তুষ্টান হতে বিতাড়িত করেছেন আর তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। এই এলহামই ছিল, যার অনুগমনে হ্যরত মূসার মা হ্যরত মূসাকে দুধের বয়সে একটি সিন্দুকে ভরে নদীগর্ভে ফেলে দিয়েছেন। এলহামই ছিল, যা দেখার জন্য মূসার মত দৃঢ় প্রত্যয়ী পয়গম্বরকে খোদা স্বীয় এক বান্দা খিয়িরের কাছে পাঠিয়েছেন, যার নাম ছিল বিলিয়াবিন মালকান। যার নিশ্চিত জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

فَوَجَدَ أَعْبَدًا مِّنْ عَبَادٍ نَّا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لُذْنَا عِلْمًا

(সূরা আল্ কাহফ: ৬৬)

সেই নিশ্চিত সংবাদেরই ফলাফল যে, খিয়ির হয়রত মুসার সামনে এমন কাজ করেছেন, যা বাহ্যত শরিয়ত পরিপন্থী মনে হয়। নৌকা ভেঙে দিয়েছেন, এক নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেছেন, একটি অপ্রয়োজনীয় কাজকে কোন প্রতিদান বা বিনিময় ছাড়াই নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। খিয়ির রসূল ছিলেন না নতুবা তিনি স্থীয় উম্মতে থাকতেন, জঙ্গল ও নদনদীর তীরে নয়। খোদাও তাকে রসূল বা নবী বলে সম্মোধন করেন নি, কিন্তু তাকে যে সংবাদ দেয়া হতো, তা হতো নিশ্চিত। কেননা কুরআনের ভাষায় যা সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ়, তাকেই জ্ঞান বলা হয়। এটি জানা কথা যে, খিয়িরের কাছে যদি কেবল কান্ননিক কথাবার্তার স্তুপ হতো তাহলে আনুমানিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেসব কাজ করা, যা সম্পূর্ণভাবে শরিয়ত পরিপন্থী, অপচন্দনীয় বরং নবীদের সর্বসম্মত মতামত অনুসারে কবিরা গুনাহ, তা তার জন্য কীভাবে বৈধ হতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে তাঁর কাছে হয়রত মুসার আসাও নির্থক ছিল। অতএব, যেখানে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, খিয়িরকে খোদার পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, সেখানে কোন ব্যক্তি মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে আর কুরআন শরীকে স্টমান এনে কীভাবে এ কথা অঙ্গীকার করতে পারে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পরাকার্তার দৃষ্টিকোণ থেকে খিয়ির আখ্যা পেতে পারে না? -আলবত পারে। বরং চিরঙ্গীব ও চিরস্থায়ী খোদা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এর চেয়েও উত্তম এবং অধিক আধ্যাত্মিক নিয়ামত দান করার ক্ষমতা রাখেন *اللَّمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَبِيلٌ* সেই মহাসম্মানিত খোদা স্বয়ং কি এই উম্মতকে এ দোয়া শিক্ষা দেন নি যে, *إِهْسَأَ الْصِّرَاطَ الْসُّتْقِيمَ صِرَاطَ الْبَّنِينَ الْعَبْتَ عَلَيْهِمْ*, বলেন নি নিশ্চিত থাকতে পার যে, মহাসম্মানিত খোদা এই উম্মতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল আর আদি হতে তিনিও চান যে, স্বীয় আলোকিত কল্যাণরাজি ও স্বর্গীয় জ্যোতির মাধ্যমে ভিন্ন জাতির উপর যেন এই উম্মতের স্পষ্ট প্রাধান্য থাকে, শক্র যেন এ কথা বলতে না পারে যে, তোমাদের ও আমাদের মাঝে পার্থক্যই বা কী! শক্রের মুখে চুনকালি। সে স্বীয় নোংরা হৃদয় ও মিথ্যা অভ্যাসের বশে যেন এ কথা বলতে না পারে যে, পবিত্রদের সর্দার মহানবী (সা.), তাঁর পৃত পবিত্র বংশ এবং তাঁর আলোকিত জামাত ঐশ্বী কল্যাণরাজি দেখাতে পারে নি। তোমরা ভাব ও চিন্তা কর, তোমাদের মধ্য থেকে ও তোমাদের জাতি হতে কিছু মানুষকে খোদা কর্তৃক

স্বীয় আলোর পর্যাণ্ত অংশ প্রদান, তোমাদের সবার ঈমানকে উৎকর্ষ পর্যায়ে  
পৌছানো আর বিরোধীদের অভিযুক্ত ও লাঞ্ছিত করা। এটি কি তোমাদের জন্য  
উত্তম ও কৃতজ্ঞতার বিষয়, নাকি স্বর্গীয় জ্যোতি হতে রিক্ত হস্ত থেকে অতীতের  
কাহিনী অবলম্বনে যেভাবে তোমাদের বিরোধীরা জীবনযাপন করছে, সেভাবে  
জীবন যাপন করা শ্রেয়? ভিন্ন জাতির প্রতি তাকাও? তারা কেন ডুবলো এবং  
ধ্বংস হল? এর কারণ হল, অতীত-গ্রন্থ, ইঞ্জিল ইত্যাদি ক্রটিবিচ্যুতি ও  
পরিবর্তন পরিবর্ধনের কারণে আপন অঙ্গিত্ব ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কোন নির্দর্শন  
এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি আর কেবল গল্প ও কাহিনী  
হিসেবে অতীতের নির্দর্শনাবলীর উপরই এর ভিত্তি ছিল। কিন্তু এটি কীভাবে  
সম্ভব হতে পারে যে, যারা হযরত মুসার লাঠিকে নিজ চোখে সাপ হতে দেখে  
নি আর না হযরত ঈসার হাতে কোন মৃতকে কবর হতে উথিত হতে দেখেছে,  
তারা ভিন্নিহীন কাহিনী শুনে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছবে? হতভাগা ইহুদী ও  
খ্রিস্টানরা জগতমুখী হয়ে গেছে, পরকালের প্রতি তাদের মাঝে কোন বিশ্বাস  
আর অবশিষ্ট থাকে নি। কেননা নিজ চোখে তারা কিছু দেখে নি আর কোন  
প্রকার কল্যাণও পর্যবেক্ষণ করে নি। এক কথায়, যার ঈমান খ্রিস্টান, ইহুদী ও  
হিন্দুদের মত কেবল কল্পকাহিনী নির্ভর তার ঈমানের কোন স্থিতি বা নিশ্চয়তা  
নেই। চূড়ান্ত পর্যায়ে তার জন্য সেই অষ্টতাই অবধারিত, যে অষ্টতায় খ্রিস্টান ও  
অন্যান্য দুর্ভাগ্য জাতি নিপত্তি। যাদের সমস্ত সম্পত্তি হলো সেই পুরোনো  
কল্পকাহিনী এবং সহস্র বছরের পরিত্যক্ত ও পুরোনো গল্প, কিন্তু এমন  
ব্যক্তির ঈমানের কোন নিশ্চয়তা নেই। তাদের জন্য কোন ভাবেই জানা সম্ভব  
নয় যে, সেই চিরায়ত সন্তা খোদা, যিনি পূর্বে তাদের প্রবীণদের সাথে ছিলেন,  
তিনি এখন কোথায় বা আদৌ আছেন কিনা? ভাইয়েরা! যদি তোমরা খোদাকে  
চাও, যদি ঈমানের সন্ধানী হয়ে থাক, যদি তোমাদের হৃদয়ে জগতের মোহ না  
থাকে, তাহলে উঠো এবং কৃতজ্ঞতার সেজদা কর। কেননা খোদা তোমাদের  
জামাতকে ভুলেন নি। তিনি তোমাদের ধ্বংস করতে চান না যেন তোমরা  
তাঁর দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞ চিহ্নিত হও। খোদার নির্দর্শনাবলীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো  
না, কেননা এটি তোমাদের জন্য বিপজ্জনক। খোদার নিয়ামতরাজিকে  
প্রত্যাখ্যান করো না, এটি তাঁর ক্রোধের কারণ। জগতপ্রেমে মন্ত হয়ো না  
কেননা এটিই সকল অহংকার, হিংসা ও আতঙ্গাঘার মূল। খোদার

আয়াতসমূহকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে না, কেননা এর পরিণতি ভালো নয়।  
আল্লাহ তাঁলা বলেন - وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي أَتَيْنَاهُ أَيْتَنَا...

---

মন্ত্র পিছ তো গফ্তম ঘূম দল ত্রসিদম কে দল আর শুয়ি ও রন্ধ স্খন ব্যারাস্ট  
আমি আমার হৃদয়ের চিত্ত তোমার সামনে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি এ আশক্ষায়  
যে, কোথাও তুমি বিরক্তি বোধ না কর নতুবা কথা তো অনেক আছে।

আমরা আমাদের বক্তব্য এই দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত করছি।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَتَحِينَ

(সূরা আল আরাফ-৯১)

## পাদটীকা নম্বর দুই (২)



একমাত্র প্রকৃষ্ট ও প্রকৃত এলাহাম হলো কুরআন শরীফ যা ব্রাহ্মণ সমাজী ও অন্যান্য মিথ্যা ধর্মের সকল প্রকার কুম্ভগাকে পুরোপুরি দূরীভূত করে এবং সত্যামৈবীকে দৃঢ় বিশ্বাসের মানে উপনীত করে। এটি ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই যা অন্য সব ফির্কার মিথ্যা সন্দেহ দূরীভূত করতে পারে আর মানুষকে নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছাতে পারে।

হায় পরিতাপ! অঙ্গ ও ভালোমন্দের পার্থক্যজ্ঞানহীন এই পৃথিবীতে এমন মানুষ অনেক কম, যারা খোদাকে স্বীয় প্রকৃত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে, ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষ এবং অন্যান্য পার্থিব লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে সেই জ্যোতি ও সত্যকে গ্রহণ করবে, যা খোদা তাঁলা বিশেষ করে কুরআন শরীফে অন্তর্নিহিত রেখেছেন আর অন্যদের মাঝে যা দেখা যায় না।

গ্রহণ করা তো দূরের কথা, আমাদের বিরোধীদের মাঝে বরং এতটুকু লজ্জাবোধও অবশিষ্ট নেই যে, পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট মাহাত্ম্য ও শাশ্঵ত সত্যরাজি দেখে আর স্বীয় ধর্মের ক্রটিবিচৃতি ও ভষ্টতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে অপলাপ ও বাজে কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে আর চোর হয়ে চতুরতার আশ্রয় নেয়া পরিহার করবে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করা উচিত যে, খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের ভাস্তি কত স্পষ্ট! অনর্থক চাপাবাজি করে একজন দুর্বল মানুষকে বিশ্বপ্রতিপালক বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এরপরও খোদা তাঁলার প্রতি এসব লোকের এমন ওদাসীন্য ও ভংকেপহীনতা যে, হিসাবনিকাশ দিবসকে আদৌ ভয় করে না। এমনভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন যে, শত শত আলেম ও বিজ্ঞরা জাগ্রত করার চেষ্টায় ঝুঁত, শ্রান্ত ও অবসন্ন; কিন্তু তাদের চোখ খোলে না বরং স্থায়ীভাবে জগৎপৃজ্ঞায় মন্ত।

মনোযোগের ঘাটতির কারণে তারা এই মিথ্যা ধারণায় নিমগ্ন যে, ইঞ্জিলের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা হতে উৎকৃষ্ট ও উত্তম। সম্প্রতি এক পাত্রী সাহেব নূর আফশাঁ পত্রিকার ১৮৮২ সনের ৩ মার্চের সংখ্যায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে কুরআন বা কুরআনের রসূল এমন কী শিক্ষা

বি. দ্র.: পাদটীকা নম্বর দুই (২) টীকা নম্বর এগার (১১)-এর ১৬৩ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে। —অনুবাদক

এনেছেন, যা বাইবেলে নেই। অধিকন্তে কুরআন কোন্ বিষয়ে ও কোন্ কোন্ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইঞ্জিলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যাতে এটি প্রমাণ হতে পারে যে, ইঞ্জিল অবর্তীণ হওয়ার পর কুরআনী শিক্ষারও কোন প্রয়োজন রয়েছে? অনুরূপভাবে সরলমতি মানুষের দৃষ্টিতে ইঞ্জিলের ক্রিটিপূর্ণ ও কল্পিত শিক্ষাকে প্রশংসনীয় করে তোলা ও কুরআনী শিক্ষার বিরংদৈ অন্যায় অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য আবদুল মসীহ ইবনে ইসহাক আল-কনদী নামে একটি আরবী পত্রিকা আরম্ভ করা হয়। কিন্তু নির্বাধ খ্রিস্টানরা জানে না যে, প্রমাণ ছাড়া কোন গ্রন্থের প্রশংসা আর অপরটির তিরক্ষার করে যাওয়া কোন গ্রন্থকে প্রশংসিত বা ধিকৃত করে না। অনর্থক কথা বলতে কে না জানে! কিন্তু আমরা এ গ্রন্থে ইঞ্জিলের শিক্ষার সত্য বাস্তিত হওয়া আর কুরআনী শিক্ষায় জ্যোতির সমাহার ঘটা শত শত যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছি। এ সম্পর্কে আমরা কেবল দশ হাজার রূপি প্রদানের ঘোষণাই দেই নি বরং খোদা তাঁলা এ কথার সাক্ষী, যিনি হৃদয়ের রহস্য সম্পর্কে অবগত যে, যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষায় একটি বিন্দুর সহস্র ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ক্রটি দেখাতে পারে বা পক্ষান্তরে কুরআনী শিক্ষার মোকাবিলায় এর চেয়ে উত্তম স্বীয় কোন গ্রন্থের এমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে তাহলে আমরা মৃত্যুদণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছি। হে সুবিচারকগণ! এখন চিন্তা কর আর খোদার খাতিরে হৃদয় পরিক্ষার করে চিন্তা কর যে, আমাদের বিরোধীদের বিশ্বাস ও খোদাভীতি কোন পর্যায়ের! নির্বাক হওয়া সঙ্গেও তারা অপলাপ থেকে বিরত হয় না।

آؤ عیاسیو ادھر آؤ نور حق دکھو راہ حق پاؤ

হে খ্রিস্টানগণ! এদিকে আস, সত্যের জ্যোতি দেখ যেন সত্য পথ পেতে পার।

جس قدر خوبیاں ہیں فرقان میں کہیں انگلیں میں تو دھلاوے

কুরআনের যত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ইঞ্জিলের কোনস্থানে তা (আছে বলে) দেখাও।

سر پ خلق ہے اُس کو یاد کرو یوں ہی مخلوق کو نہ بہکاؤ

স্বাস্থ্য তোমাদের জীবন শিরারও অধিক নিকটে তাঁকে স্মরণ কর

সৃষ্টিকে এভাবে বিভ্রান্ত করো না

کب تک جھুঁট সে করো গে পীয়ার কেঁচ তো জু কু ব্যি কাম ফ্রাম

আর কতদিন মিথ্যাকে ভালোবাসবে, সত্যকে কিছুটা হলেও কাজে লাগাও

কেঁচ তো খোফ খদা করো লোক কেঁচ তো লোক খদা সে শ্রমাও

ہے مانوں! کیڑھٹا ہلنے والے خودا کے بڑے کر خودا ر سامنے کیڑھٹا ہلنے والے  
لجنہ کر

عیش دنیا سدا نہیں پیارو اس جہاں کو بقا نہیں پیارو  
ہے پریگان! ایہ جیون چرخی نیں، ہے پریگان! ا جگتے ر سٹھیت نہیں  
یہ تو رہنے کی جا نہیں پیارو کوئی اس میں رہا نہیں پیارو  
اٹی بس باس سڑک نیں، ہے پریگان! ہے پریگان! کہو اخوان ر سٹھیت  
پارے نی

اس خراب میں کیوں لگاؤ دل ہاتھ سے اپنے کیوں جلاو دل  
ایسے بیراگ بُرمیکے کہن تالوں اس بے؟ نیج ہاتھ کہن نیج ہدایہ  
آٹیس سانگوگ کر رہے؟

کیوں نہیں تم کو دین حق کا خیال ہائے سو سو اٹھے ہے دل میں ابال  
ساتھی دھرمیکے کہن تالوں اس بے؟ نیج ہاتھ کہن نیج ہدایہ  
ہدایہ شات شات با ر رکشہ ران ہے!

کیوں نہیں دیکھتے طریق صواب کس بلا کا پڑا ہے دل پہ جاپ  
ساتھیک پথے کے پریتی کہن تالوں دُستی یا ر نا تالوں اس بے؟  
کہن کہن پاپے کے فسال؟

اس قدر کیوں ہے کین و اسکبار کیوں خدا یاد سے گیا یک بار  
اٹتا بیدے و اہنگ کاروں کاروں کی، کہن خودا ر سمعتی تالوں اس بے?  
থکے سمسوں بُرمیکے مُھے گھے?

تم نے حق کو بھلا دیا ہیہات دل کو پھر بنا دیا ہیہات  
ہے! تالوں اس بے کے بھلیے دیوی، پریتی! تالوں اس بے کے پاٹاں کر رے  
ٹولے

اے عزیزو سُنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انساں  
ہے پریگان شوں! کُرآن چاڑا مانوں کخنے خودا ر سامنے لایا کر رے نا

جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں اُن پہ اُس یار کی نظر ہی نہیں

بخارا اسی تیر کے خبر رائے نا تادہر پرتو سے اسی بخوبی سے ہدایت دینا ।

ہے یہ فرقاں میں اک عجیب اثر کہ بناتا ہے عاشق دلبر  
کو رانے اتنے اک ویسے کارکر کو سمجھا کرنے کے لئے اسی کو رانے  
کو رانے اتنے اک ویسے کارکر کو سمجھا کرنے کے لئے اسی کو رانے  
کو رانے اتنے اک ویسے کارکر کو سمجھا کرنے کے لئے اسی کو رانے

جس کا ہے نام قادر اکبر اس کی ہستی سے دی ہے پختہ خبر  
بخارا نام ہللو سبھی سے بڑا 'کارنے'، تاں ساٹھا سمسپرکے دھنے سے  
کوئے دلبر میں کھصیچ لاتا ہے پھر تو کیا کیا نشان دکھاتا ہے  
بخوبی کیلیتے ٹینے آنے ارپان ہر رکھ نیدرشن پردازی کرنے

دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے سینہ کو خوب صاف کرتا ہے  
ہدایے سکل یونگے ابیرات جو یادیں سانپھر کرنے، بکھر کے خوب بالوں بآبے  
پریشان کرنے

اس کے اوصاف کیا کروں میں بیان وہ تو دیتا ہے جاں کو اور اک جاں  
اک جاں ارپان بیشیستھا بلی ٹولے ڈرانا آمادا جنے سادھیاتیت، اتنے مانوں کے تاریخی  
ساتھاں ڈینے ٹکرائے

وہ تو چکا ہے نیڑا اکبر اس سے اکار ہو سکے کیونکر  
اٹی سبھی سے بڑا سویں ہیسے ہے جنگل کرائے اتنیکے کیتھاں اکیا کرنا  
یہتے پارے ।

وہ ہمیں دلتاں تک لایا اس کے پانے سے یاد کو پایا  
اٹی آمادہر کے بخوبی نیکاں پرے اکے پیروں بخوبی کے پیروں  
بھر حکمت ہے وہ کلام تمام عشق حق کا پلا رہا ہے جام  
سے اسی پوروٹاٹا پر جھکا رہا سمعود، یا خودا گھرے سوچا پان کرائے  
بات جب اس کی یاد آتی ہے یاد سے ساری خلق جاتی ہے  
اور کথا یاد کرنے پڑے سکل سعیتی مل ہے کے بے ریے یا  
سینہ میں نقش حق جاتی ہے دل سے غیر خدا اٹھاتی ہے

ہدایہ خودا را چاپ سُٹھ کرے ہدایہ ہتھے خودا چاڈا ہاکی سکلکے بئر کرے  
دیرا

درد مندوں کی ہے دوا وہی ایک ہے خدا سے خدا نما وہی ایک  
بیدنا باراگنڈے رے سٹیٹھی اکماڑی آراؤگی خودا را پکھ خیکے خودا  
دشمنوں رے آیانا سٹیٹھی

ہم نے پایا خوب ہدی وہی ایک ہم نے دیکھا ہے دلربا وہی ایک  
ہدایا ترے اکماڑی سُری آمرا رے کے ای دخیلے ہی آمرا اکماڑی بسُنھ ہیسے بے  
اکے ای پیوئے ہی

اس کے منکر جو بات کہتے ہیں یونہی اک واهیات کہتے ہیں  
اک اسٹیکارکاریا را بلنے تارا شُدھی اپلماپ کرے

بات جب ہو کہ میرے پاس آؤیں میرے منہ پر وہ بات کہہ جاویں  
کوئں کथا خاکلے آمارا کاھے آسُک آمارا سامنے سے کथا بلنے یا ک  
مجھ سے اس دلستاں کا حال سنیں مجھ سے وہ صورت و جمال سُنیں  
آمارا کاھے سے ای بسُنھ بُتھاٹ شُنُک آمارا کاھے سے ای چھارا و سے ای  
سُوندھرے رے کاھنی شُنُک

آنکھ پھوٹی تو خیر کان ہی نہ سکی یوں ہی امتحان ہی  
چوکھ خاراپ ہلنے کا نکے کا جے لگاگا تے پارے نیدن پکھے پریکشا سُرکلپ  
تارا شُننتے پارے

آر یہتھو نور آفشاں رے سمسادک تار پرشیا رے ٹولرے رے جنی انجدے رے ساٹھے  
آمارا کے و سبھوڈن کرے ہن آر یادی و ا گھٹے یا خاٹھا نے امیں سب آپنی  
پورا پوری خوشن کرنا ہی ہے کیسٹھی ٹولیا خیت کارا گے اخانے و سانکھنڈا بے تار  
آپنی خوشن کرنا یعنی یعنی۔ ات ای و، نیمے تا لیپی بند کرنا ہے:

سمرا گ را ٹھیک، ای ٹھیلے رے شیکا کے ٹھکٹھ ملنے کرنا بُنھی رے آتا و و  
بُوکھا ر بُل۔ سبھا ہی رات ٹسما (آ.) ای ٹھیلے رے شیکا کے ٹھٹھی یعنی ملنے کرے  
نی۔ یہم، تینی نیجے بگھے، تومان دے رے ٹھٹھی یعنی آمارا آراؤ آنکھ

কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পারবে না। অবশ্য যখন তিনি অর্থাৎ সত্যের আত্মা আসবেন তিনি তোমাদের সত্যের সকল পথ সম্পর্কে অবহিত করবেন। (যোহন: ১৬, আয়ত: ১২-১৬)। এখন বলুন! এটিই কি ইঞ্জিল যা সকল ধর্মীয় সত্য নিজের মাঝে ধারণ করে যার বর্তমানে কুরআনের কোন প্রয়োজন নেই। বন্ধুগণ! যেখানে আপনারা ইঞ্জিলকে হ্যরত ঈসার ওসীয়ত অনুসারে উৎকৃষ্ট ও সকল সত্যের সমাহার বলার অধিকারই রাখেন নি সেখানে বলতে হয় যে, আপনাদের ঈমানও বড় অচূত যে, নিজেদের শিক্ষক ও রসূলের কথার পরিপন্থি পদক্ষেপ আপনারা নিচ্ছেন। যে গ্রন্থকে হ্যরত ঈসা স্বয়ং অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন তাকে সম্পূর্ণ বলছেন— আপনারা কি হ্যরত ঈসার থেকে বেশি বোঝেন নাকি মসীহৰ কথা অনিভৰযোগ্য? যদি আপনারা একথা বলেন যে, যদিও ঈসার যুগে ইঞ্জিল অসম্পূর্ণ ছিল কিন্তু তিনি ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, যেসব কথা আমার বলার বাইরে রয়ে গেছে তা কফেটার বা আশ্বস্তকারী এসে বর্ণনা করবেন— খুব ভালো কথা? কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই কফেটার বা আশ্বাস প্রদানকারী, হ্যরত ঈসা যার আসার শুভসংবাদ দিয়েছেন আর যার সম্পর্কে লিখা আছে, তিনি ধর্মীয় সত্যকে পরম মার্গে পৌঁছাবেন আর ভবিষ্যতের সংবাদ অর্থাৎ কিয়ামতের সংবাদ ইঞ্জিলের চেয়ে আরো সবিস্তারে বর্ণনা করবেন! আপনাদের ধারণা অনুসারে হ্যরত মুহাম্মদ (সা.), যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা অতীতের সব গ্রন্থের চেয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার দাবি করে এবং এর প্রমাণও দিয়ে থাকে— তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যে হ্যরত ঈসার পর আবির্ভূত হয়ে ধর্মীয় সত্যকে পরম মার্গে পৌঁছিয়েছেন আর ভবিষ্যতের সংবাদ মসীহৰ চেয়ে বেশি দিয়েছেন— তাহলে তার নাম বলা উচিত। এমন কিতাব উপস্থাপন করা উচিত যা হ্যরত ঈসার পর শ্রিষ্টানরা খোদার পক্ষ থেকে লাভ করেছে, যা স্বীয় সেসব সত্য উপস্থাপন করবে যা ঈসার শিক্ষায় নেই আর অন্তিম বৃত্তান্ত ও ভবিষ্যতের সংবাদ দেবে যা হ্যরত ঈসা দিতে পারেন নি, যেন সে গ্রন্থকে কুরআনের সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু হ্যরত ঈসার অনুসারী আখ্যায়িত হয়ে আবার সে বিষয়কে কামেল আখ্যা দেবেন যাকে হ্যরত ঈসা আপনাদের ১৮২০ বছর পূর্বে অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন! আর যদি আপনাদের ঈসার সন্তান বিশ্বাসই না থাকে আর নিজেরাই ইঞ্জিলের সাথে কুরআনের তুলনা করতে চান, তাহলে আসুন আর ইঞ্জিল হতে সেসব পরম

শিক্ষামালা বের করে দেখান যা আমরা এ গ্রন্থে কুরআন শরীফ সম্পর্কে প্রমাণ করেছি যেন ন্যায়পরায়ণ মানুষ নিজেই দেখে নিতে পারেন যে, ঐশ্বী তত্ত্বের উপকরণ কুরআন শরীফে আছে, নাকি ইঞ্জিল? যেখানে আমরা ইঞ্জিল ও কুরআনের পার্থক্য নিরপণের লক্ষ্যে দশ হাজার রূপির ঘোষণা-সংবলিত বিজ্ঞাপন আমাদের গ্রন্থের সাথে নথিভুক্ত করেছি, সেখানে আপনারা সরলপ্রাণ লোকদের ন্যায় যতক্ষণ আমাদের গ্রন্থের মোকাবিলায় স্বীয় ইঞ্জিলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ না করবেন, ততক্ষণ কোন বুদ্ধিমান খ্রিস্টান মুখে ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ’ বললেও আপনাদের কথাকে সঠিক বলে বিশ্বাস করবে না।

বন্ধুগণ! আপনারা ভালোভাবে স্মরণ রাখবেন, কুরআনের উৎকর্ষ শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ানোর সামর্থ্য ইঞ্জিল ও তওরাতের নেই। দূরে যাওয়ার প্রয়োজন কী! এ গ্রন্থে এখন পর্যন্ত যে দু'টি বিষয়ে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে তারই মোকাবিলা করে দেখুন। অর্থাৎ প্রধানতঃ সে বিষয় যা টেক্সটে লিখা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মজিদ সকল ঐশ্বী সত্যের সমাহার; কোন গবেষক ঐশ্বী বিষয়াদি-সংক্রান্ত এমন কোন সূক্ষ্ম কথা উপস্থাপন করতে পারবে না, যা কুরআন শরীফে বিদ্যমান নেই। সুতরাং, আপনাদের ইঞ্জিল যদি কোন সত্য নিজের মাঝে ধারন করে তাহলে কোন বিরোধী শ্রেণির যুক্তি ও বিশ্বাসকে, উদাহরণস্বরূপ ব্রাক্ষ সমাজী, আর্য বা নাস্তিকদের যুক্তি ইঞ্জিলের আলোকে ঘোষিক দৃষ্টিকোণ থেকে খণ্ডন করে দেখান। আর এরা যেসব ধ্যানধারণা দেশে ছাড়িয়ে রেখেছে, তা নিজেদের ইঞ্জিলের ঘোষিক কথার মাধ্যমে খণ্ডন করছেন। এরপর, কুরআন শরীফের সাথে ইঞ্জিলের তুলনা করে দেখুন আর কোন মধ্যস্থতাকারীকে জিজ্ঞেস করুন যে, গবেষকসূলভ নিশ্চয়তা কি ইঞ্জিল প্রদান করে নাকি কুরআন শরীফ? দ্বিতীয়ত সে বিষয় যা টীকা, পাদটীকা ১-এ লিখা হয়েছে যে, কুরআন শরীফ আধ্যাত্মিকভাবে সত্যিকার অন্ধেষ্ঠার প্রকৃত লক্ষ্যের বা উপাস্যের সাথে সম্পর্ক-বন্ধন রচনা করিয়ে দেয় আর তখন সে সন্ধানী খোদার নৈকট্যের সন্ধান পেয়ে তাঁর পক্ষ থেকে এলহাম লাভ করে যাতে খোদা তাঁলার দান তার জন্য নিবেদিত হয় আর সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে গণ্য হয়। এই এলহামের সত্যতা সে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যা তাতে অন্তর্নিহিত থাকে। সত্যিকার অর্থে, চিরস্থায়ী জীবনের এটিই বাস্তবতা যা উপরে লিখা হয়েছে। কেননা জীবিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক, জীবন লাভের কারণ হয়ে থাকে। যে গ্রন্থ

অনুসরণের ফলে সেই সম্পর্কের লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় সেই গ্রন্থের সত্যতা স্পষ্ট বরং সুর্যের চেয়ে বেশি দেবীপ্যমান। কেননা তাতে কেবল বড় বড় বুলিই আওড়ানো হয় নি বরং তা অভিষ্ঠে পৌছিয়েছে। তাই আমরা এখন খ্রিস্টান বন্ধুদের জিজেস করি যে, যদি আপনাদের ইঞ্জিলের শিক্ষা সঠিক ও খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে কুরআনের যেসব আধ্যাত্মিক প্রভাবের প্রমাণ আমরা দিয়েছি, তার মোকাবিলায় ইঞ্জিলের আধ্যাত্মিক কার্যকারিতা প্রদর্শন করুন। খোদা তাঁলা কুরআনের অনুসরণ এবং শ্রেষ্ঠ ও খাতামুর রসূল হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগমনের কল্যাণে মুসলমানদের ওপর যেসব অদৃশ্য স্বর্গীয় বিষয়াদি প্রকাশ করেছেন এবং করেন- তা আপনারাও প্রদর্শন করুন, যেন প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর চেহারা কালিমালিষ্ট হয়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, উল্লিখিত উভয় বিষয়ের কোন একটির ক্ষেত্রেও আপনারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে পারবেন না। ইঞ্জিলের শিক্ষা উৎকর্ষ হওয়া তো দূরের কথা, এটি এখন আর কোনভাবেই ভেজালমুক্ত নয় বা নির্ভরযোগ্য নয়। এটি সর্বপ্রথম শিক্ষাতেই মরিয়মের পুত্রকে খোদার সন্তান আখ্যা দিয়ে নিজেদের আস্তিতে নিপত্তি থাকার প্রমাণ দিয়েছে। বাকি থাকলো তওরাতের শিক্ষা! তাও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে গলিত মোমের রূপ ধারণ করেছে যাকে ইহুদীরা এক আকৃতি দিচ্ছে আর খ্রিস্টানরা ভিন্ন। যদি তওরাতে খোদার সত্তা ও বৈশিষ্ট্য এবং পরকাল সম্পর্কে সেই বিস্তারিত শিক্ষা থাকতো যা কুরআনে রয়েছে তাহলে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের মাঝে এত বিবাদ দেখা দেয়ার কারণ কী? সত্য বলতে কী, সূরা ইখ্লাসের একটি বাক্যে খোদার একক্তব্যাদ যতটা গভীরভাবে অন্তর্নিহিত আছে, তা পুরো তওরাত বরং গোটা বাইবেলেও খুঁজে পাওয়া ভার। যদি থেকেই থাকে, তাহলে কোন খ্রিস্টানের উচিত হবে আমাদের সামনে তা উপস্থাপন করা। তাই যেখানে তওরাতে বরং পুরো বাইবেলে সঠিকভাবে ও পরিষ্কার করে আল্লাহর তৌহীদকে বিশুদ্ধভাবে উল্লেখই করা হয়নি আর এ কারণেই তওরাত ও ইঞ্জিলে একটি বিপত্তি দেখা দিয়েছে আর নিশ্চিতভাবে কোন কিছু বোঝা সম্ভব হয় নি। স্বয়ং মৌলিক বিষয়ে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার বিতঙ্গ বা মতভেদ দেখা দিয়েছে। একই তওরাতকে, ইহুদীরা একভাবে নিয়েছে আর খ্রিস্টানরা ভিন্নভাবে। এহেন পরিস্থিতিতে এমন সত্যামৈষী কে হবে যার আত্মা এটি চাইবে না যে, খোদা তাঁলা সেসব পথহারা দলগুলোর মাঝে সৃষ্টি বিতঙ্গার নিজেই মিমাংসা করবেন এবং আস্তিতে

নিপত্তিতকে তার ভাস্তি সম্পর্কে অবহিত করবেন। সন্দেহ নেই যে, খোদার সর্বজনীন করণার এটিই দাবি! অতএব, সেসব মতভেদ দূর করার জন্যই কুরআন নায়িল হওয়া আবশ্যক ছিল নোংরা ধ্যানধারণার বিস্তারের কারণে যেসব সত্য প্রকাশের সময় এসে গিয়েছিল, তা যেন প্রকাশ করে দেয় এবং ধর্মীয় জ্ঞানকে পরমোৎকর্ষ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। অতএব, এই পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হয়ে এসব দায়িত্বই পালন করেছে আর সকল বিকৃতির সংশোধন করেছে এবং শিক্ষাকে যথাযথ প্রকৃষ্টতায় পৌঁছিয়েছে। সর্বদা দাঁতের বিনিময়ে অনর্থক দাঁত ফেলে দেয়ার নির্দেশও দেয় নি আর অপরাধীকে সদা ছেড়ে দেয়া ও মার্জনা করা-সংক্রান্ত নির্দেশও জারী করে নি বরং সেই পুণ্য, তা কোন সময় কঠোরতার রূপেই আসুক বা কোমলতার পোশাকে, প্রতিশোধ হিসেবে আসুক বা মার্জনা রূপে, প্রকৃত পুণ্য করার তাগাদা দিয়েছে।

از نور پاک قرآن نجیع صفا دمیده بر غنچپائے دلها باه صبا و زیده  
কুরআনের পবিত্র জ্যোতির কল্যাণে উজ্জ্বল প্রভাত উদিত হয়েছে আর হৃদয়-  
কলিতে প্রভাত-সমীরণের ছোঁয়া লাগছে।

ایں روشنی و لمعاں سمس الخلقی ندارد وایں دلبری و خوبی کس در قمر نمیده  
এমন আলো ও উজ্জ্বল্য মধ্যাহ্নের সূর্যেও দেখা যায় না। এমন আকর্ষণ ও  
সৌন্দর্য কেউ চাঁদেও দেখে নি।

یوسف بصر چاہے محسوس ماند تہا وایں یوسف کہ تن ہا از چاہ بر کشیده  
ইউسুফ একটি কুপের আঁধারে একা বন্দী ছিলেন; কিন্তু এটি (কুরআন)  
অনেককে কৃপ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

از مشرق معانی صدحا دقيق آورد قدر ہلال نازک زال نازکی خمیده  
এটি পূর্ব থেকে বা সত্যের উৎস হতে শত শত সূক্ষ্ম কথা এনেছে। এর  
মাহাত্ম্য অভিভূত হয়ে স্নিগ্ধ চাঁদ স্বীয় কঠিতে আরও বাঁক দিয়েছে।

کیفیت علومش دانی چ شان دارو شہدیست آسمانی از وحی حق چکیده  
এতে বিধৃত জ্ঞান ও সত্যের মান কত অসাধারণ! যেন তা স্বর্গীয় ওহীর  
প্রেরণায় উৎসারিত মধু।

آل نیر صداقت چوں رو بعلم آورد    ہر بوم شب پرستی در کنخ خود خزیده  
سےই سত্যের سূর্য যখন ধরাধামে নেমে এলো, সকল অন্ধকার-প্রেমী পেঁচা  
স্ব স্ব গর্তে পালিয়ে গেলো ।

روئے یقین نہ بیند ہر گز کسے بدنیا ॥ لاؤ کسے کہ باشد بارویش آرمیده  
کেউ এই পৃথিবীতে প্রকৃত জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না; ॥কেবল  
সে-ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে একে ভালোবাসে ।

آنس کہ عالمش شد شد مخزن معارف    وآل بے خبر ز عالم کیں عالمے ندیده  
যে এই জ্ঞানকে হস্তগত করেছে সে তত্ত্বজ্ঞানের কোষাগার হয়ে গেছে আর সে  
বিশ্ব সম্পর্কে অঙ্গ, যে এই (কুরআনের) বিশ্বকে দেখে নি ।

بارانِ فضل رحمان آمد ب مقدم او    بد قسمت آنکه ازوے سوئے د گر دویده  
রহমান খোদার কৃপাবৃষ্টি তাকে পথ দেখানোর জন্য বর্ষিত হবে, কিন্তু দুর্ভাগা  
সে যে একে ছেড়ে অন্য দিকে ঘায় ।

میل بدی نباشد ॥ لاؤ رگ زشیطان    آل را بشر بد انم کز هر شرے رهیده  
پাপের প্রবণতা মানুষের ভেতরকার শয়তানের প্ররোচনাতেই দেখা দেয় ।  
আমার মতে সে-ই মানুষ যে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত থাকে ।

اے کانِ دربائیِ دانم کہ از کجائی    تو نورِ آں خدائی کیں خلق آفریده  
হে سৌন্দর্যের খনি, আমি জানি তুমি কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখ । ॥তুমি সেই  
খোদার জ্যোতি যিনি সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ।

میل نماند باکسِ محبوب من توئی بس    زیرا کہ زالِ فقاں رس نورت بمار سیده  
কারো প্রতি আমার আকর্ষণ নেই, আমার প্রেমাস্পদ কেবল তুমিই, কেননা  
তোমার জ্যোতি এই প্রেমের মাধ্যমেই আমি লাভ করেছি ।

## انجی اکٹی کوپیا:

نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلی نکلا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا

کوئر آنے والے جیاتی سکل جیاتی ہتھے بیشی عجزل پرمادگیت ہوئے ہے ।

پورا میں سے اس ساتھیا یار پکش خیکے جیاتیں اسی سمعد عرض ساریت ہوئے ہے ।

حق کی توحید کا مر جھا ہی چلا تھا پودا ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصیل نکلا

خوندا ر اک تڑباد پڑا نے تیوے پڈھیل ।

ہٹھاں کر رے اندھی سٹھان ہتھے اسی سے سبھی پرسنیت ہوئے ہے ।

یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ اک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا

ہے پر بھو! اسی تومار کوئر آنے والے نے یہ نے اک گوٹا بیش!

پڑھو جنیوی سب کیکھی اتھے بیداریان

سب جہاں چھان پکے ساری دکانیں دیکھیں میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا

سماد بیش خاتمے دیکھے ہی سب دوکانے انوسانکھاں کر رہے ہیں

تھوڑے جانے والے پانیویں اسی تھے اک کماٹ سुدھا دعستیتے پڈھل

کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ ہے وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں کیتا نکلا

پڑھی بیتے، اسی جیاتیں تولنا کاروں ساٹھے کرار اس سویوگ نہیں

سکل کथا یا و سکل بیشیستے اسی تھے اک انجی اسی پرمادگیت ہوئے ہے

پہلے مجھے تھے کہ موئی کا عاصا ہے فرقاں پھر جو سوچا تو ہر اک لفظ مسیحہ نکلا

پر اسی ملنے کر تاماں موساً را لائی ہلے فوکر کا ن

پر اسی ملنے کر تاماں موساً را لائی ہلے فوکر کا ن

ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا و گرنہ وہ نور ایسا چکا ہے کہ صد تیر بینا نکلا

انکھوں کے نیزے دیکھے ہی نتوہا

سے اسی جیاتی اسی دیکھے ہی نیزے دیکھے ہی نتوہا

زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل اغمی نکلا

امن لोکوں کے نیزے دیکھے ہی نتوہا اسی پرمادگیتے کی ایسی دل اغمی نکلا

یادوں ہدایت اسی جیاتی اسی دیکھے ہی نتوہا اسی پرمادگیتے کی ایسی دل اغمی نکلا

জল্লে সে আ গে হি যি লোগ তু বল জাতে হিন  
জন কি হৰ বাত ফেক্ট খ্বুট কা পুত্তা আকা

জ্বলার পূর্বেরই এরা জ্বলে যায়  
যাদের প্রতিটি কথা মিথ্যার মৃত্ত প্রতীক প্রমাণিত হলো

একজন খ্রিস্টান বক্তা অর্থাৎ নূর আফশার সেই সাংবাদিক নিজের রূপ পরিবর্তন করে এই প্রশ্ন সম্পর্কে বলেন, এখন তিনি জাগতিক কার্যকলাপে নিম্ন নতুবা প্রমাণ করে দেখাতেন যে, কুরআন কোন্ কোন্ স্থান হতে নেয়া হয়েছে। চমৎকার কথা! আপনি তো ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেখিয়েছেন। ইঞ্জিল সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে তারা যে ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ধারণাই আপনি কুরআন শরীফ সম্পর্কে (কৃত্রিমভাবে) উপস্থাপন করলেন। এত বড় মিথ্যা আপনি সারা জীবন হয়ত বলেন নি যা এখন খ্রিস্টানদের সন্তুষ্ট করার জন্য হঠাত করে বলে বসেছেন। যাহোক, এই উক্তিটি... (চলমান, অবশিষ্টাংশ চতুর্থ খণ্ডে আছে। –অনুবাদক)

## ক্ষমা প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তি

এবার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে যে সীমাতিরিক্ত দেরি হয়ে গেল, একারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ও দর্শক হয়ত ভীষণ অবাক হবেন। কেউ কেউ হয়ত নানা সন্দেহ এবং বিভিন্ন ধারণাও পোষণ করছেন। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। স্মর্তব্য যে, এই বিলম্ব আমাদের পক্ষ থেকে হয় নি, বরং কাকতালীয় বিষয় যা ঘটেছে তা হলো ১৮৮১ সনের মে মাসে কিছু টাকা একত্রিত হওয়ার পর সফীরে হিন্দ ছাপাখানায় বইয়ের পাণ্ডুলিপি ছাপার জন্য দেয়া হয় আর আশা ছিল যে, সর্বোচ্চ দু-মাসের ভেতর বই ছেপে যাবে। কিন্তু অদ্ভুত-সংক্রান্ত দৈর বিষয়াদিতে দুর্বল মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সফীরে হিন্দ ছাপাখানার ব্যবস্থাপক সাহেব বিভিন্ন প্রকার আকস্মিক বিপদাপদ ও অনিবার্য সমস্যায় জড়িয়ে যান, যে কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছাপাখানা বন্ধ ছিল। যেহেতু এই বিলম্ব তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তাই তাঁর সামর্থ্য ফিরে পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা ছিল মানবতার দাবি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, দীর্ঘকাল পর তাঁর সমস্যাবলী কিছুটা হাস পেতে থাকে আর কিছুদিন থেকে বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের ছাপার কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু এই খণ্ড ছাপার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বাধ্যবিপত্তির কারণে একটি দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। তাই গভীর আক্ষেপের সাথে বলছি যে, এ পুরো খণ্ডটি ছাপার অপেক্ষা করার পরিবর্তে এখন পর্যন্ত যতটা ছেপে গেছে, তা দর্শকদের হাতে তুলে দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলাম, যেন এটি তাদের স্বষ্টির কারণ হতে পারে। এ খণ্ডের যে কাজ এখনও অবশিষ্ট আছে, তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চান, চতুর্থ খণ্ডের সাথে যুক্ত করে ছেপে দেয়া হবে, যা একটি বড় খণ্ড হবে।

কোন কোন বন্ধুর দৃষ্টিতে হয়ত আমরা এ-কারণে আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হতে পারি যে, এমন ছাপাখানায় কেন বই ছাপাতে গেলাম, যেখানে বারবার দীর্ঘ বিলম্বের সম্মুখীন হতে হয়? এই আপত্তির উভয় এখনই দেয়া হয়েছে যে, এই বিলম্ব ব্যবস্থাপকের বাধ্যবাধকতার কারণে ছিল, ইচ্ছাকৃত নয়। আমাদের দৃষ্টিতে এমন অবস্থায় তিনি সহানুভূতি লাভের যোগ্য, সমালোচনা নয়। এছাড়া সফীরে হিন্দ ছাপাখানার মালিকের একটি উত্তম গুণ হলো, তিনি অতি নির্খুতভাবে স্বচ্ছতার সাথে শ্রম ও সাধনার ভিত্তিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে কাজ সমাধা করেন। তিনি একজন পাদ্রি, কিন্তু ধর্মের

ভিন্নতা সত্ত্বেও খোদা তাঁর প্রকৃতিতে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, স্মীয় কর্মে তিনি নিষ্ঠা ও সততা প্রদর্শনে কোন ত্রুটি করেন না। কাজ ভালোভাবে, সূচারঞ্জনপে এবং নিখুঁতভাবে সমাধা করার ক্ষেত্রে যাতে কোন ত্রুটি না থাকে, সে বিষয়ে তাঁর মাঝে এক উম্মাদনা ও ব্যাকুলতা রয়েছে। এসব কিছু দৃষ্টিতে রেখে, যদিও এই ছাপাখানায় অন্যান্য ছাপা খানার চেয়ে বেশি পয়সা দিতে হয়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁর ছাপাখানা পছন্দ করা হয়েছে। আর ভবিষ্যতে আমরা দৃঢ় আশা রাখতে পারি যে, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যতটা সময় লাগতে পারে লাগবে, কিন্তু এছাড়া তার পক্ষ থেকে চতুর্থ খণ্ড ছাপার ক্ষেত্রে আর কোন বিলম্ব হবে না। তাই এ খণ্ডটি ছাপার অপেক্ষায় আমাদের সদয় ক্রেতাদের এবারের ন্যায় আর উৎকর্ষিত ও ব্যতিব্যস্ত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। খোদার ইচ্ছানুসারে তা দ্রুত ছাপা হোক বা দেরিতে, যখনই তা ছাপবে অন্তিবিলম্বে সকল ক্রেতার বরাবরে তা পাঠানো হবে। আর এখানে সেসব ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যারা তৃতীয় খণ্ড ছাপার জন্য কেবল খোদার সম্প্রতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাহায্য করেছেন। আর এবার স্থান সংকুলানের অভাবে ও বাধ্যবাধকতার কারণে এই অধম, এ সকল দৃঢ়চেতা বন্ধুদের আশিষময় নাম লেখা ও অন্যান্য ক্রেতাদের নাম উল্লেখ করতে অপারগ। কিন্তু এরপর যদি খোদা চান আর মানুষের ইচ্ছার কোন ত্রুটি না থাকে, তাহলে পরবর্তী কোন খণ্ডে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হবে।

এছাড়া এখানে এ কথাও প্রকাশ করা হচ্ছে যে, তৃতীয় এই খণ্ডে সে সকল ভূমিকা সূচক বিষয় লেখা হয়েছে, যা মনোযোগ সহকারে পাঠ করা ও স্মরণ রাখা ধন্ত্বের পরবর্তী বিষয়গুলো বোঝার জন্য অত্যাবশ্যক। এটি পাঠের ফলে এ-কথাও স্পষ্ট হবে যে, খোদা তাঁলা সত্য ধর্ম ইসলামে সেই সম্মান ও মাহাত্ম্য এবং কল্যাণরাজি ও সত্য বিষয়াদি অঙ্গনিহিত রেখেছেন যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন যুগে কোন ভিন্ন জাতি করতে পারে নি আর এখনও পারবে না। এ বিষয়কে যৌক্তিকভাবে বর্ণনা করে, সকল বিরোধীর সামনে পরিপূর্ণ সত্য তুলে ধরা হয়েছে আর সকল সত্যান্বেষীর জন্য পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটনের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে, যেন সত্যান্বেষী স্মীয় লক্ষ্য ও অভীষ্ট অর্জনে সক্ষম হয় আর সকল বিরোধী সত্যের পরম জ্যোতির উৎকর্ষতা দেখে যেন লজ্জিত ও নির্বাক হয়ে যায় এবং তারাও যেন লজ্জিত হয়, যারা ইউরোপের মিথ্যা আলোকে, দেবতা বা খোদা বানিয়ে রেখেছে এবং ঐশ্বীকল্যাণে বিশ্঵াসীদেরকে

অজ্ঞ, বন্য ও অশিক্ষিত মনে করে। স্বর্গীয় নির্দর্শনাবলীতে বিশ্বাসীদের নাম তারা অজ্ঞ, বোকা ও নির্বোধ রাখে, যাদের ধারণা হলো, ইউরোপের নব্য আলো ইসলামের আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজির ছাপ মিটিয়ে দেবে আর সৃষ্টির ষড়যন্ত্র স্থাপন জ্যোতির বিরচন্দে জয়যুক্ত হবে। সুতরাং এখন সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দেখবে যে, কে জয়যুক্ত হয়েছে আর কে নির্বাক ও ব্যর্থ হয়েছে, কে সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান আর কে মিথ্যবাদী ও নির্বোধ! আল্লাহই সাহায্যকারী এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করতে হয়।

অধম-

(মির্যা) গোলাম আহমদ

(খোদা তাকে মার্জনা করছন)



# BARĀHĪN - E - AḤMADIYYA

Hađrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup> of Qadian claimed to be the same Promised Messiah and Mahdi that the Holy Prophet Muhammad<sup>sa</sup> prophesied would come to rejuvenate Islam and restore its original lustre.

During his early life, Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup> saw a dream in which he handed a book of his own authorship to the Holy Prophet<sup>sa</sup>. As soon as the book touched the Holy Prophet's blessed hand, it transformed into a beautiful, honey-filled fruit which was then used to revive a dead person lying nearby.

The Promised Messiah<sup>as</sup> was inspired with the following interpretation:

Allah the Almighty then put it in my mind that the dead person in my dream was Islam and that Allah the Almighty would revive it at my hands through the spiritual power of the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him.

It is this very book—*Barāhīn-e-Aḥmadiyya*—which is to be instrumental in revitalizing Islam in the latter days in accordance with the grand prophecy of the Holy Prophet<sup>sa</sup>. Its subject matter is of universal importance and, as such, it will prove to be a source of lasting value for all readers. The significance of *Barāhīn-e-Aḥmadiyya* cannot be overstated.

